কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা

সমরেশ মজুমদার

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

কিছু কথা

ষাটের দশকে কফিহাউসে ওর সঙ্গে আলাপ। আসামের হাইলাকান্দির ছেলে। বন্ধুত্ব হয়ে গেল ঝটপট। ও তখন কবিতা লিখত। কিন্তু তা নিয়ে সোচ্চার হতে সঙ্কোচ বোধ করত। পরে অধ্যাপক হল। নিজের লেখা নিয়ে কথা বলত না, বললে এড়িয়ে যেত। এমন অভিমানী কবির সঙ্গে আমি নিয়মিত সংযোগ রেখে গিয়েছি। ওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা। বিপণন জানত না তাই অজানাই থেকে গেছে। গত বছরে বলেছিলাম, তোমার ওই নামটা আমার বই-এ ব্যবহার করব। বলেছিল, যাক, তাতে নামটা বেঁচে থাকবে। কয়েকমাস আগে ও চুপচাপ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। আমি ওকে ঠাট্টা করতাম অভিমানবাবু বলে। শেষ অভিমানটা জানা হল না।

এই বই সেই কবি করুণাসিন্ধু দে-র স্মৃতিতে
উৎসর্গ করছি।

লেখকের অন্যান্য বই

নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র
গোপন ভালোবাসা
মেঘে মাটিতে মাখামাখি
তেরোটি প্রেমেব উপন্যাস (একত্রে)
আকাশে হেলান দিয়ে
একাদশ অশ্বারোহী
শ্রেষ্ঠ গল্প

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা

সকাল সাড়ে সাতটায় চেম্বারে এল যখন সৌমিত্র, তখনই মক্কেলদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। ঘুম ভাঙে সাড়ে ছ'টায়। বাথরুমে ঢুকে দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে বেরিয়ে দ্যাখেন গৌরী টেবিলে চায়ের কাপ আর টোস্ট রেখেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে টেবিলে এসে বসার আগেই নীপা এসে যায় ইংরেজিতে অনার্স করে এম ডি ও পড়ছে মেয়ে। হেসে বলে, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।' টোস্টে হাত দেন সৌমিত্র।

'গিলো না, ধীরে সুস্থে খাও।' গৌরী কাপে চা ঢালেন।

'মা কেমন আছেন?'

'চা দিয়ে এসেছি।' গৌরী বলেন।

মেয়ের দিকে তাকাল সৌমিত্র, 'তোর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'প্রশ্নটা গতকালও করেছ বাবা।'

'তাতে কি হল? গতকাল সকালের পর কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারে না?"

'হয়নি।'

'গুড। গৌরী, বাপীকে একটা ফোন করো।'

'এই তো গত রবিবার ও ফোন করেছিল। তিনদিনের ছুটিতে মায়ামি যাবে বলেছে। বউমার বাচ্চা হতে এখনও অনেক দেরি আছে।'

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সৌমিত্র। ঘড়ি দেখলেন। সাতটা বাজতে দশ। তারপর দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এলেন।

এই বাড়ি বানিয়েছিলেন, সৌমিত্রর বাবা, সুধাময়। দোতলা বাড়ি, বিশাল ঘর, শ্বেতপাথরের মেঝে। সে সময় দক্ষিণের এই বর্ধিষ্ণু পাড়ায় জমির দাম হয়তো এখনকার তুলনায় খুব কম হলেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেশি ছিল না। কিন্তু সুধাময় অ্যাটর্নি হিসেবে দু'হাতে রোজগার করেছিলেন। বড় ছেলে সৌমিত্রকেও নিজের প্রফেশনে এনেছেন। আজ সৌমিত্রর নামডাক নেহাত কম নয়।

মায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পরিচিত দৃশ্যটি দেখলেন সৌমিত্র। দোতলার বারান্দায় মোড়ায় বসে বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন রমা, তাঁর হাতের খুব কাছাকাছি বসে কাকগুলো বিস্কুটের টুকরো গিলছে।

'তোমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

রমা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'হ্যাঁ।'

'কাকদের সংখ্যা বাড়ছে?'

'না-রে। একটা খোঁড়া কাক ছিল। সেটা আসেনি।'

'তোমার ওষুধপত্র ঠিক আছে তো?''

'হ্যাঁ।'

'যাচ্ছি।'

'আয়।'

নেমে এলেন সৌমিত্র। দোতলার হলঘরের অন্যপাশে দুটো ঘরে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে দুই ভাই। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় খেয়াল হল, ওদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না।

গোপাল এসে যায় সাতটার কিছু পরে। এসেই মধুকে দিয়ে চেম্বার পরিষ্কার করে গ্লাসে জল ভরে রাখে। ভেতরের দরজা দিয়ে চেম্বারে ঢুকে সৌমিত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'ক-জন এসেছেন?'

গোপাল বলল, 'দশ কী এগারো।'

'তোমাকে অনেকবার বলেছি পাঁচজনের বেশি সকালে না ডাকতে। আজ দশটায় কোর্টে ঢুকতে হবে।' সৌমিত্র তাঁর চেয়ারে বসলেন। এখন টানা ন'টা কুড়ি পর্যন্ত মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলে যেতে হবে। তারপর কোর্ট। হাইকোর্ট পাড়ার চেম্বারে বসে লাঞ্চের সময় কিছু খেয়ে নিয়ে আবার ডেট থাকলে কোর্টে যাওয়া। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত অফিসে বসে কেস তৈরি করা। বাড়িতে ফিরেও মাঝে মাঝে মক্কেলদের মুখোমুখি হতে হয়। রাত দশটায় স্নান সেরে পেট ভরে ভাত খেয়ে পরের ভোরে উঠবেন বলে শুয়ে পড়েন সৌমিত্র। ডাক্তারের পরামর্শে আজকাল ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন তিনি।

সকল আটটায় ওপরে উঠল নীপা। সে ডানাকাটা সুন্দরী না কিন্তু একবার তাকালে দ্বিতীয়বার দেখতে হয় ওকে। লম্বায় এবাড়ির ছেলেদের ধাত পেয়েছে। গায়ের রঙ একটু চাপা কিন্তু লাবণ্য উজ্জ্বল। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখতে নীপা খাদ্যাভাস পালটে ফেলেছে। এই নিয়ে গৌরীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই আছে।

ঠাকুমার ঘরে ঢুকে নীপা দেখলে তিনি ফোনে কথা বলছেন। 'হ্যাঁ, খেয়েছি। না-রে, একটা কাক আসেনি। সেই ল্যাংড়াটা, কি যে হল ওর কে জানে! ঠিক আছে।' ঠাকুমা রিসিভার নামিয়ে রাখতেই নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ক-নম্বর?'

'দুই।' ঠাকুমা হেসে ফেললেন।

'তাহলে শেষটা এল বলে। মা, চা খেয়েছ? সব ক-টা কাককে বিস্কুট খাইয়েছ? এখন তাহলে রাখছি। আচ্ছা তুমি রোজ এক জবাব দাও, তার চেয়ে টেপ করে রাখলেই হয়।'

বলা মাত্রই টেলিফোন বাজল। ঠাকুমা হাত বাড়ানোর আগেই ছোঁ মেরে রিসিভার

তুলে নীপা বলল, 'হ্যালো'।

'ও তুই! মা কোথায় রে?'

'ছোট পিসি, ঠাকুমা ঠিক করেছে রোজ যেসব প্রশ্ন করো সেগুলো আজ করলে জবাব দেবে না। ঠাকুমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কাকগুলোকেও বিস্কুট খাইয়েছে। নাও, কথা বলো।' রিসিভার এগিয়ে ধরল নীপা।

ঠাকুমা ফোন নিয়ে বললেন, 'কি রে, কেমন আছিস?'

'নীপাটা কি পেকেছে দেখেছ?'

'বড় হচ্ছে!'

'এবার ওর বিয়ে দিয়ে দাও। যাকগে, ভালো আছ যখন তখন রাখছি।' ওপারে রিসিভার রাখার শব্দ হতেই রমা মাথা নাড়লেন, 'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ফোন করে। অবশ্য এখন তো ওদের চোখে অন্ধকার দেখার সময়।'

'তাহলে চোখে যখন আলো দ্যাখে তখন ফোন করলে পারে।'

'সংসার কি বস্তু তা বিয়ের পর বুঝতে পারবি। আলো দেখার অবকাশ কোথায়? বলিনি কি? বলেছি। ওরা বলে সকালে উঠে আমার গলা না শুনলে নাকি ওদের কাজে মন বসে না। তা তোর বাবাও বা কম কি! রোজ ঠিক একসময়ে এই ঘরে ঢুকবে। একই প্রশ্ন করবে। আজ মিথ্যে কথা বলেছি।'

'কি বলেছ?'

'ওই যে, যেই জিজ্ঞাসা করল, তোমার ওষুধপত্র ঠিক আছে তো অমনি বলে দিলাম আছে।' রমা হাসলেন।

'সেকি! তোমার ওষুধ শেষ হয়ে গেছে!'

'আঃ। চ্যাঁচাস না তো! যা আছে তাতে আজ চলে যাবে। তোর বাবা কোনোদিন আমার ওষুধ কিনে দিয়েছে। যে কেনে সে ঠিক খেয়াল রেখে আজ নিয়ে আসবে। তুই যখন টেপ করবি বললি তখন তোর বাবার প্রশ্নের উত্তরগুলোও টেপ করে রাখিস, একই কথা তো ওর সঙ্গেও বলতে হয়।' একটু চুপ করেই মাথা নাড়লেন রমা, 'তবু, তবু তো ওরা আসে, ফোন করে। একই কথা বললেও রোজ দেখা করে। এটুকু তো পাই।' রমা হাসার চেষ্টা করলেন।

নীপা দেওয়ালের দিকে তাকাল। ঠাকুরদা সুধাময় গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। এটা ফোটোগ্রাফ নয়। অয়েল পেন্টিং। ঠাকুরদাকে আবছা মনে পড়ে নীপার। ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার যখন তিন বছর বয়স তখন দোতলার বারান্দা থেকে নীচের রাস্তায় দাঁড়ানো লরিতে ঠাকুরদার মৃতদেহ তুলতে দেখেছিল। ফুলে শরীরটা ঢাকা ছিল, এইটুকু মনে আছে।

'খুব গম্ভীর মানুষ ছিলেন, না?'

'খু-উব। কেউ অপ্রয়োজনে কথা বলতে সাহস পেতাম না।'

'তুমিও না?'

'আমি আলাদা নাকি?'
'বাঃ। তুমি ওঁর স্ত্রী ছিলে না?'
'তাতে কি? তখন তো কপোতকপোতী হয়ে থাকার যুগ ছিল না। তাছাড়া মানুষটা ছিল ঠিক ষোলো বছরের বড়। চেম্বার থেকে রাত দশটায় যখন ওপরে উঠতেন তখন ওঁর বিদ্যেসাগরী চটির আওয়াজ কানে গেলেই তটস্থ হয়ে উঠতাম।'
'কেন?'
'বারে! যদি কোনো অন্যায় করে ফেলি তাহলে তো আস্ত রাখবেন না।'
'অন্যায় না করলেও ভাবতে যদি কোনো অন্যায় করে ফেলি!'
'তুই বুঝবি না। বড়-মেজো তো তখন টুঁ শব্দ করতেন না। পরে বড় যখন ওঁর সঙ্গে কোর্টের বের হল তখন তো ওর অবস্থা আরও খারাপ। মামলার ব্যাপারে পান থেকে একটু চুন খললেই দাবড়ানি।'
'তাহলে তো গ্রেট ডিকটেটর ছিলেন।'
'মানে?' রমা শব্দটার অর্থ ধরতে পারলেন না।
'হিটলার, মুসোলিনি। তোমার বিয়ের সময় লোকটার বয়স কত ছিল?'
'সাতাশ। ঠিক মায়ের বয়সি।'
'সর্বনাশ! করেছ কি! মায়ের বয়সি লোকটাকে বিয়ে করেছিলে?'
'বিয়ে করেছিলাম কে বলল? বিয়ে হয়েছিল। ফুলশয্যার রাতে বলেছিলেন তুমি বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চার মতো থাকবে। কখনো মুখে মুখে কথা বলবে না। সেটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। মনে রেখো।' হাসলেন রমা।
'মনে রেখেছিলে?'
'হ্যাঁ। ওঁর চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত ভুলিনি।' রমা বিছানায় এসে বসলেন, 'এবার তুই যা। আমি একশো আটবার নাম লিখব।'
'কাল তো দুর্গা নাম লিখেছিলে, আজ কার নাম?'
'তোকে বলব কেন? যা, পালা।'
ঠাকুমার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল নীপা। ওপাশে বড়কার ঘরে দরজা বন্ধ। বেলা এগারোটার আগে ওকে ডাকা নিষেধ। রাত দুটোর পর ঘুমোতে যায় বড়কা। বিয়ে করেনি, জেগে থাকলে হইচই করে মাতিয়ে রাখে। এগারোটায় চা-জলখাবার খেয়ে পাঞ্জাবি-পাজামা পরে একতলায় নেমে গৌরীকে জিজ্ঞাসা করবে, 'এনি নতুন খবর?'
কোনো খবর দেওয়ার থাকলে গৌরী বলেন, নইলে মাথা নাড়েন। বড়কা সেটা দেখে হাসে, 'নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।' তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ফেরে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। স্নান সেরে খেতে বসে।
খাবার ওর ঘরে হটবক্সে রেখে দেওয়া থাকে। খেয়েদেয়ে আবার আলো নিভিয়ে ঘুম। সেটা ভাঙে সন্ধে সাড়ে ছ'টায়, তখন লিকার চা চাই, দুধ-চা খেলে নাকি

অ্যাসিড বাড়বে। তারপর সাড়ে সাতটার সময় ভালো শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে যাবে বড়কা। ফিরবে রাত একটা নাগাদ। সবাই জানে ফেরে। কিন্তু ফেরার সময় ওর গলার স্বর কেউ শুনতে পায় না। হাঁটার ধরনটা অবশ্য একটু বদলে যায়। বাড়ির কারো সঙ্গে ওর তেমন ভাব নেই শুধু নীপা ছাড়া। সকালে বেরুবার আগে অথবা বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পরে নীপাকে নিজের ঘরে দেখলে বড়কা খুব খুশি হয়।

নীপা পরের ঘরটার দিকে তাকাল। দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতর থেকে এবার গান ভেসে এল। এম টিভি চলছে। নীপা সেদিকে এগোতে পর্দা সরিয়ে বাবুরাম বেরিয়ে এল। হাতে একটা বালতি আর ভেজা তোয়ালে। নীপাকে দেখে হেসে চলে গেল ছাদের সিঁড়ির দিকে। পর্দা সরাল নীপা, ছোটকা বিছানার একপাশে বসে টিভি দেখছে। হাতে রিমোট। ছোটকার গায়ে এখন লম্বা ঝুল পাঞ্জাবি, লাল রঙের। চুল ভেজা, পরিপাটি করে আঁচড়ালেও ভেজাটা বোঝা যাচ্ছে।

জানলার পাশে রাখা চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল নীপা, ছোটকার চোখে পড়তেই হাঁ হাঁ করে উঠল, 'এই, না, ওখানে বসিস না। এই চেয়ারে বস।'

'ওখানে বসলে কি অসুবিধে হবে তোমার?'

'সেটা তুই বুঝবি না, যা বলছি তাই কর।' একটু যেন রেগে গেছে ছোটকা। অতএব আদেশ মান্য করল নীপা, ছোটকা রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল।

'চা খেয়েছ?'

'অনেকক্ষণ। স্নান হয়ে গেল।'

'সকাল থেকে টিভি দেখতে তোমার ভালো লাগে?'

'কি করব! এখনও কাগজ দিয়ে যায়নি। নীচে কাগজ এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখলি! বাবুরামটাকে ছাড়াতে হবে। বললেও কথা শুনতে চায় না।'

'আমি এনে দেব?'

'না। তুই বস। যার ডিউটি তাকে করতে হবে।'

এইসময় বাবুরাম ফিরে এল খবরের কাগজ নিয়ে। তিনটে কাগজ, তিনটেই বাংলা। বিছানার ওপর রাখল কাগজগুলো।

ছোটকা জিজ্ঞাসা করল, 'কখন কাগজ এসেছে নীচে?'

'জিজ্ঞেস করিনি। কেন?'

'তোমাকে বলেছি কাগজ দিয়ে যাওয়া মাত্র ওপরে আনতে। আজ কাগজ অনেক আগে এসেছে। আমি অবাধ্য লোক একদম পছন্দ করি না।' ছোটকা বলল।

'আপনাকে স্নান করাচ্ছিলাম বলে নীচে যেতে পারিনি।'

'যখন চা এনেছিলে তখন আনোনি কেন?'

'বিশ্বাস করুন তখন কাগজ দেখতে পাইনি।'

'ঠিক আছে। এখন যেতে পারো।'

বাবুরাম বেরিয়ে গেলে ছোটকা হাসল, 'কেমন দিলাম, বল?'

'এমন করে বোলো না ছোটকা। পুরোনো লোক, ছেড়ে দিলে তুমি বিপদে পড়বে। কিন্তু তুমি আমাকে ওই চেয়ারে বসতে নিষেধ করলে কেন বলো তো!'

নীপার প্রশ্ন শুনে ছোটকা দেওয়ালে হেলান দেওয়া ক্র্যাচ দুটো টেনে নিয়ে কোনোমতে টলতে টলতে নীচে নামল। পাঞ্জাবির ঝুল প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত থাকায় এই মুহূর্তে ওর পা দেখা যাচ্ছে না। ক্র্যাচে ভর দিয়ে জানলার পাশে এসে চেয়ারে বসে পড়ল ছোটকা। দু'হাতে মাথার চুল ঠিক করল। তারপর হাসল, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে রে?'

অবাক হল নীপা, 'হঠাৎ?'

'বল না।'

'ভালো। তুমি তো দেখতে ভালোই।'

'থ্যাংক ইউ। এবার তুই যা।'

'মানে?'

'নীচে যা, বউদিকে হেল্প কর। বড় হয়েছিস, সংসারের কাজকর্ম শিখে নে। নইলে শ্বশুর-বাড়িতে গেলে বিপদে পড়বি নীপা।' কথা বলতে বলতে জানলার বাইরে তাকিয়ে নিল ছোটকা।

'আমি শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি একথা তোমায় কে বলল?'

'কেউ বলেনি। এটাই তো স্বাভাবিক রীতি।' ছোটকা আবার বাইরে তাকাল। কিছু দেখল এবং এবার ওকে একটু হতাশ বলে মনে হল।

'তুমি বাইরে কি দেখছ বলো তো?' নীপা উঠে দাঁড়াল।

'কিছু না। কি আর দেখব? সারাক্ষণ তো এই ঘরে বন্দি থেকে টিভি দেখি। তাই এই জানলার পাশে বসে মাঝে মাঝে আকাশ দেখার শখ হয়। এখন কথা বললে মনে হয় ভালো করে দেখা হল না। বাবুরামকেও এসময় এখানে থাকতে দিই না।' ছোটকা হাসল।

অতএব নীপা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সকালের শেষ মক্কেলকে দেখে সৌমিত্র মনে মনে অখুশি হলেন, এই ভদ্রলোক কেন যেন গায়ে পড়ে মামলা করতে চাইছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এর আগের দিন সরাসরি প্রশ্নটা করেছিলেন, 'দেখুন, মৃতা মহিলার সঙ্গে আপনার বা আপনাদের কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। মহিলা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন, পুলিশ মহিলার স্বামী, শাশুড়ি এবং দেওরকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু প্রমাণ দিতে পারেননি। আপনারা ওঁদের প্রতিবেশী। এখন আপনারা আঠারোজন সই করে বলছেন এটি হত্যাকাণ্ড কিন্তু মহিলার বাবা চুপ করে গিয়েছেন।

আপনারা হঠাৎ এটাকে হত্যাকাণ্ড বলে মামলা করতে কেন উদ্যোগ নিচ্ছেন?'

'কারণ একটা অন্যায়ের সুবিচার হোক, এটাই আমরা চাই।'

'মামলার খরচ কম হবে না। সেটা কে দেবেন?'

'আমরা পাড়ার লোক চাঁদা করে দেব।'

'ও। কিন্তু এখন সবাই যা বলছেন মামলা চলতে শুরু করলে দেখা যাবে আর তা বলছে না। বছর দুয়েক লেগে গেলে টাকা দেওয়ার কেউ থাকবে না। তাছাড়া আপনাদের কোনো স্বার্থ নেই। মর‍্যাল অবলিগেশন নেই, এরকম অভিনব মামলা করার কথা শুনেছি বলে মনে হয় না। যাহোক, আপনারা প্রমাণ জোগাড় করে আমাকে দিন, তাহলে আমি কেসটা নিতে পারি।'

সেদিনের পরে আজ ভদ্রলোক একাই এসেছেন। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনো আপনাদের একইরকম উৎসাহ আছে?'

ভদ্রলোক হাসলেন তারপর খবরের কাগজের একটা টুকরো এগিয়ে দিলেন। সৌমিত্র দেখলেন, জনপ্রিয় বাংলা কাগজের দ্বিতীয় পাতার অংশটিতে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি যেখানে জানানো হয় সেখানে একটি বিজ্ঞাপনের পাশে দাগ দেওয়া আছে। সৌমিত্র পড়লেন, 'পৃথিবীতে মানুষের বড় শত্রু হল মানুষ। সেই শত্রুদের চক্রান্তে তুমি তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তোমার মতো সদাহাস্যময় মানুষ যার সাহায্যে আমরা আনন্দিত ছিলাম তাকেই চলে যেতে হল তথাকথিত প্রিয়জনের চক্রান্তে। আইন তাদের শাস্তি দিতে পারেনি ঠিকই—কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন। তোমার আত্মার মঙ্গল কামনা করছি। ইতি তোমার প্রতিবেশীবৃন্দ। লেখাটির মধ্যে একটি সুদর্শনা মহিলার ছবি ছাপা হয়েছে।

সৌমিত্রর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, 'এরা কি করেছেন, মানহানির দায়ে পড়ে যাবেন।'

'ঠিক উলটে।' ভদ্রলোক বললেন, 'এই বিজ্ঞাপন ছাপার পর দুটো ঘটনা ঘটেছে। ওই বাড়ির বুড়ো কর্তা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমাদের একজনকে ডেকে বলেছেন, 'ঈশ্বর নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন তবে যারা দোষী তাদের। বাড়ির সবাইকে নয়।' এই কথা থেকে প্রমাণ হচ্ছে ওই বাড়ির কেউ-কেউ দোষটা করেছে। আমাদের বন্ধুর কাছে সেই মোবাইল ছিল যা থেকে ছবি তুলে নেওয়া যায়, রেকর্ড করা যায়। বৃদ্ধের এই বক্তব্য রেকর্ড করে রাখা হয়েছে, ছবিও উঠেছে।'

'দ্বিতীয় ঘটনাটা কি?'

'বিজ্ঞাপন পড়ে পুলিশকে নতুন করে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।'

'বাঃ। ভালো খবর। আপনাদের আর কিছু করণীয় নেই। যদি সত্যি মহিলা খুন হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এই তদন্তে জানা যাবে।' সৌমিত্র উঠলেন।

'দাঁড়ান।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলে রাখলেন ভদ্রলোক, 'এগুলো ওর লেখা চিঠি। ভেবেছিলাম এগুলো প্রকাশ্যে আনব না। কিন্তু আপনারে

কথা শুনে মনে হচ্ছে সলিড প্রমাণ ছাড়া কেস হাতে নেন না। দয়া করে এগুলো পড়ে বলবেন, আপনি মামলাটা নেবেন কিনা।'

'কার লেখা চিঠি?'

'মৃত মহিলার।'

'কাকে লিখেছেন তিনি?'

'আমাকে।'

সৌমিত্র এবার ভদ্রলোককে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাল সকালে একটা ফোন করবেন। আসতে হবে না।' বলে খামটা নিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। বড্ড দেরি হয়ে গেছে তাঁর।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রমা। বউমার ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। টেবিলে জলখাবারের প্লেট, জল সাজিয়ে রেখে গৌরী বললেন, 'মনে হচ্ছে শরীর খারাপ হয়েছে!'

'না। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, দিনের বেলায় যখন-তখন ঘুম পেয়ে যায়।' মা উঠলেন। আঁচল সামলে খাট থেকে নামলেন।

'এই জামাটা আর পরবেন না।' গৌরী বললেন।

'কেন? কি হয়েছে।'

'বাঁ পাশে ছিঁড়ে গেছে।'

'ও। আঁচলের তলায় তো ঢাকা থাকে, কে দেখতে যাচ্ছে!'

'ছেঁড়া জামা পরার দরকার কি! গেল বার ছোট এক কথা শুনিয়ে গেল।'

'ছোট? কি বলেছে সে?'

'মায়ের শাড়িগুলো কখনও যে সাদা ছিল তা এখন দেখে বোঝা যায় না বউদি। বাড়িতে না কেচে ধোপার বাড়িতে মাঝে মাঝে তো পাঠাতে পারো। ঠিকই বলেছে সে। ও কি করে জানবে আপনি ধোপার বাড়িতে কাচিয়ে আনা কাপড় পরবেন না।'

'ছেড়ে দাও তো ওদের কথা। বাপীর ফোন পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। ভালোই আছে।' গৌরী জবাব দিলেন।

'আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না। ওইটুকুনি মেয়ের বাচ্চা হচ্ছে অথচ পাশে আমরা কেউ নেই। ওর বাবার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'বলেছি। ওঁর হার্টের প্রবলেম আছে। প্লেনে এতটা পথ যেতে পারবেন না। তাছাড়া গিয়ে উনি কি করবেন? বাচ্চাকে সামলানো ওঁর পক্ষে সম্ভব? বউমার মা বেঁচে থাকলে সমস্যা হত না।' গৌরী বললেন।

'আমি তো বুঝতে পারছি না, তুমি যাচ্ছ না কেন?'

'আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'উঃ! কবে কি হয়ে গেছে! সে সব মনে রাখেনি বলে তো এখন ফোনে কথা বলে। যে আসছে সে তো এ বাড়ির বংশধর। আমার শরীরে শক্তি থাকলে ঠিক চলে যেতাম।' রমা চেয়ারে বসলেন। গৌরী আর দাঁড়ালেন না।

গলায় ঘাম জমতেই সৌগতর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল পাখাটা স্থির হয়ে আছে। খুব বিরক্ত হল সে। লোডশেডিং-এর কারণে ঘুম ভেঙে মনে হয় ঘুমটা হঠাৎ হল না। ঘড়ির দিকে নজর গেল। এগারোটা বাজতে বাইশ। যাচ্চলে! তাহলে তো তার ওঠার সময় হয়ে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাচা লুঙি পরে বেলের বোতাম টিপল সৌগত। নীচের রান্নাঘরে শব্দটা হলে মদন চা নিয়ে আসবে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। জানলার সামনে দাঁড়াল সৌগত। এপাশে একটা গলি। গলির ওপাশে একটা গ্যারাজ। গ্যারাজের গায়ে তিনতলা বাড়িটায় মেয়েদের হোস্টেল হয়েছে। জানলা দিয়ে ওদের ঘর দেখা যাচ্ছে। কেন যে পর্দাটা টেনে দেয় না! এইসময় একটি কুড়ি-একুশের মেয়ে এসে একটা জানলায় দাঁড়াল, সৌগতকে দেখল এবং বেশ অভদ্র ভঙ্গিতে পর্দা টেনে দিল।

সৌগত হেসে ফেলল। হাঁটুর বয়সি মেয়ে সব। সৌগতর যে পঞ্চান্ন হতে আর মাসখানেক দেরি তা ওদের জানা নেই।

মদনের গলা কানে এল, 'আসব?'

'এসো।'

মদন ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। তাতে এক পট লিকার চা, প্লেটে টোস্ট, চায়ের কাপ-ডিশ আর ভাঁজ করার খবরের কাগজ। তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন একই ভাবে জিনিসগুলো ট্রেতে চাপিয়ে মদন এই ঘরে আসবে।

'চা ঢেলে দেব?'

'দাও।' সৌগত চেয়ারে বসল।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মদন ইতস্তত করে বলল, 'বাবু, আমি দেশে যাব।

'দেশে? হঠাৎ?'

'ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে ডায়মন্ড হারবারের স্কুলে। আমাদের গ্রাম থেকে তো রোজ যাওয়া-আসা করা যাবে না। বাড়িতে কোনো ব্যাটাছেলে নেই যে ওর মা ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে থাকতে পারবে।'

'হুঁ। কদ্দিন থাকবে?'

'যে ক'দিন ধরে পরীক্ষা চলে?'

'বউদি তোমাকে ছুটি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ছেলের পরীক্ষা বলেই রাজি হয়েছেন।'

'টেস্টে কত পারসেন্ট পেয়েছিল তোমার ছেলে?'

'আমি জানি না বাবু। আমি তো বেশি খবর করতে পারি না। গ্রামের স্কুলের মাস্টাররা বিনি পয়সায় পড়ান, বইও দিয়েছেন।'

'থাকবে কোথায়? ডায়মন্ড হারবারে থাকার জায়গা আছে?'

'আমাদের গাঁয়ের একজনের শ্বশুরের মুদির দোকান আছে ওখানে। দোকানের পেছন দিকে দু-তিনজন শুতে পারে। সেখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।'

'হুঁ। তা কাল থেকে আমার কি অবস্থা হবে?'

'বাসনমাজা দিদি তার ননদকে ক'দিনের জন্যে দেবে বলেছে।'

'ও। কবে যাচ্ছ?'

'আজই। দুপুরের কাজ শেষ হলেই যাব।'

চা খেতে খেতে কথা বলছিল সৌগত। খাওয়া শেষ হলে মদন ট্রে নিয়ে চলে গেল। খবরের কাগজে চোখ বোলাল সৌগত। সেই একই খবর।

মিনিট দশেক পরে পাজামা-পাঞ্জাবিতে সেজে সৌগত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হলঘরের ওপ্রাশে মায়ের ঘরের দরজা ভেজানো। তবু সেটা খুলল সৌগত। মা ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। শরীর খারাপ নয় তো! সে এগিয়ে গিয়ে মায়ের কপালে আঙুল রাখল। না, চামড়া ঠান্ডা। রমা চোখ খুললেন।

সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে।'

'কেন?' রমা মাথা না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তুমি শোনোনি। মানুষ মরে গেলে ভগবানের সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। স্বর্গ কিংবা নরকে আর পা ফেলার জায়গা নেই। সেখানে জায়গা না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মরা চলবে না তাই আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঘুমোও।' সৌগত বেরিয়ে গেল।

রমা চোখ বন্ধ করলেন আবার। তাঁর মেজো ছেলের স্বভাব হল অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলা। কিন্তু সত্যি যদি তেমন হয়! স্বর্গ-নরকের দরজা যদি ভগবান বন্ধ করে দেন তাহলে কি দুর্দশা হবে তাঁর? দ হয়ে বেঁচে থাকলে হবে পৃথিবীতে। রমা ধড়মড়িয়ে উঠলেন। তারপর বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে ছোট কাচের আলমারির সামনে এলেন। এই আলমারিতে তাঁর পড়া প্রিয় বইগুলো রয়েছে। দেখে দেখে যেটি বের করলেন তার নাম 'দেবযান'। চশমা পরে বহুবার পড়া বইটির প্রথম পাতায় চোখ রাখলেন তিনি।

দোতলা থেকে নেমে বউদির সংসারে ঢুকল সৌগত। ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে গৌরী তখন একটি অল্পবয়সি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'এনি নতুন খবর?'

মাথা নাড়লেন গৌরী, 'হ্যাঁ। মদন দেশে যাচ্ছে ছেলের পরীক্ষার জন্যে। ও যদ্দিন না আসে তদ্দিন এই মেয়েটা কাজ করবে। ওর নাম রেখা।'

'ভালো কথা। এলাম।' সৌগত আর দাঁড়াল না।

আইনক্সে গিয়েছিল নীপা সিনেমা দেখতে। টিকিটের দাম খুব বেশি হলেও ছবি এবং শব্দ এত ভালো যে দেখার আনন্দটা বেড়ে যায়। টোটা, ফুল টিকিট কেটে তারপর ফোনে বলেছিল।

ছবি শুরুর মিনিট দশেক আগে আইনক্সে পৌঁছে নীপা দেখল টোটা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শূন্যে সার্কল আঁকল। সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'টিকিট নেই?'

'নেই। কলকাতার লোকের পকেটে এখন কত পয়সা বল তো? দামি টিকিট অথচ হাউসফুল হয়ে গিয়েছে।' টোটা বলল।

ফুল বলল, 'চল, ব্ল্যাকটাই আর একবার দেখি।'

টোটা মাথা নাড়ল, 'দু'বার দেখেছি গুরু। এর পরে দেখলে খারাপ লাগবে।'

'খারাপ লাগবে?' অবাক হয়ে তাকাল ফুল।

'এইসব ভালো জিনিস বেশি সহ্য হয় না।

নীপা বলল, 'তাহলে চল, প্রিয়াতে গিয়ে ট্রাই করি।'

টোটা মোবাইলের সুইচ অন করল। ওর মোবাইলে কোলকাতার নামি সিনেমা হলের নাম্বার স্টোর করা আছে।

'হ্যালো, প্রিয়া! কারেন্ট শো-এর টিকিট পাওয়া যাবে? তিনটে? ও শিট!' মোবাইল অফ করল টোটা।

'এখন কি করবি?' ফুল জিজ্ঞাসা করল।

'লেটস গো টু সিটি সেন্টার। ওখানকার আইনক্সে বিকেলের শো-এর টিকিট পেয়ে যেতে পারি।' টোটা বলল।

'ইম্পসিবল। রাত দশটায় বাড়ি ফিরতে পারব না।' নীপা আপত্তি জানাল।

'ম্যাক্সিমাম আট কি সোওয়া আট। তুই কি এখনও খুকি আছিস?' টোটা বলল, 'চল। এই রাস্তা ওয়ান ওয়ে। গাড়ি আনতে পারব না।'

নিমরাজি হয়ে নীপা পা বাড়াল। পার্কিং ফি দিয়ে মারুতি এইট হান্ড্রেডে উঠে বসল টোটা। ফুল বলল, 'আমি সামনে বসছি।'

'বেল্ট বাঁধতে হবে কিন্তু!'

'বাঁধব না, ধরে রাখব। পুলিশ বুঝতে পারবে না।' ফুল সিটে বসে বেল্টটাকে টেনে রাখল সামনে।

পেছনের সিটে বসে নীপা বলল, 'এসি চালা।'

'ভ্যাট। তেলের দাম জানিস? আর এখন একটুও গরম নেই।' টোটা ধমকাল।

টোটার বাবা ইনকামট্যাক্স কমিশনার। ও একমাত্র ছেলে। মা কলেজে পড়ান। বাড়িতে তিনটে গাড়ি আছে। এখন তিন চার হাজার মাসে ইনস্টলমেন্ট দিতেই নতুন গাড়ি পাওয়া যায়। এই এইট হান্ড্রেডটা টোটার। ও মাসে কত পকেটমানি

পায় বলতে চায় না। কিন্তু গাড়ির তেল, সিনেমার টিকিট, কাফের বিল মেটাতে পারে অনায়াসে। ছেলেটার দুটো জিনিস পছন্দ হয় না নীপার। এক, কোনো অ্যাম্বিশন নেই, দুই, রেগে গেলেই স্ল্যাং বলে। এমনিতে রোগাপটকা চেহারা কিন্তু সেটা মনে রাখে না। তবে বন্ধু হিসেবে ভালোই।

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর লেটেস্ট দিদির খবর কি?'

গাড়ি চালাতে চালাতে টোটা বলল, 'ফাইন।'

'তুই কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকেই দেখালি না।' নীপা অনুযোগ করল।

'কি দরকার! দেখলে তো জেলাস হবি।'

সঙ্গে সঙ্গে নীপা আর ফুল একসঙ্গে এমন জোরে হেসে উঠল যে পাশের গাড়ির ড্রাইভার হকচকিয়ে তাকাল ওদের দিকে।

গাড়ি বাইপাস দিয়ে যেতে যেতে স্টেডিয়ামের কিছুটা আগে ফ্লাইওভারে উঠে নিক্কো পার্কের দিকে ঢুকল। নীপা বলল, 'এদিক দিয়ে কখনো যাইনি।'

'নিক্কো পার্কে যাসনি?'

'না। আমি কি বাচ্চা?'

'কাউকে বলিস না, কলকাতা থেকে বের করে দেবে।' টোটা হাসল।

ফুল বলল, 'ফ্যা...! অ্যাই চল না, সোজা গেলে নতুন টাউনশিপ। একবার বাবাকে পৌঁছোতে ওই রাস্তায় এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। কি দারুণ রাস্তা। এদিকে এসেছি যখন তখন ঘুরে আসি একটু।'

'তেলের দাম?' টোটা তাকাল।

'আমরা সবাই শেয়ার করব।' ফুল বলল।

নীপা মনে করিয়ে দিল, 'দেরি হয়ে গেলে সিনেমার টিকিট পাব না।'

'পাব বাবা পাব। রাস্তাটা না দেখলে তুই পরে আপসোস করবি।' ফুল বলল।

করুণাময়ীকে বাঁ দিকে রেখে সোজা এগিয়ে গেল টোটা। মিনিট পাঁচেক পরেই জনমানবশূন্য এক পৃথিবীতে পৌঁছে গেল ওরা যেখানে একটা চার লেনের চওড়া রাস্তা যেন পিছলে চলে গেছে দিগন্তের দিকে।

নীপা বলল, 'দারুণ।'

ফুল বলল, 'আমেরিকান সিনেমায় এমনটা দেখা যায়।'

টোটা গলা খুলে গান ধরল, 'নেভাদা হাইওয়ে—! বুম মুম মুম, বিক বিক।'

নীপা বলল, 'টোটা চালা না!'

টোটা গান থামিয়ে বলল, 'সারাতে দিয়েছি। কি রাস্তা গুরু, গান ধর।'

মেয়েরা দু'হাতে শব্দ করে গান ধরল, টোটা গান গাইছে স্টিয়ারিং-এ আওয়াজ তুলে। গাইতে গাইতে বলল, 'দুটো মোটরবাইক আসছে।'

ফুল বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে মোটরবাইকের ব্যাক সিটে বসে বয়ফ্রেন্ডের কোমরে সুড়সুড়ি দেব।'

বলতে না বলতে বাইক দুটো ওদের ওভারটেক করে গাড়ির সামনে চলে এসে হাত নেড়ে থামতে বলল।

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের চিনিস?'

টোটা মাথা নাড়ল, 'না।'

বাইক দুটো সামনে থাকায় গাড়ির গতি কমাতে বাধ্য হচ্ছিল টোটা। শেষ পর্যন্ত না থামিয়ে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে বাইক দাঁড় করিয়ে নেমে এল ওরা। একটা বাইকে দুজন অন্যটায় একজন ছিল।

নিচু হয়ে জানলা দিয়ে ওদের দেখল ওরা। তারপর টোটার পাশের দরজা খুলে এক হ্যাঁচকায় ওকে নামিয়ে নিল নীচে।

'যা যা মাল আছে ঝটপট দিয়ে দে।'

'কে তোমরা?'

'তোর বাপ। চিনতে পারছিস না? মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি।' হাত বাড়িয়ে টোটার গলার সোনার চেন একটানে ছিঁড়ে ফেলতেই চিৎকার করে উঠল ফুল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়জন। গর্জে উঠল, 'অ্যাই, চিল্লাবি না! চোপ!'

ফুল শব্দ গিলল। নীপা বুঝল তারা ছিনতাইবাজদের হাতে পড়েছে। ততক্ষণে টোটাকে ওরা শুধু জাঙিয়া পরিয়ে দাঁড় করিয়ে ওরা যা ছিল তা নিয়ে নিয়েছে। তারপর গাড়ির ওপাশে বালির ওপর উপুড় করে দিয়ে বলল। 'বাঁচতে চাস তো চুপচাপ শুয়ে থাক। তোর বডি দেখে হ্যাঙারও লজ্জা পাবে অথচ কি কপাল দু'দুটো মাগি নিয়ে উড়ছিস!'

ধাক্কা মেরে ওরা টোটাকে শুইয়ে দিল। দ্বিতীয় জন এবার ফুলকে বের করে নিয়ে এল গাড়ি থেকে, 'বাঃ, দারুণ জিনিস। তোর জামাটা ছিঁড়তে হবে না খুলে দেখাবি?'

প্রথমজন বলল, 'আগে মাল নিয়ে নে তারপর খেলা করিস।'

কিছু করার আগেই ফুল তার যাবতীয় সম্পত্তি ছেলেটির হাতে তুলে দিল। নীপা সামনে-পেছনে তাকাল। রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই। চারধার ধু-ধু করছে। হঠাৎ ফুল চিৎকার করে উঠতেই সে মুখ ফেরাল। ছেলেটা ফুলের জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল নীপার। দরজা খুলে নীচে নেমে চিৎকার করল সে, 'কি ভেবেছিস তোরা? রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে নোংরামি করবি? ছেড়ে দে ওকে।'

তৃতীয় জন হাসল খ্যা খ্যা করে। 'বাপস! এ দেখছি রাগি বেড়াল। চলবে। আমার চলবে। এসো সুন্দরী। প্যান্ট খোলো।'

এইসময় প্রথম জন বলল, 'একটা গাড়ি আসছে। নীল সুমো।'

তৃতীয় জন বলল, 'আসুক। আমাদের দেখে দাঁড়াবে না।'

গাড়িটা কাছাকাছি আসতেই ছেলেটা এগিয়ে গেল। 'দাঁড়াবেন না, চলে যান।

বাবার খেলা দেখাতে নেই। যা এখান থেকে।'

সুমো গাড়িটা গতি কমিয়েছিল, শোনামাত্র তীব্র বেগে চলে গেল।

ছেলেগুলো যখন গাড়ির দিকে তাকিয়ে তখন চারফুটের একটা বাঁশের দিকে চোখ গেল নীপার। রাস্তার পাশে পড়ে আছে। চকিতে তুলে নিল সে ওটাকে। স্কুলের শেষ কয়েক বছরে মেয়েদের ক্লাসে উষাদি মেয়েদের ক্যারাটে শিখিয়েছিলেন। সেকথা মনে পড়তেই অদ্ভুত জোর পেল নীপা। ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি কিছু বোঝার আগেই তার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতেই ছেলেটা টলতে টলতে বালির ওপর পড়ে গেল। তাই দেখে তৃতীয় ছেলেটি এগিয়ে এল, 'তবে রে শালি, দেখাচ্ছি তোকে মজা।' কোমর থেকে একটা লোহার শেকল খুলে নিয়ে বনবন করে ঘুরিয়ে এগিয়ে এল নীপার দিকে। নীপা বাঁশ ওপরে তুলে আঘাত করতে যেতেই তার গায়ে শেকল জড়িয়ে গেল। বাঁশটাকে নাড়াতে পারছিল না নীপা। শেকলের টানে তার হাতছাড়া হয়ে গেল বাঁশটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল নীপা, কিন্তু সেই অবস্থায় মরিয়া হয়ে লাথি ছুড়ল ছেলেটার তলপেটের উদ্দেশ্যে। 'ওরে বাবা গো' বলে চেঁচিয়ে ছেলেটা চেন ফেলে দিয়ে নিজের যৌনাঙ্গ চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। নীপা সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটা তুলে ধরে মাথার ওপর তুললেই প্রথম ছেলেটার গলা শুনতে পেল, 'মারলেই গুলি করব।'

মুখ ফেরাল নীপা। প্রথম ছেলেটা, হাতে রিভলভার।

নীপা বাঁশ ফেলে দিতে বাধ্য হল। দ্বিতীয় ছেলেটা ততক্ষণে উঠে বসেছে, 'মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল। আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে শালি।'

প্রথম ছেলেটা এগিয়ে এল, 'বাইক চালাতে পারবি না?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে ফেটে গেছে।'

'যাই হোক, বাইক চালাতে হবে। ও শালাকে আমি আমার সামনে বসিয়ে নিচ্ছি।' তারপর নীপার দিকে রিভলভারের মুখ ঘোরাল। 'যা আছে দে।'

নীপা ওর ব্যাগ আর ঘড়ি খুলে দিতে বাধ্য হল।

ঠিক তখনই বাইকের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ কানে আসতেই ওরা অবাক হয়ে দেখল জাঙিয়া পরা অবস্থায় টোটা বাইক চালিয়ে বেরিয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

'সর্বনাশ!' প্রথম ছেলেটা ছুটে গেল দ্বিতীয় বাইকের দিকে।

এদিকের গোলমালে কেউ খেয়াল করেনি টোটাকে। সে গাড়ির ওপাশে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। কারো নজর না থাকায় সে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল বাইকের কাছে। প্রথম ছেলেটা বাইক চালু করে ঘুরিয়ে নিয়ে টোটাকে ধরবে বলে ধাওয়া করতেই নীপা বাঁশটাকে তুলে নিয়ে ছুড়ল ওর দিকে। ঠিক বল্লমের মতো সেটা আঘাত করল বাইকের পেছনের চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গেল ছেলেটা বাইক থেকে। আছড়ে পড়ল রাস্তায়। বাইকটা গোঁত্তা খেয়ে লাফিয়ে অনেকটা ছুটে উলটে পড়ল।

চাকা ঘুরতে লাগল বনবন করে।

মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড চোট পেয়েছিল ছেলেটা, কিন্তু সেটা উপেক্ষা করে রিভলভার বের করে শুয়ে শুয়েই গুলি ছুড়ল পেছন দিকে।

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে ফুল এগিয়ে গিয়ে নীপাকে টেনে নিয়ে এল গাড়ির এপাশে, 'চল পালাই।'

'কোথায় পালাব?'

দূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যেতে ফুল বলল, 'চল গাড়ি থামাই।'

নীপা মুখ বের করতে সাহস পাচ্ছিল না গুলি লাগার ভয়ে। হঠাৎ কানে এল টোটার গলা, 'এই যে স্যার, এখানে।'

ফুল বলল, 'টোটা ফিরে এসেছে, চল সামনে যাই।'

ওরা বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল টোটা বাইক ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে তার প্যান্টে পা গলাচ্ছে। পুলিশের একটা জিপ থেকে নেমে কয়েকজন সেপাই প্রথম ছেলেটাকে রিভলভার সমেত ধরে ফেলেছে অফিসারের নির্দেশে। এবার লক্ষ্যবিহীন গুলি ছোঁড়ার পরে আছাড় খেয়ে পড়ার যন্ত্রণায় সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। বাকি দুজনকেও তোলা হল জিপে। ততক্ষণে পোশাক পরে নিয়েছে টোটা।

এতক্ষণ এই রাস্তায় গাড়ি ছিল না। ছেলেগুলো ওদের আটকানোর পর মাত্র একটি গাড়ি এয়ারপোর্টের দিকে গিয়েছে। কিন্তু এখন এক এক করে গোটা চারেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। তাদের একটি থেকে ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন হাতে নেমে এল তিনজন, 'ঘটনাটা কি ঘটেছিল অফিসার?'

'এখনও আমি ভালোভাবে জানি না। তিনজন ক্রিমিন্যাল এই ছেলেমেয়েগুলোকে আটকে ছিনতাই করতে চেয়েছে, শ্লীলতাহানি করতে চেষ্টা করেছে। ডিটেলস আমি থানায় গিয়ে জানতে পারব।' অফিসার ঘুরে টোটাকে বললেন, 'গাড়িতে উঠুন। আমাকে ফলো করে থানায় আসুন। একজন সেপাই নেমে যাও বাইক দুটোর জন্যে।'

টেলি সাংবাদিক টোটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই তিনজনকে কে বাধা দিল? ওরা তো দেখছি বেশ আহত হয়েছে।'

টোটা আঙুল তুলল, 'আমাকে ওরা রিভলভার দেখিয়ে মাটিতে উপুড় করে রেখেছিল। যা করার ও একাই করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চলে গেল নীপার সামনে। 'আপনার নাম কি?'

'নীপা।'

'দেখুন ভাই, আপনার যা প্রশ্ন করার তা থানায় এসে করুন। এখন ওদের যেতে দিন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। চলুন, গাড়ি চালান।' অফিসার চেঁচিয়ে বলতেই ওরা গাড়িতে উঠে বসল।

জিপের পেছনে যেতে যেতে টোটা বলল, 'আজ আর সিনেমায় যাওয়া হল না।'

তারপরই সে খিঁচিয়ে উঠল, 'তোর জন্যে। স্বপ্নের রাস্তা দেখাতে নিয়ে এসেছিলি। তুই ইনসিস্ট না করলে আমরা এদিকে আসতামও না, কিছুই হত না।'

'আমি কি জানতাম এরকম হবে!' ফুল প্রতিবাদ করল।

'নীপা যদি ওদের অ্যাটাক না করত তাহলে কি অবস্থা হত ভেবে দ্যাখ।'

'সত্যি। নীপা তুই যা করেছিস না! উঃ! যেন সিনেমা দেখলাম। কিন্তু টোটা, তুই অফিসারকে বললি তোকে মাটিতে রিভলভার দেখিয়ে শুইয়ে রেখেছিল বলে কিছু করতে পারিসনি। ভাবখানা এমন তা না হলে মেরে ফাটিয়ে দিতিস।' ফুল মুখ বাঁকাল।

'তুই কি করছিলি! ওরে মাগো বাবাগো।' গলা নকল করল টোটা, 'ঠকঠক করে কাঁপছিলি। নীপা না থাকলে আজ তার হয়ে যেত।'

এতক্ষণে নীপা কথা বলল, 'টোটা বাড়ি ফিরে চল।'

'মানে?'

'থানায় গেলে সারা পৃথিবী জেনে যাবে। কেন এতদূরে এসেছিলাম তার কি কৈফিয়ত দেব বাড়িতে?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'কিন্তু পুলিশ তো থানায় যেতে বলেছে।'

'তুই আস্তে চালা, জিপটাকে এগিয়ে যেতে দে, তারপর...।'

'কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই পরে ধরে ফেলবে আমাদের।'

'তুই কি তোর ঠিকানা বলেছিস?'

'না।'

'তাহলে খুঁজেই পাবে না।'

ফুল বলল, 'কক্ষনো না। যে ছেলেটা আমার গায়ে হাত দিয়েছিল তাকে আমি কখনোই ছাড়ব না। তোরা কেউ না গেলে আমিই থানায় যাব।'

নীপা বলল, 'আমিও চাই ওদের শাস্তি হোক। কিন্তু বাড়িতে কি বলবি?'

'যা সত্যি তাই বলব।' ফুল মুখ ঘোরাল।

পুলিশের জিপকে অনুসরণ করে থানায় পৌঁছোতে ছেলে তিনটেকে নামানো হল। তিনজনেই এখন টলছে। বোঝাই যাচ্ছে আঘাত গুরুতর। ও সি বেরিয়ে এলেন। অফিসারের কাছে সব শুনে ওদের হাসপাতালে পাঠালেন চিকিৎসার জন্যে।

এরই মধ্যে টিভি সাংবাদিকের গাড়ি এসে হাজির। ও সি টোটাদের বললেন তাঁর চেম্বারে চলে আসতে।

মিনিট পাঁচেক বাদে ও সি জেরা শুরু করলেন, 'নাম?'

'টোটা দত্তগুপ্ত।'

'কি করা হয়?'

'এম এ পরীক্ষা দিয়েছি।'

'এরা?'

'আমরা বন্ধু। ও নীপা আর ও ফুল্লরা।'
'গাড়িটা কার?'
'আমার বাবার।' টোটা বলল।
'ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি?'
পকেট থেকে পার্স বের করে ড্রাইভিং লাইসেন্স তুলে নিয়ে সামনে রাখল টোটা। সেটা দেখে নিয়ে ও সি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?'
টোটা বলল, 'অত সুন্দর রাস্তায় কখনো গাড়ি চালাইনি তাই বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'
'বাবা কি করেন?'
'ইনকামট্যাক্স কমিশনার।'
ও সি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর একই ধরনের প্রশ্ন করলেন নীপা এবং ফুলকে।
এরপরে ঘটনাটা ঠিক কি ঘটেছিল তা বিস্তৃত বিবরণ শুনে লিখে ফেললেন। প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা লেখার পর সই করিয়ে নিলেন।
ও সি তাকালেন নীপার দিকে, 'তুমি এত সাহস পেলে কি করে?'
'জানি না। ওর যা বলছিল এবং করছিল তাতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম।'
'একজন ঘরোয়া বাঙালি মেয়ে তিনটে দুর্বৃত্তকে ওভাবে মারতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে। কিন্তু ধরো, ওদের কেউ যদি মারা যেত? এখনও সেই সম্ভাবনা নেই তা নয়। তাহলে?' ও সি তাকালেন।
'আমার একটুও আক্ষেপ হত না। পৃথিবী থেকে অন্তত একজন বর্বর মরে গেছে শুনে খুশিই হতাম।'
'তোমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এলে?'
'বলতাম যা করেছি তা আত্মরক্ষার জন্যে করতে বাধ্য হয়েছি।'
'গুড।'
এইসময় টেলিফোন বাজল। ও সি রিসিভার তুলে বক্তব্য শুনে বললেন, 'হ্যাঁ। ওরা এখন আমার সামনেই বসে আছে।' রিসিভার রাখতেই আবার ফোন।
'হ্যালো! ইয়েস। ও। সেন্স এসেছে? ঠিক আছে। আমি লোক পাঠাচ্ছি।' ও সি রিসিভার রেখে বললেন, 'ওদের সেন্স এসেছে। ডাক্তার বলছেন মারা যাওয়ার ভয় নেই।' তিনি বেল টিপতেই সেই অফিসার ঘরে ঢুকলেন।
'আপনি এখনই তিনজন কনস্টেবলকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। কাল সকাল পর্যন্ত ওদের পাহারা দেবে। ওখান থেকেই কাল কোর্টে তুলবেন।' ও সি বললেন।
'ঠিক আছে। কিন্তু স্যার, বেশ কিছু কাগজের রিপোর্টের, টিভির লোক বাইরে অপেক্ষা করছে ওদের ইন্টারভিউ করবে বলে।'
'এস পি আসছেন। ততক্ষণ ওদের অপেক্ষা করতে বলো।' ও সি উঠে দাঁড়ালেন।

নীপা ঘড়ি দেখল। টোটাকে বলল, 'তোর মোবাইলটা দিবি? বাড়িতে—।'

ও সি বললেন, 'তুমি ওই ল্যান্ড-লাইনটা ব্যবহার করো।'

একপাশে রাখা টেলিফোন টেনে নিয়ে ডায়াল করল নীপা। ওদের বাড়িতে একটাই ফোন। একতলার বসার ঘরে। তার দুটো এক্সটেনশন। একটা বাবার চেম্বারে, অনটা দোতলায়।

'হ্যালো। কে?' ঠাকুমার গলা।

'আমি নীপা। মা কোথায়?'

'জানি না। বোধহয় নীচে।'

'তুমি মাকে বলে দাও আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হবে, চিন্তা না করতে।'

'কত দেরি হবে?'

উত্তর না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল নীপা। ফুলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই বাড়িতে জানাবি না?' ফুল মাথা নাড়ল, 'এখনো সময় হয়নি।'

উত্তর চব্বিশ পরগনার এস পি অবাঙালি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলেন। থানায় এসে আলাপ করার পর ভদ্রলোক খুব প্রশংসা করতে লাগলেন, 'খুব ভালো কাজ করেছ তোমরা। বিশেষ করে তুমি। মেয়েরা যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে এইসব বদমাশদের সংখ্যা কমে যেতে বাধ্য।'

এস পি ওদের যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে যেন তিল গলার জায়গা নেই। ওরা ঢুকতেই ফ্ল্যাশ বাল্ব আলো ছড়াতে লাগল। ভিডিয়ো ক্যামেরা চলতে শুরু করল।

এস পি বললেন, 'এই তিনজন খুব ক্লান্ত। বুঝতেই পারছেন বিরাট ঝড় বয়ে গেছে ওদের ওপর দিয়ে। তাই দয়া করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবাণ ছুটে আসতে লাগল। ছেলে তিনটেকে ওরা চিনত কিনা? কেন ওই রাস্তায় ওরা গিয়েছিল? গাড়ি থামাবার পর ছেলেগুলো কি বলেছিল?

জবাব দিচ্ছিল টোটা। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, আপনার গায়ে কি ওরা হাত দিয়েছিল? মানে শ্লীলতাহানি করেছিল?'

ফুল মাথা নিচু করল। নীপা বলল, 'হ্যাঁ। সেই চেষ্টা করছিল।'

'করছিল। কিভাবে করছিল?'

'আপনি এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না। শুনলেই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সেই ছেলেটার কোনো তফাত নেই।' নীপা বলল।

এস পি বললেন, 'কারেক্ট। প্রশ্ন করতে গিয়ে রুচি হারাবেন না প্লিজ।'

'শুনলাম আপনি একাই তিনজনকে ঘায়েল করেছেন। আপনি কি ক্যারাটে বা ওই রকম কিছুর ট্রেনিং, নিয়েছিলেন?'

'না। ট্রেনিং বলতে যা বোঝায় তা নেওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে স্কুলে গেমস

টিচার উষাদি কি করে আত্মরক্ষা করতে হয় তা শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্কুল ছাড়ার পর সেই চর্চা আর ছিল না।'

'তাহলে একা কি করে করতে পারলেন?'

'মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম তা না হলে ওরা আমাদের দুজনকে শেষ করে দেবে। তখন আর মাথা ঠিক ছিল না।'

'আপনার বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করেনি?'

'টোটাকে ওরা উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল। আর ফুল এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে—। তবু টোটা ওদের চোখ এড়িয়ে ওদেরই বাইক নিয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশকে খবর দিতে। ও যদি না যেত তাহলে আমার পক্ষে ওদের আটকানো আর সম্ভব হত না।'

'আপনি কি চান সমস্ত বাঙালি মেয়ে এইভাবে রুখে দাঁড়াক?'

'বাঙালি কেন, সব মেয়েরই উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।'

এস পি বললেন, 'অনেক হয়েছে। বাকি যা জানার তা থানার অফিসারদের কাছ থেকে আপনারা জেনে নিন। ওদের বাড়ি ফিরতে দিতে হবে।'

ওই ভদ্রলোকই ওদের বাইরে বের করে এনে গাড়িতে তুলে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'আশা করি যখন যেমন প্রয়োজন হবে তখন তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। গুড নাইট।'

টোটা গাড়ি চালাল। নিক্কো পার্কের সামনে আসতেই পাশে এসে গেল আর একটা গাড়ি। আমরা টিভি চ্যানেল থেকে বলছি। আপনারা কি এরপরে আর কখনো ওইরকম নির্জন রাস্তায় বেড়াতে যাবেন?'

উত্তর না দিয়ে টোটা গাড়ির গতি বাড়াল।

রিমোটের ব্যাটারি কিনে আনতে বাবুরামকে দোকানে পাঠিয়েছিল সুভদ্র। বিছানা থেকে নেমে টিভির বোতাম টিপে টিপে চ্যানেল ঘোরাতে বিরক্ত লাগে। যাওয়ার আগে বাবুরাম একটা বাংলা চ্যানেল চালিয়ে গিয়েছে। সেখানে খবর শুরু হচ্ছে। খবর শোনার অভ্যাস সুভদ্রের নেই। বিছানা থেকে নেমে টিভি পর্যন্ত যেতে যে পরিশ্রম সেটা করবে কিনা ভাবছিল সে, কিন্তু তার আগেই খবর আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমেই ঘোষক উত্তেজিত গলায় বললেন, 'বাঙালি তরুণীর দুঃসাহসিক প্রতিরোধে তিন দুর্বৃত্ত পুলিশের হাতে বন্দি, বাগমারির খাল সংস্কার করে বিনোদনের পরিকল্পনা, পেট্রোল-ডিজেলের দাম পুনর্বিবেচনা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, বাসভাড়া বাড়া মানে ড্রাইভার কন্ডাক্টারদের আয় বৃদ্ধি। শিরোনামের পর এবার বিস্তারিত খবর, আজ অপরাহ্নে রাজারহাট হাইওয়ের নির্জন অংশে তিন দুর্বৃত্ত মোটর বাইকে চেপে একটি মারুতি এইট হান্ড্রেডকে আটকায়। সেই গাড়িতে দুজন তরুণ এবং একটি তরুণ ছিলেন। তাঁরা সহপাঠী, বেড়াতে গিয়েছিলেন সুন্দর রাস্তায়। দুর্বৃত্তরা তাঁদের টাকা,

সোনার গহনা লুট করার পর যখন প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হয়েছিল তখন একজন তরুণী মরিয়া হয়ে আক্রমণ করেন। সেই তরুণীর প্রতিরোধে দুর্বৃত্তরা আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় দুর্বৃত্তরা ধরা পড়ে।

সংবাদ-পাঠক চুপ করতেই ছবি ভেসে উঠল। অলস চোখে দেখছিল সুভদ্র। ছবি দেখামাত্র সে চমকে উঠল। নীপা! নীপা দাঁড়িয়ে আছে! ঘোষকের গলা শোনা গেল, 'মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ঘরোয়া এই তরুণীর নাম নীপা। রাজারহাট থানায় আমরা যখন তার মুখোমুখি হই তখন সে স্থির।

টিভি সাংবাদিক॥ আপনি একাই তিনজনকে ঘায়েল করেছেন। আপনি কি ক্যারাটে বা ওইরকম কিছুর ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নীপা॥ না। ট্রেনিং বলতে যা বোঝায় তা নেওয়ার সুযোগ আমার হয়নি।

সাংবাদিক॥ তাহলে একা কি করে করতে পারলেন?

নীপা॥ মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম তা না হলে ওরা আমাদের দুজনকে শেষ করে দেবে। তখন আর মাথা ঠিক ছিল না।

সাংবাদিক॥ আপনি কি চান সমস্ত বাঙালি মেয়ে এইভাবে রুখে দাঁড়াক?

নীপা॥ বাঙালি কেন? সব মেয়েরই উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।

ক্যামেরা চলে এল সংবাদ পাঠকের সামনে, 'এরকম অসামান্য প্রতিরোধের খবর পেয়ে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী নীপা এবং তার বন্ধুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য বলেছেন—।'

হাত বাড়িয়ে বেলের বোতামে জোরে চাপ দিল সুভদ্র। সারা বাড়িতে বেল বাজছে হই হই করে। বাবুরাম নিশ্চয়ই ফেরেনি। সদ্য ঘুম ভাঙা সৌগত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ভাই-এর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, 'পাগল হলে নাকি?'

'ও মেজদা, টিভি দেখেছ? নীপাকে দেখাল। নীপা দারুণ কাজ করেছে।'

'কি যা তা বলছ?' সৌগত অবাক হল।

'আমি নিজের চোখে দেখলাম। টিভিতে বলল ও তিনজন গুণ্ডাকে একাই মেরে শুইয়ে দিয়েছে। ওর ইন্টারভিউ টিভিতে দেখাল।' উত্তেজিত হয়ে বলল সুভদ্র। সৌগত তখনও সন্দিগ্ধ চোখে ছোট ভাইকে দেখছিল। বাল্যকালে পোলিয়ো-তে আক্রান্ত ছোট ভাই এই ঘরে নিজের মতো থাকে। এরকম উত্তেজিত হয়ে মিথ্যে বলছে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু নীপার মতো নরম আটপৌরে মেয়ের পক্ষে ওরকম কিছু করা সম্ভবই নয়। এইসময় বাবুরাম ওপরে উঠে আসতেই সৌগত তাকে বলল, 'বউদিকে একবার আসতে বলো ওপরে।' বাবুরাম চলে যেতেই হল ঘরের ফোন বাজল।

সৌগত রিসিভার তুলতেই ছোট বোনের গলা কানে এল। বেশ উত্তেজিত হয়ে ছোটবোন বলল, 'কে? মেজদা? টিভি দেখেছিস? নীপা আজ কি কাণ্ড করেছে?

ভাবতেই আমার বুক কাঁপছে। জানিস, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ওকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ও কোথায়? বাড়িতে ফিরেছে তো?'

'তোর এতগুলো প্রশ্নের জবাব কি করে দেব? আমি এইমাত্র ছোটর মুখে ব্যাপারটা শুনলাম। ও এলে বলব তোর সঙ্গে কথা বলতে।' রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মেজো বোনের ফোন, 'টিভিতে দেখলাম। ওর যদি আজ কিছু হয়ে যেত! ওসব জায়গায় যাওয়ার কি দরকার ছিল নীপার! বড় বউদি ওকে এতটা স্বাধীনতা না দিলেই পারত।' সৌগত বলল, 'ঠিক আছে। আমি পরে কথা বলব।'

বড় বউদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখে রিসিভার নামিয়ে রাখল সৌগত। ওপরে উঠে গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

সৌগত কিছু বলার আগেই রমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এই যা! আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। নীপা ফোন করেছিল। বললে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে। তুমি যেন চিন্তা না করো।'

'সে তো এখন বাথরুমে।' গৌরী হাসলেন।

সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'বাথরুমে? কখন ফিরেছে?'

'এই তো একটু আগে। কেন, কি হয়েছে?' গৌরী বুঝতে পারছিলেন না কিছু।

'এসে কিছু বলেনি নীপা?'

'না তো। বলল খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। বলে বাথরুমে ঢুকে গেল।'

'কি মেয়ে রে বাবা!' সৌগত বলে ফেলল।

এবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন গৌরী, 'ও কি কিছু করেছে?'

এইসময় ক্লাচ বগলে নিয়ে সুভদ্র বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। সৌগত রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই বড় বোনের গলা কানে এল, 'মেজোর কাছে শুনলাম। নীপা বাড়িতে ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কিছু হয়নি তো?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। ও বাথরুমে ঢুকেছে।'

'ওইটুকুনি মেয়ের এত সাহস হল কি করে! আমি হলে ভয়েই মরে যেতাম। 'বড় বোন শ্বাস ফেলল।

'তুমি তো মরেই আছ।' রিসিভার নামাতেই আবার রিং শুরু হল। সৌগত গৌরীকে বলল, 'এবার তুমি ধরো বউদি। এক কথা শুনতে শুনতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

গৌরী এগিয়ে যেতে রমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কথা রে?'

'তোমার নাতনি আজ বিখ্যাত হয়ে গেছে!' সৌগত বলল।

'পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে বুঝি?' রমা হাসলেন।

গৌরী রিসিভার তুলে জানান দিতেই ওপাশ থেকে ছোটকাকার গলা কানে এল,

'কে বলছ? বউমা নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনারা কেমন আছেন?'

'আমরা? এই খবর শোনার পর কি করে ভালো থাকি বলো? কিছু মনে করো না বউমা, বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছি মেয়েমানুষ হল জলের মতো, যে পাত্রে রাখবে সেই পাত্রের আকার নেবে। তার চারপাশে বাঁধ না বাঁধলে দু'ধারের জমি বানে ভাসিয়ে দেবে। তোমরা এত শিক্ষিত হয়েছ আর এই সত্যিটা জানো না? সৌমিত্র না হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টাকার পেছনে ছুটছে, তুমি হাল ধরবে না? বউদির কথা বাদ দিলাম। তার বয়স হয়েছে। দাদা নেই বলে পায়ের তলায় মাটি নেই। কিন্তু এর পরে কি করবে?'

'ছোটকাকা, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এসব কথা বলতে ফোন করলেন কেন?' গৌরী একটু উষ্ণ হলেন।

'ও। তোমাদের ব্যাপারে আমার কথা বলা উচিত নয় বলছ?'

'না। আমি সেকথা বলিনি। কিন্তু কেন বলছেন তাই জানতে চাইছি?'

'তুমি, তোমরা আজ টিভি দ্যাখোনি?' ছোটকাকার গলায় বিদ্রূপ।

'না। এখন এত কাজ থাকে যে সময় পাই না।'

'অ।' ছোটকাকা বললেন, 'তাহলে এর পরে যখন খবর হবে তখন টিভি দেখো! তোমার মেয়ের ছবি দেখিয়েছে, তার ইন্টারভিউ নিয়েছে। সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়েছিল রাজারহাটে। যেখানে এখন মানুষজন নেই সেখানে বিকেলবেলায় গাড়িতে ঘুরছিল। এতটা সাহস ওর হল কি করে?'

ছোটকাকা বোধহয় উত্তরের আশায় চুপ করলেন। গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

'তিন-তিনটে গুন্ডা ওদের আক্রমণ করে, শ্লীলতাহানি করে। তোমার মেয়ে তাদের মরিয়া হয়ে ঠেঙিয়েছে। টিভির ইন্টারভিউতে নিজের মুখে একথা বলেছিল। বলেছে সব মেয়ের উচিত রুখে দাঁড়ানো। তার মানে বিয়ের পর স্বামী শাসন করলে সে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে বলছে। আচ্ছা, বউমা, এরপরে তোমার ওই মেয়ের বিয়ে হবে? কোন্ ছেলে ওকে বিয়ে করতে চাইবে?'

'আমি এসব কিছুই জানি না ছোটকাকা!'

'জানবে কি করে? মেয়ে কখন কি করছে তার খেয়ালে রাখো? সে নিশ্চয়ই এখনও বাইরে হাততালি কুড়োচ্ছে?'

'না। বাড়িতে ফিরে এসেছে।'

'আশ্চর্য! এসে তোমাকে এসব কথা বলেনি?'

গৌরী চুপ করে থেকে বললেন, 'ছোটকাকা, এখন রাখি?'

'শোনো বউমা তোমার মেয়ের জন্যে আমি একটি সুপাত্র পেয়েছিলাম। জানি না, এরপরে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে কিনা!' ছোটকাকা ফোন রেখে দিলেন।

সৌগত বলল, 'বুঝতে পেরেছি। বুড়ো মেশিনগান চালাল তো?'

'আমি ভাবতেই পারছি না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

সৌগত বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়—?'

এইসময় সুভদ্র বলল, 'এখনই আর একটা খবর আরম্ভ হবে, তোমরা যদি দেখতে চাও তো আসতে পারো।' ক্রাচে ভর করে সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

সৌগত বাবুরামকে পাঠাল নীপাকে ডেকে আনতে। রমা, গৌরী এবং সৌগত সুভদ্রের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সুভদ্র মা-বউদিকে বসতে বললে শুধু রমাই বসলেন। রিমোট ঘুরিয়ে ঠিক চ্যানেল নিয়ে যাওয়া মাত্র খবর শুরু হল।' আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। আজ বিকেলে দ্বিতীয় উপনগরী রাজারহাটের হাইওয়েতে একজন বাঙালি তরুণী অভূতপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে তিন দুর্বৃত্তকে ঘায়েল করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এবার ইংরেজিতে এম এ পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রী নীপার এই বীরত্ব দেখে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় যুবমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।' এরপরে অন্য হেড লাইন বলা হতেই রমা চিৎকার করে উঠলেন, 'নীপা, এ কি আমাদের নীপা?'

আবার মূল খবর বিস্তারিত ভাবে বলা শুরু হতেই নীপার মুখ পর্দায় ভেসে উঠল। পুরো ঘটনাটা দেখে শুনে টিভি বন্ধ করে দিতেই দরজা থেকে গলা ভেসে এল, 'বড়কা, আমায় ডেকেছ?'

কেউ কিছু বলার আগেই জবুথবু শরীরটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে এলেন রমা, এসে জড়িয়ে ধরলেন নাতনিকে, 'তুই কী কাণ্ড করেছিস! একাই তিন তিনটে গুন্ডাকে মেরে জব্দ করেছিস! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে দিদা, তোর জন্যে গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে রে।' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন রমা।

সুভদ্র বলল, 'না, আর নীপার সঙ্গে দুস্টুমি করা যাবে না। ওর গায়ে এত জোর তা কে জানত!'

ঠাকুমাকে একপাশে সরিয়ে নীপা সৌগতর দিকে তাকাল, 'বলো!'

'কি বলব?' মায়ের ওই আচরণের পর কথা খুঁজল সৌগত।

'ডেকেছিলে তো কিছু বলবে বলেই।'

সৌগত বলল, 'ফ্লুক বলে একটা শব্দ আছে। প্রায় অসম্ভব কিছু আচমকা একবারই সম্ভব হয়। বারংবার দূরের কথা দ্বিতীয়বার হয় না। যে ঘটনা আজ ঘটেছে দ্বিতীয়বার তা ঘটবে এমনটা আশা কোরো না। তোমার মনে যদি আজকের পরে সাহস বেড়ে যায় তাহলে খুব ভুল করবে!' সৌগত বলল।

নীপা মাথা নিচু করতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই যে রাজারহাটে যাবি তা কি আমাকে বলে গিয়েছিলি?'

'ওখানে যাওয়ার কথা ছিল না। তোমাকে বলেছিলাম সিনেমায় যাব।'

'সিনেমায় না গিয়ে ওরকম জায়গায় গেলি কেন?',

'টিকিট পাইনি। টোটা আর ফুল বলল সল্টলেকের সিটি সেন্টারের আইনক্সে টিকিট পাওয়া যাবে। ওদিকে যেতেই ফুল ইনসিস্ট করল একবার রাজারহাট ঘুরে দেখতে। সত্যি বলছি, আমরা প্ল্যান করে যাইনি।' নীপা বলল।

সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'টোটার গাড়ি?'

'হ্যাঁ।' নীপা বলল।

'ওই রোগপটকা ছেলেটা? যাকে টিভিতে দেখাল?'

গৌরী বললেন, 'টোটাকে আমি দেখেছি। কয়েকবার বাড়িতে এসেছে। ভদ্র ছেলে। একসঙ্গে পড়ে ওরা। তা তোরা ওই টোটার সঙ্গে গেলি কোন্ সাহসে? টোটা তো ঝড় বইলেই পড়ে যাবে। তোদের ও কোনো বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না তা জানিস না?'

'আশ্চর্য! ওখানে গেলে বিপদে পড়ব জানলে কি যেতাম?'

গৌরী মেয়ের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'একটু আগে ছোটকাকা ফোনে যা তা বললেন। তোর জন্যে এসব কথা শুনতে হল আমাকে। সত্যি তো, গুন্ডাগুলো যদি তোদের ভয়ংকর ক্ষতি করত? ভাবতেই বুক হিম হয়ে যাচ্ছে। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি এবাড়ি থেকে বেরুবে না।' গৌরীর কথা শেষ হওয়ার আগেই সৌমিত্র উঠে এলেন ওপরে। জটলাটা দেখলেন।

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে তোমরা আমাকে তা জানাবার প্রয়োজন মনে করোনি?'

সৌগত বলল, 'আমরা এইমাত্র জেনেছি। বউদিও কিছুই জানত না।'

'তোমাকে কে বলল?'

'হাইকোর্টের একজন বিচারক মোবাইলে ফোন করে অভিনন্দন জানাতে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তিনিই বললেন। আর এখন তো বাড়ির সামনে গাড়ির ভিড় লেগে গেছে। সবাই নীপার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।' সৌমিত্র বললেন

'কারা?'

'কাগজের লোকজন।'

সৌগত হলঘর পেরিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে নীচে তাকাতেই দেখল বাড়ির সামনে অন্তত গোটা আটেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘড়ি দেখল। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে আজ অথচ এই অবস্থায় চলে যাওয়া ঠিক নয়।

সে ফিরে এসে শুনল সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করছেন, 'নীপা, তোর লাগেনি তো!'

'না।'

'এটা কি করে সম্ভব হল? তুই একা তিনটে লোককে শুইয়ে দিলি অথচ, তোর গায়ে আঁচড় লাগল না! ও হ্যাঁ, তোর কোনো টিচার নীচে অপেক্ষা করছেন।'

'টিচার?' গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'স্কুলের। নাম বললেন উষাদি। আয়।'

সৌমিত্র নীচের দিকে এগোলে নীপার পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। মা-কাকার কথায় সে বুঝতে পারছে না কাজটা করা ঠিক হয়েছে কিনা। রমা চলে গেলেন তাঁর ঘরে। অন্যেরা নীচে। সুভদ্র ভালো করে চুল আঁচড়ে জানলার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল, তারপর বাইরে দিকে তাকিয়ে হাসল। এ ঘরের আলোয় তাকে যে দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ তার নেই। হোস্টেলের জানলাগুলোতে কেউ নেই। কিন্তু তার পাশের ফ্ল্যাটের জানলায় একটি নতুন মুখ। কুড়ি থেকে তেইশের একটি মিষ্টি মুখ। চোখাচোখি হতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার মানে মেয়েটি তাকে দেখছিল। বাঁ হাতে চুল ঠিক করে আবার তাকাতে সুভদ্র দেখল জানলায় কেউ নেই।

নীচের হলঘর ভর্তি লোক। কারও কারও হাতে ক্যামেরা। নীপা নামা মাত্র আলো আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। ছবি তুলে যাচ্ছে ক্যামেরাম্যানেরা। তারপর শুরু হল আর এক প্রস্থ প্রশ্নের ঝড়। যতটা সম্ভব কম কথা বলল নীপা। ঝড় থামতে ওঁরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন যে মহিলা আড়াল থেকে সামনে এগিয়ে এলেন তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেনি নীপা। হাসি দেখেই সে বুঝতে পারল। এগিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'টিভিতে খবরটা দেখে সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি রে।'

'আপনি এই বাড়ি চিনলেন কি করে উষাদি?'

'রাজারহাট থানায় ফোন করে ঠিকানা জেনে নিলাম। তুই যে সবার কাছে আমার নাম বলবি তা আমি ভাবতেই পারিনি।' উষাদি বললেন।

'বাঃ। আপনিই তো ক্লাশ নাইনে আমাদের ক্যারাটে শেখাবার সময় বলতেন, মনে জোর আনো। একজন মেয়ে ক্যারাটে শিখলে আত্মরক্ষা করার জন্যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। আমি ক্যারাটে ভুলে গিয়েছি। চর্চাও নেই। কিন্তু আজ বিপদের সময় আপনার কথা মনে আসায় ভয় চলে গিয়েছিল।' নীপা বলল।

'তাই বল। খবর শুনে আমি ভাবলাম তোরা তো কিছুই ভালো করে শিখিসনি। ক্যারাটের চেয়ে অন্য গেমসের দিকে তোদের আকর্ষণ বেশি ছিল। তাহলে তুই আজ ছেলেগুলোকে ঠান্ডা করতে পারলি কি করে? যাক, ভালো থাক। কি পড়ছিস এখন?'

'ইংরেজিতে এম এ দিয়েছি এবার।'

'তাই বুঝি! তাহলে তো বড়ই হয়ে গেছিস।'

নীপা পেছনে দাঁড়ানো মায়ের দিকে তাকাল, 'মা, ইনি উষাদি, স্কুলে আমাদের গেমস টিচার ছিলেন! আর আমার বাবা। সৌমিত্রকে দেখাল সে।

গৌরী বললেন, 'একটু বসুন, চা আনছি।'

'না ভাই। আমি চা খাই না। মেয়ের কথা জেনে না এসে পারলাম না। এরকম

সন্তানের জন্যে বাবা-মায়ের কৃতিত্বও কম নয়। আচ্ছা—।' নমস্কার করে চলে গেলেন ঊষাদি।

সৌমিত্র তাঁর টেবিলে বসে দ্রুত টেলিফোনের খাতা খুলে নাম্বার দেখে নিয়ে ডায়াল করলেন, 'এস পি নর্থ চব্বিশ পরগনা প্লিজ।' একটু চুপ করে ওপাশের উত্তর শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁকে এখন কোথায় পাব?' 'ও। রাজারহাটের নাম্বারটা দিন। খুব জরুরি। হ্যাঁ।' নাম্বারটা লিখে নিয়ে আবার ডায়াল করলেন। রিং হল। কেউ রিসিভার তুলতেই সৌমিত্র বললেন, 'আমি সৌমিত্র সোম, হাইকোর্টে ওকালতি করি, এস পি-র সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি ও সি বলছি। এস পি সাহেব একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।'

'ও, নমস্কার।' সৌমিত্র বললেন, 'আজ রাজারহাট হাইওয়েতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।'

'বেশ বলুন।' ওসি বললেন।

'আমি নীপার বাবা।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

'আমি একটা অনুরোধ করছি। যে কেউ নীপার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলেই আপনি সেটা দেবেন না।'

'হ্যাঁ। এক ভদ্রমহিলা ক্লেইম করলেন যে তিনি নীপার স্কুল টিচার। তাই দিয়েছি। ওর পরে বেশ কয়েকজন ঠিকানা বা ফোন নাম্বার চেয়েছিল, আমরা দিইনি। মিস্টার সোম, আপনি যা আশঙ্কা করছেন তা আমি জানি। কিন্তু ওই টিচারের নাম নীপার মুখে শুনেছিলাম বলেই ওঁকে ঠিকানাটা দিয়েছি।' ও সি হাসলেন, 'এ ব্যাপারে আর উদ্বিগ্ন হবেন না।'

'আর একটা কথা। ওই তিনটে গুন্ডা কি হাসপাতালে আছে?'

'দুজনকে ছেড়ে দেওয়ায় আমরা আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে এসেছি। তৃতীয়জনের চিকিৎসা চলছে। রাখছি?'

'ধন্যবাদ।'

সবাই সংলাপগুলো শুনছিল। রিসিভার রেখে সৌমিত্র মেয়েকে বললেন, 'এখন কয়েকদিন বাড়ির বাইরে পা বাড়াবে না। টেলিফোনও ধরবে না। ওই সব গুন্ডাদের বড় দল থাকে।'

সৌগত চুপচাপ শুনছিল। এবার বাড়ির বাইরে পা বাড়াল। সে দেখল মক্কেলরা যেখানে বসেন সেখানে এখনও দুই প্রৌঢ় বসে আছেন। গোপাল তাঁদের কিছু বোঝাচ্ছে।

রাস্তায় নেমে কয়েক পা হাঁটতেই ডাক শুনতে পেল সে, 'এই যে সৌগত।'

সৌগত মুখ ফিরিয়ে দেখল স্থানীয় কাউন্সিলার নৃপেন চ্যাটার্জি ব্র্যাকেটে ন্যাপা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ন্যাপাদা বলল, 'তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম

ভাই। ওঃ, কী কাণ্ডই না ঘটাল তোমার ভাইঝি।'

'আপনার কি মনে হয় করাটা ঠিক হয়েছে?'

'ঠিক হয়েছে মানে? না ঠিক হলে সি এম ওকে অভিনন্দন জানাতেন? সি এম-এর অভিনন্দন পাওয়া খুব সহজ নয় হে। উনি আমাকে পছন্দ করেন বলেই লাস্ট ইলেকশনে-এ পাড়ায় মিটিং করে গেছেন। অন্য ওয়ার্ডে যাননি। যাক গে, নীপা বাড়িতে আছে তো?' ন্যাপাদা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আছে।'

'তোমাদের বাড়ি তো এখন বিখ্যাত হয়ে গেল হে। ভাবছি নীপাকে আমার তরফ থেকে একটা সম্বর্ধনা দেব। পাড়ার রত্ন ও।'

'ন্যাপাদা! একটু তাড়াতাড়ি আছে আমার—।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলে আসি।'

ন্যাপাদাকে ছেড়ে দশ মিনিটের পথ পার হতে সৌগতর আধঘণ্টা লেগে গেল। অল্প চেনা লোকও এমনভাবে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল যেন মনে হচ্ছিল সে-ই গুন্ডা পিটিয়েছে। প্রত্যেককেই হেসে হেসে জবাব দিতে হচ্ছিল। একজন একটু নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর শরীরে, মানে, কোনো আঘাত লাগেনি তো? মেয়েরা ওসব ব্যাপারে মুখ খোলে না।'

'জানেন যখন তখন জিজ্ঞাসা করলেন কেন?' সৌগত হঠাৎ উত্তেজিত হল। লোকটি চলে যেতেই বিড়বিড় করল, 'হাড়ে হারামজাদা।'

যে বাড়ির গেটা খুলে সৌগত ঢুকল সেটি বেশ বনেদি বাড়ি। তিনতলা। দরোয়ান হেসে বলল, "আপনি আজ লেট!'

'ওরা এসে গেছে?'

'কখন!'

চাকর দরজা খুলে দিল। দোতলা ফাঁকা। আলো জ্বলছে। তিনতলায় উঠতেই গলা কানে এল। সৌগত বুঝল ওরা নীপাকে নিয়ে আলোচনা করছে। সে দরজায় দাঁড়াতেই কমলদা বললেন, 'এসো। আমি ভেবেছিলাম আজ তুমি আসতে পারবে না।'

'সেরকম অবস্থা হয়েছিল।' সৌগত একমাত্র খালি চেয়ারে বসল।

কমলিকা বললেন, 'যাই বলুন, অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছে আপনার ভাইঝি। আমরা সবাই ওর জন্যে গর্বিত। বলে দেবেন।'

সুদৃশ্য গ্লাসে হুইস্কি আর বরফ ঢেলে এগিয়ে দিলেন মহিলা।

বাঁ পাশে বসা রূপক জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কখন জানলি?'

'টিভির খবরে।' গ্লাস তুলে সৌগত বলল, 'উল্লাস।'।

কমলদা গলা মেলালেন। 'উল্লাস।'

ঘরে এখন পাঁচজন লোক। রূপক ছাড়া আছে সৌমেন। এককালে বেঙ্গল

ক্রিকেটে খেলেছে। রনজিতে পাঁচটা সেঞ্চুরি করেছিল। এখন অবশ্য ওকে দেখে বোঝা যাবে না। কমলদা বললেন, 'হ্যাঁরে। সৌগত এল অথচ সামনে কিশমিশের প্লেট নেই কেন? ও বেচারা তো কিশমিশ ছাড়া খায় না।'

'শেষ হয়ে গিয়েছিল, আনাতে ভুলে গিয়েছি। আজ সৌগত সবকিছুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, তাই না?' কমলিকা হাসলেন।

'না থাকলে আর কি করা যাবে।' সৌগত বলল।

কমলদা বললেন, 'কাজ শুরু করো।'

সৌমেন ঘড়ি দেখল, 'কমলদা, এখন শুরু করবেন? প্রায় দশটা বাজে!'

'দু রাউন্ড খেল।'

রূপক তাস বের করল ড্রয়ার থেকে। কয়েকবার শাফল করে তাস দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'সৌগত, আজ দুপুরে মনীষাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?' সৌগত আড়চোখে দেখল, 'হ্যাঁ, হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'কেন আবার? কোনো কারণ নেই। শিবানী মনীষাকে ফোন করেছিল। ও বলল, খুব ব্যস্ত আছে, পরে কথা বলবে। মনীষা একা থাকে অথচ বলল ব্যস্ত, তার মানে কোনো গেস্ট আছে। তোকে তো প্রায়ই ডেকে পাঠায়। তাই ভাবলাম তুই-ই গিয়েছিস।' তাস দেওয়া শেষ করল রূপক।

'একটা দরকারি ব্যাপারে আলোচনা করতে ডেকেছিল।'

সৌমেন হাসল, 'কই। আমাদের সঙ্গেও আলাপ আছে, আমাকে তো ডেকে পাঠায় না মনীষা।'

নিজের তাস দেখতে দেখতে কমলিকা শব্দ করে হাসলেন, 'আচ্ছা সৌমেন, প্রশ্নটা কি করে করলেন? আপনি বিবাহিত, দুটি সন্তানের বাবা, দুপুর বেলায় খালি বাড়িতে যে আপনাকে ডাকবে তার কোনো যোগ্যতা কি আপনার আছে?'

কমলদা ধমকালেন, 'এই, এবার চুপ করো। তাস দ্যাখো।'

কমলিকা সুর করে বললেন, 'ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা।'

সৌগত হাসল। সে বিয়ে করেনি। কোনো পিছুটান নেই, মা ছাড়া। তাই বন্ধুদের স্ত্রীরা বা বউদিরা তাকে পছন্দ করে। নিজের সমস্যার কথা বলে খুশি হয়। এটা বিবাহিতদের একদম পছন্দ নয়। তাকে যে কোনো কোনো বন্ধু দুপুর-ঠাকুরপো বলে ডাকে সেকথাও কানে এসেছে। মুশকিল হল কমলিকাকে নিয়ে। আজকাল উনি সুযোগ পেলেই তাকে চিমটি-কাটা কথা বলেন। কমলদার চেয়ে অন্তত বারো বছরের ছোট কমলিকা। দু-দুবার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছর পরে পছন্দ করে দ্বিতীয়বার বিয়ে। সে-বিয়েও টেকেনি। কোনো সন্তানও হয়নি। এতদিন বোম্বেতে ছিলেন। মাস পাঁচেক হল দাদার কাছে এসেছেন। কমলিকা এখনও সুন্দরী যদিও পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স।

কমলদা ইতালিতে ছিলেন তিরিশ বছর। বউদি কলকাতার বাঙালি। একটি মেয়েও

আছে। ওরা কেউ দেশে ফিরতে চায় না। পঞ্চাশ পা দিয়ে কমলদা সিদ্ধান্ত নিলেন বাকি জীবনটা কলকাতায় কাটাবেন। বছর আটেক আগে বউদিকে নিয়ে এসে উঠলেন এ বাড়িতে। এ পাড়াতেই ছেলেবেলা কেটেছে। প্রায়ই যাওয়া-আসা ছিল। সৌগতরা দাদা বলে ডাকত। দিন পনেরো থেকে বউদি ফিরে যাওয়ার সময় বলে গেল, 'তোমাদের কাছে ওঁকে রেখে গেলাম ভাই। জেদ ধরেছেন কলকাতায় থাকবেন, থাকুন। আমার পক্ষে কাজকর্ম ফেলে এখানে পড়ে থাকা সম্ভব নয়।' কমলদা তারপর থেকে এ বাড়িতে একাই ছিলেন। ওরা আসে দুপুর এবং রাত্রে । বাকি সময়ে বই পড়ে কাটান। মাস পাঁচেক হল বোম্বের পাট চুকিয়ে বোন কমলিকা ওঁর কাছে চলে আসায় সুবিধে হয়েছে। বোনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে অবসর উপভোগ করছেন কমলদা।

'এই যে মশাই, এবার ধ্যানভঙ্গ করুন।' কমলিকার গলা কানে আসতেই তাসে চোখ রাখল সৌগত। দ্রুত তাস সাজিয়ে নিয়ে দেখল সে মেড হাত পেয়েছে। কিন্তু রূপক ডিলার। ও না টানা পর্যন্ত সে তাস নামাতে পারে না। অতএব তাস তুলতে হল। বাবাঃ মনে মনে খুশি হল সৌগত। ক্যাশকার্ড উঠেছে। জোকারের নীচের তাস ক্যাশকার্ড, এটাকে জোকার হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সে তাসটা সবাইকে দেখিয়ে ফেলে দিতেই রূপক তাস টানল। অর্থাৎ সৌগত বাকি চারজনের কাছ থেকেই পেমেন্ট পাবে। রামিতে তার এত ভালো লাক কখনই হয় না। নিশ্চয়ই দুজন ফুল হ্যান্ড গুনবে। কমলিকার পালা এলে সে তাস না টেনে টেবিলে নিজের তাস সাজিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সৌগতর আগেই উনি মেড করে দেওয়ায় বাকিদের কাছ থেকে পেমেন্ট পাবেন।

কমলদা, রূপক, সৌমেন তাদের তাসের পয়েন্ট গুনছিল। কমলিকা সৌগতর দিকে তাকালেন, 'আপনার নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে। কত পয়েন্ট?'

সৌগত তাস নামাল।

সেদিকে তাকিয়ে কমলদা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি! তোমারও তো মেড হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ। দেখাবার সুযোগ পেলাম না।' আপসোসের গলায় বলল সৌগত।

কমলিকা বললেন, 'একেই বলে ফোটোফিনিশে হেরে যাওয়া। কখনো রেসকোর্সে গিয়েছেন আপনি?'

মাথা নেড়ে না বলল সৌগত।

'বোম্বেতে থাকার সময় মহালক্ষ্মী রেসকোর্স গিয়েছি কয়েকবার। দুটো ঘোড়া একসঙ্গে রেস শেষ করল। কে জিতেছে সাদা চোখে বলা যাচ্ছে না। ফোটো দেখে রায় দেওয়া হল।' কমলিকা হাসলেন, 'আপনাকে তেমনি আমি ফোটোয় হারালাম।'

দু-রাউন্ড শেষ হতে এগারোটা বেজে গেল। পেমেন্ট ডেট রবিবার। কে কত হেরেছে বা জিতেছে জানার রূপক আর সৌমেন বাড়ি ছুটল। সৌগতর চতুর্থ গ্লাস

তখনও অর্ধেক খালি হয়নি। কমলদা বললেন, 'তোমার তো আমার মতো অবস্থা, বাড়ি ফিরলে বকার কেউ নেই, ধীরে সুস্থে ওটা শেষ করো।'

সৌগত মাথা নাড়ল, 'ঠিক হল না দাদা, বউদি ইতালিতে আছেন।'

'ওই হল। তুমি বিয়ে না করে একা, আমি ইচ্ছে করে একা।'

কমলিকা খেতে পারেন। খেলে তাঁর গলায় স্বর জড়ায় না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, এই মনীষা কেসটা কি?'

কমলদা বিরক্ত হলেন, 'কেস আবার কি! মনীষা সৌগতদের বন্ধু অর্জুনের স্ত্রী। বনাবনি হয়নি বলে আলাদা থাকে। অর্জুনকে তুই দেখেছিস।'

'ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'না। ওরা ডিভোর্সের কথা ভাবেনি। অর্জুন আর মনীষা যে যার বাপের বাড়িতে থাকে। মনীষার মা ছাড়া কেউ নেই। একটা মর্নিং স্কুলে পড়ায়। কয়েকবার দেখেছি ওকে, শি ইজ এ নাইস লেডি!' কমলদা বললেন।

'এই মনীষা তাহলে আপনার বান্ধবী?'

কমলিকার কথায় হাত নাড়ল সৌগত, মুখে কিছু বলল না। কমলদাই উত্তরটা দিলেন, 'ওয়েল, বন্ধু অর্থে বান্ধবী বললে বলতে পারিস। অবশ্য লেক গার্ডেন্স থেকে হাজরার মধ্যে অনেক বয়স্কা মহিলাই সৌগতকে বন্ধু বলে মনে করেন।'

গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল সৌগত, 'চলি কমলদা।'

'একি! শুধু দাদাকেই বলে যাবেন, আমাকে কিছু বলবেন না? গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' সৌগত ভারী পায়ে নীচে নামতে লাগল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সৌগত পুলিশের জিপটাকে দেখতে পেল। ঠিক গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। এত রাত্রে পুলিশ কেন বাড়িতে।

সে গেট খুলতে যেতেই দুজন লোক এগিয়ে এল জিপের আড়াল থেকে, 'কে আপনি? দাঁড়ান।'

সৌগত অবাক হল। সে পালটা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা?'

'আমরা পুলিশ। আপনি কোত্থেকে আসছেন?' একজন জিজ্ঞাসা করতেই অন্যজন নাক টানল, 'মাল টেনেছে জব্বর।'

রাগ হয়ে গেল সৌগতর।' 'এই, ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

'আরে! আপনি মাল খেয়ে লটকাচ্ছেন আর আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছেন?'

'লটকাচ্ছি? তার মানে?

প্রথমজন বলল, 'আপনার কথা জড়িয়ে গেছে।'

'যেতেই পারে। আমি হুইস্কি খেয়েছি। হুইস্কি খাওয়া কি অপরাধ? তাহলে সরকার পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছে কেন? বলুন!' বেশ জোরে প্রশ্নটা করল সৌগত।

প্রথমজন বলল, 'ঠিক আছে। আপনার পরিচয় কি?'

'আমি সৌগত সোম, এই বাড়িতে থাকি।'

'আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে পারবেন?'

'দুর মশাই! নিজের বাড়িতে ঢোকার জন্যে আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হবে?' সৌগত খেপে গেল, 'এসব চাওয়ার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের?'

'থানা থেকে পাঠিয়েছে আমাদের। এই বাড়িতে উলটোপালটা লোক যাতে না ঢুকতে পারে সেটা আমাদের দেখতে বলা হয়েছে। আপনি কি করেন?'

'কিস্যু না। নাথিং।'

এইসময় দুটো ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঝামেলা হচ্ছে দেখে এগিয়ে এসে ওরা সৌগতকে চিনতে পারল, 'সৌগতদা, এনি প্রবলেম?'

ওদের দিকে প্রায় না তাকিয়েই সৌগত বলল, 'আরে ভাই, নিজের বাড়িতে ঢুকব আর এই লোক দুটো আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইছে। আবার ড্রিংক করেছি বলে বিদ্রূপ করছে। এই যে মশাই, ভালো করে শুনুন, এটা অভিজাত পাড়া। এখানকার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বাড়িতে ভদ্রভাবে ড্রিংক করা হয়।'

প্রথম লোকটি গেট খুলে সৌগতকে বলল, 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকে বারান্দায় উঠে দরজার পাশের বেলের বোতাম টিপল লোকটা। দ্বিতীয়বার টেপার পর সৌগত চাপা গলায় ডাকল, 'মদন, দরজা খোল।'

এবার দরজা খুলল কিন্তু ইঞ্চিখানেক চেনে আটকে গেল। একটি মেয়ে ভীরু গলায় বলল, 'মদনদা দেশে চলে গেছে।'

'তুমি কে?'

'আমার বউদি এখানে বাসন মাজে। আমি বদলি।'

'ওঃ। আমি মেজদা, দরজা খোলো।'

এবার দরজা খুলল। সৌগত ঘুরে দাঁড়াল, 'এবার আপনি কি বাড়ির ভেতর ঢুকে সবার কাছে জানতে চাইবেন?'

'ঠিক আছে স্যার। আমরা ডিউটি করি। মেয়েটার কিছু হলে তো আমরাই বিপদে পড়ব। নমস্কার।' লোকটি চলে গেলে দরজা বন্ধ করল সৌগত। তারপর দ্রুত ওপরে উঠে এল। ছোট ভাই-এর ঘরে টিভি চলছে। ইচ্ছে হল, গিয়ে খুব ধমকাতে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকল সে। টেবিলের ওপর হটবক্স, জলের বোতল, গ্লাস। এ বাড়ি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। নীপার জন্যে আজ—। না, মাথা নাড়ল সে। শুধু হেনস্তা বলা ঠিক হবে না, অনেকে তো অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু নীপা কাজটা ঠিক না বেঠিক করেছে বুঝতে পারছে না সে। পুলিশ পাহারায় এসেছে মানে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে। কাল সকালে এ নিয়ে ভাবা যাবে।

হাতমুখ ধুয়ে হটবক্স খুলতে গিয়ে রূপকের কথা মনে এল। রূপক আজকাল প্রায়ই তার পেছনে লাগছে। কোনো দরকার ছিল না ওই সময় মনীষার কথা বলার।

ইচ্ছে করে কমলদাদের কানে কথাটা তুলে দিল। ব্যাপারটা মনীষাকে জানানো দরকার। হটবক্স ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আধা অন্ধকারেই মনীষার বাড়ির নাম্বার ডায়াল করল সৌগত। রিং হচ্ছে। বারবার রিং হওয়ার পর অ্যানসারিং মেশিনে মনীষার গলা ভেসে এল, 'আমি মনীষা বলছি। আজ সন্ধের পরে বাড়িতে থাকব না। আপনার যদি জরুরি কিছু বলার থাকে তাহলে বিপ শব্দের পর বলতে পারেন। আমি পরে যোগাযোগ করব।'

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল সৌগত।

আজ সকালে সৌমিত্র চেম্বারে বসে প্রথম ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা শুরু করা মাত্র ফোনটা এল। ডি আই জি সাহেব ভবানী ভবনে সকাল এগারোটায় নীপার সঙ্গে কথা বলতে চান। সকাল সাড়ে দশটায় গাড়ি আসবে নিয়ে যেতে।

ফোন রেখে সৌমিত্র গোপালকে ডাকলেন, 'আজ প্রথম কেসটা কখন ওঠার কথা?'

'আজ্ঞে এগারোটায়।'

'ওটা তো—।' বলে চুপ করে গেলেন সৌমিত্র।

'আজকেই বোধহয় শেষ হিয়ারিং।'

'হুম। ঠিক আছে।'

প্রথম ক্লায়েন্টের কাজ শেষ করে দ্বিতীয়জনকে পাঁচমিনিট অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে এলেন সৌমিত্র। গৌরী আর নীপা একগাদা কাগজ নিয়ে বসেছে। প্রত্যেকটার প্রথম পাতায় নীপার ছবি। এক একটা কাগজ এক একরকম লিখেছে। বাবাকে দেখে নীপা বলল, 'যা হয়নি এই কাগজটা তাই লিখেছে।'

নীপার কথায় কান না দিয়ে সৌমিত্র গৌরীকে বললেন, 'খুব সমস্যায় পড়েছি। আজ খুব ইমপর্ট্যান্ট কেসের হিয়ারিং আছে কোর্টে, ঠিক এগারোটায়। এদিকে ভবানী ভবন থেকে নীপাকে ডেকে পাঠিয়েছে ওই সময়। আমি যাই কি করে?'

'ডি আই জি কথা বলবেন।'

'অনেক কথা হয়ে গেছে। বলে দাও, আমরা আর ইন্টারেস্টেড নই।' গৌরী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ডাকলেই যেতে হবে? সুবিধে-অসুবিধে নেই?'

'পুলিশকে চটিয়ে কোনো লাভ আছে! গুন্ডাগুলোর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হবে। তখন নীপাকে তো কোর্টে দরকার হবেই।' সৌমিত্র বললেন।

'তার মানে? নীপাকে রোজ কোর্টে যেতে হবে?'

'রোজ অবশ্যই নয়। তবে যেতে হবে। আচ্ছা, আমি দেখছি যাতে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা সকাল এগারোটার বদলে লাঞ্চের পরে করা যায়!' সৌমিত্র আবার ফিরে যাচ্ছিলেন। নীপা বলল, 'বাবা, আমি বড়কাকে বলব সঙ্গে যেতে?'

'তার তো এগারোটায় আগে ঘুম ভাঙে না। দ্যাখো—!' সৌমিত্র চলে গেলেন।

গৌরী সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুধু তোকেই ডেকেছে না টোটা-ফুলদেবও, তা বলে গেল না তোর বাবা!'

'ফোন করে জিজ্ঞাসা করব?' নীপা উৎসাহিত হল।

'লাইনটা ধরে আমাকে দে। আমি কথা বলব।'

ফোনটা ধরল টোটাই। গলা শুনে না কথা বলে পারল না নীপা। 'টোটা, নীপা। মা কথা বলবে। নাও।'

গৌরী রিসিভার কানে চেপে বললেন, 'আমি নীপার মা বলছি।'

'বলুন আন্টি।'

'কাল তোমরা কেন ওই ফাঁকা রাস্তায় গেলে বলো তো?'

'খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল। তখন বুঝতে পারিনি।'

'তোমার বাড়িতে প্রেস-টিভির লোক গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। বাবা আমাকে মিট করতে দেয়নি। ওদের বলে দিয়েছিল আমি অসুস্থ, ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছি। ফুলকে নিয়ে ওর মা আজ ওর মাসির বাড়িতে চলে গিয়েছে। নীপার কাছে অনেকে এসেছিল?' টোটা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তোমাকে কি আজ ভবানী ভবনে ডেকেছে?'

'ডেকেছিল। ফোন এসেছিল। বাবা বলেছে ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। আমার ফোন ধরাও নিষেধ, বাবা আসছে, ফোন রাখছি।'

লাইন কেটে দিল টোটা।

রিসিভার রেখে গৌরী বললেন, 'তোমার বন্ধুরা যে যার গা বাঁচাচ্ছে। একজন মাসির বাড়িতে চলে গেছে, আর একজন অসুস্থ। তোমার বাবাকে বলছি ব্যাঙ্গালোরের প্লেনের টিকিট কেটে দিতে।'

'ব্যাঙ্গালোরে?'

'হ্যাঁ। স্বপ্নার ওখানে। অনেকবার বলেছে যেতে, এবার তুমি ঘুরে এসো।'

'আশ্চর্য! ক'দিন বাদে আমার রেজাল্ট বের হবে, ভুলে গেলে?'

'রেজাল্ট পাঠিয়ে দেব। তুমি পড়াশুনা করার ইচ্ছে হলে ব্যাঙ্গালোরে করতে পারবে। কলকাতায় থাকার দরকার নেই।' গৌরী কথা শেষ হওয়া মাত্র গোপাল এল একটা চিরকুট নিয়ে।

সেটা পড়ে নাক দিয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ বের করে গৌরী চিরকুটটাকে টেবিলে রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। নীপা চিরকুট দেখল। সৌমিত্র লিখেছেন, 'ডি আই জি মিটিং পিছোতে পারবেন না। নীপাকে বলো বড়কার সঙ্গে কথা বলতে।'

নীপা উঠল। ঘড়ি দেখে বুঝল এখন বড়কার মাঝরাত। সে ওপরে উঠে এসে ঠাকুমার ঘরে দরজায় দাঁড়াল।

এর মধ্যে চা খাওয়া, কাকদের বিস্কুট খাওয়ানো হয়ে গেছে। রমা এখন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্বামীর ছবির নীচে। মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে আছেন স্বামীর মুখের দিকে।

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ?'

চমকে তাকালেন রমা। হেসে ফেললেন। 'মানুষটা কোথায় যে চলে গেল।'

'খুব মন কেমন করে তোমার?'

'নাঃ। বেঁচে যখন ছিল তখন তো ভয়ে সিঁটকে থাকতাম। ছয় ছয়টা ছেলেমেয়ের মা হয়েও মুখ খুলতে পারিনি কোনোদিন। আয় বোনো।'

'না। বড়কাকে ঘুম থেকে তুলতে হবে।' নীপা ঘুরে দাঁড়াল।

'এখন ডাকিস না, খুব রেগে যাবে।' আতঙ্কিত হলেন রমা।

'উপায় নেই, ডাকতেই হবে।'

সৌগতর ঘরের দরজা বন্ধ। খুব আস্তে টোকা দিল নীপা। সাড়া নেই। আওয়াজটা আর একটু বাড়াল। দরজা খুলল না। এবার নীপা চেঁচাল, 'বড়কা, ও বড়কা, দরজা খোলো।'

শুধু রমা নন, সুভদ্রও ক্লাচ বগলে নিয়ে তার দরজায় এসে দাঁড়াল একটা রাগারাগির দৃশ্য দেখবে বলে।

শেষ পর্যন্ত সুভদ্র বলল, 'মেজদাকে কেন ডাকছিস?'

'আমাকে নিয়ে ভবানী ভবনে যেতে হবে।'

'ভবানী ভবন? কি আছে ওখানে?'

'কি আছে জানি না। পুলিশের একজন ডি আই জি হুকুম করেছেন যাওয়ার জন্যে। বাবার জরুরি মামলা আছে ওই সময়, তাই—।'

'লিফ্‌ট আছে?'

'কেন?'

'তাহলে আমি না হয় যেতাম।'

'তুমি? পারবে? কষ্ট হবে না?'

'কিসে যাবি? ট্যাক্সিতে?'

'না। ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

এইসময় বাবুরাম বেরিয়ে এল ছোটকার ঘর থেকে, 'আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে বাবু। ডাক্তারবাবু আপনাকে পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।'

এইসময় দরজা খুলল সৌগত। চোখ আধবোজা, প্রচণ্ড বিরক্ত।

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই নীপা চেঁচিয়ে উঠল, 'তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাও। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। গাড়ি আসতে আর বেশি দেরি নেই।'

'গাড়ি?' হকচকিয়ে গেল সৌগত।

'ভবানী ভবন থেকে গাড়ি আসছে। তোমাকে আমাকে নিয়ে সেখানে যেতে হবে। বাবার জরুরি মামলা আছে বলে যেতে পারবে না।' নীপা বলল।

'অসম্ভব! আমার খুব মাথা ধরেছে, আমি কোথাও যেতে পারব না।' আবার দরজা বন্ধ করতে চাইল সৌগত। নীপা বলল, 'দাঁড়াও। আমি কি একা যাব?'

'একা? তোর তো বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ।'

'তাহলে ছোটকা যেতে চাইছে সঙ্গে, ওর সঙ্গেই যাই।'

'কখন গাড়ি আসবে?'

'সাড়ে দশটায়।'

'ওঃ।' মুখ ঘুরিয়ে হলের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িতে সময় দেখল সৌগত, 'ঠিক এক ঘণ্টা বাদে আমাকে ডাকাবি।' সে দরজা বন্ধ করল।

রমা হাসলেন, 'তুই বলেই ও কুরুক্ষেত্র করল না।'

সুভদ্র বলল, 'ওখান থেকে ঘুরে এসে আমার কাছে আসিস। কি বলল তা শুনব বুঝলি নীপা, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, যে যাই বলুক, তুই যা করেছিস সেটাই ঠিক।'

হাসল নীপা, 'মা বলেছে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেবে। স্বপ্না মাসির কাছে। বলেছে যা পড়তে ইচ্ছে করবে তা ওখানে থেকে পড়তে।'

'শুনলে মা! পাঠিয়ে দেবে বললেই হল! তুই ভাবিস না। আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করলে বউদি মেনে নিতে বাধ্য হবে।' সুভদ্র হাসল।

ডি আই জি চশমার কাচ রুমালে পরিষ্কার করলেন। এই মাত্র তাঁর হুকুমে সেদিনের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছে নীপা।

চশমা পরে ভদ্রলোক বললেন, 'ওই তিনজনের একজন খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোকের ছেলে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে তাকে তা করার চেষ্টা হবে। তুমি আমাকে যা বললে তা পরে অস্বীকার করবে না তো?'

'যা সত্যি তাকে অস্বীকার করব কেন?' নীপা পালটা প্রশ্ন করল।

ডি আই জি হাসলেন, 'তোমার সঙ্গে যে দুই বন্ধু ছিল তাদের একজনের এমন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে যে ডাক্তার অ্যাডভাইস করেছেন একমাস বেডরেস্ট নিতে। আমরা যেন ডিস্টার্ব না করি। অন্য মেয়েটি কলকাতার বাইরে চলে গেছে আজ সকালে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওরা কোঅপারেট নাও করতে পারে। এক্ষেত্রে কেস চালাতে গেলে তোমার সহযোগিতার খুব প্রয়োজন।'

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

'দ্যাখো।'

সৌগত চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা যদি সহযোগিতা করতে না চায় তাহলে কেন সেটা চাইছে না?'

'সাধারণ মানুষ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। যখনই দরকার হবে আদালতে যেতে হবে কাজকর্ম ফেলে, এটা অনেকেরই পছন্দ নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, কেউ ওদের শাসিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে, সরে না দাঁড়ালে ক্ষতি করবে। হয়তো সেকারণেও ভয় পেয়েছেন অভিভাবকেরা।' ডি আই জি মাথা নাড়লেন।

'যারা গুন্ডামি করেছে তারা তো এখন আপনাদের হাতে। ভয় দেখাচ্ছে কি করে?'

'বলেছি তো একজনের বাবা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল। তাছাড়া ওদের দলও থাকতে পারে। অবশ্য এসবই আমার অনুমান। গতকাল মার খেয়ে ওরা নিজেদের অন্যায়ের কথা স্বীকার করেছিল। কিন্তু আজ সকালে ওরা উলটো কথা বলছে। ওদের উকিল সেইভাবে একটা ডায়েরি করেছে থানায়।' ডি আই জি একটু চিন্তিত।

'আজ কি বলছে ওরা?' সৌগত জিজ্ঞাসা করল।

'ওরা বিরাটিতে এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছিল রাজারহাট হাইওয়ে দিয়ে। হঠাৎ দেখতে পায় রাস্তার পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোনো লোকজন নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে নীপা চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা, একদম মিথ্যে।'

ডি আই জি বললেন, 'আমরা জানি।'

সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

'কোনো লোক নেই অথচ গাড়িটা পড়ে আছে দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে বাইক থামিয়ে হেঁটে গাড়ির কাছে যায়। গিয়ে দ্যাখে গাড়ির ভেতর দুটো মেয়ে এবং একটা ছেলে অশ্লীল আচরণ করছে। ছেলেটি জামা-প্যান্ট খুলে অন্তর্বাস পরে বসে আছে। ওরা এই দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করে। উলটে মেয়েরা ঝগড়া শুরু করে। এই ছেলেরা তখন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে ওদের গাড়ি থেকে নামায়। সেসময় গাড়ির পেছনে রাখা শক্ত লাঠি বের করে একটি মেয়ে ওদের দুজনের মাথায় এত জোরে মারে যে তারা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তৃতীয় জন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে দুটো মেয়ে একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করে আর ছেলেটা অন্তর্বাস পরা অবস্থায় বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। গতকাল ওরা এই কথাগুলো অনেকবার পুলিশকে বলতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশ শুনতে চায়নি। প্রকাশ্য রাস্তায় অশ্লীল আচরণের প্রতিবাদ করায় তাদের খুন করার চেষ্টা হয়েছিল বলে ওরা ডায়েরি করেছে।'

ডি আই জি কথা শেষ করে নীপার দিকে তাকান। নীপা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'সব মিথ্যে, একদম মিথ্যে। ওরাই এসে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল।'

'ঠিক। কিন্তু যা সত্যি তা তো আদালতে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে।'

'আমরা তিনজনই তো ওদের ভিক্টিম। এর বাইরে কোনো সাক্ষী ছিল না।' নীপা বিড়বিড় করল, 'আমরা কেন মিথ্যে বলতে যাব?'

'গাড়ির ভেতরে বসে তোমরা যা করছিলে বলে ওরা যে অভিযোগ এনেছে, বলতে পারে সেটা আড়াল করার জন্যে মিথ্যে বলবে।'

'সেক্ষেত্রে তো ওদেরও প্রমাণ দিতে হবে।' সৌগত বলল।

'প্রমাণ মানে আরও সাক্ষী। এই হাইওয়ে দিয়ে গাড়িতে ছুটে যাওয়া দু-তিনজনকে ওরা সাক্ষী বানিয়ে হাজির করতে পারে।'

'সর্বনাশ!' সৌগতর মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল।

ডি আই জি বললেন, 'আমি আপনাদের ভয় দেখানোর জন্যে বলছি না। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে অপরাধীরা কি গল্প বানাতে পারে সেই অভিজ্ঞতা তো গোটা চাকরিজীবন ধরেই হচ্ছে। ওর বাবা আইনজীবী। তিনি এলে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারতেন। ওঁকে সব খুলে বলবেন। প্রয়োজন বুঝলে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর হ্যাঁ, নীপা, এই সময় তোমাদের উচিত একসঙ্গে মুভ করা। তোমার বন্ধুরা যদি নির্লিপ্ত হয় তাহলে ওরা আদালতে সহজেই প্রমাণ করতে পারবে অন্যায় করেছিল বলে ভয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। বিচারক সেকথা বিশ্বাস করলেই হয়ে গেল। তখন কিন্তু ওরাও শাস্তি এড়াতে পারবে না।'

'ওদের মিথ্যে অভিযোগ যদি আদালত মেনে নেয় তাহলে এদের শাস্তি হবে? সৌগত জিজ্ঞাসা করল।

'অবশ্যই। তাছাড়া মিডিয়া আজই ওদের অভিযোগের কথা জেনে যাবে। আজকের কাগজে যা ছাপা হয়েছে, কালকের কাগজে তার উলটো ছাপা হবে। আর খবরটা যেহেতু মুখরোচক তাই সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইবে। আবার বলছি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই যদি তোমরা ইউনাইটেড থাকো।' ডি আই জি কথা শেষ করলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে নীপা বিড়বিড় করল, 'এখন কি করি!'

সৌগত বলল, 'প্রথমে বাড়ি যাব। খুব খিদে পেয়েছে।'

'অমনি তোমার খিদে পেয়ে গেল! দশচক্রে তো ভগবানও ভূত হয়ে যায়। ছাগল কিনে লোকটা বাড়ি ফিরছিল, দুষ্ট লোকেরা বারংবার ছাগলটা কুকুর বলায় শঙ্কায় লোকটারও মনে হয়েছিল ওটা কুকুর!'

'বুঝলাম না।' সৌগত বলল।

'আঃ। ওরা যদি গায়ের জোরে প্রমাণ করে তাহলে আমাকে জেলে যেতে হবে না?' নীপা প্রায় কেঁদে ফেলল।

'তুই একা যাবি না, তোর বন্ধুদেরও জেলে যেতে হবে।' সৌগত বলল, 'তোর এই বন্ধু দুটোর বাড়ি চিনিস?'

ওরা কথা বলছিল বলে লক্ষ করেনি পেছনে ভিড় হয়েছে। সকালে কাগজে যাকে দেখেছে সে এখন সামনে। একজন বয়স্কা কর্মী এগিয়ে এলেন, 'তুমি?'

নীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

হাত বাড়ালেন মহিলা। 'আমাদের অভিনন্দন নাও। খুব ভালো কাজ করেছ।'

'থ্যাংকস।'

সৌগত বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমাদের একটা জায়গায় যেতে হবে—।'

ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই সে ভাইঝির হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল। যে গাড়ি ওদের বাড়ি থেকে এনেছিল তার ড্রাইভারকে নীচে নেমে খুঁজে পেল না

ওরা। একটু ইতস্তত করে গেটের বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল সৌগত।

'তোর বন্ধুদের বাড়িতে চল।' সে বলল।

'এখন? এই দুপুরে?' নীপা বলল, 'তোমার তো খিদে পেয়েছে বললে।'

'ভাবছি তোকে নিয়ে যখন বেরিয়েছি তখন কাজটা সেরে গেলেই হত।'

'কি কাজ?'

'তোর বন্ধুদের কনভিনস করতে হবে যাতে তিনজনে একসঙ্গে লড়তে পারিস।'

'যদি দেখা না করতে দেয় টোটার সঙ্গে? নার্ভাস ব্রেকডাউন না কি বলল! কিন্তু জানো ওর সঙ্গে আজ সকালে কথা হয়েছিল, তখন একবারও তা মনে হয়নি। আর ফুলকে তো বাড়িতে পাওয়া যাবে না।'

'ও।' মাথা নাড়ল সৌগত। তারপর বাইরের দিকে তাকাল। একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'শোন, তুই রাস্তার দিকে তাকাস না। বরং একটু নেমে বস। ট্যাক্সিতে তোকে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি।'

বাড়িতে ঢুকতেই গৌরী এগিয়ে এলেন, 'কি হল?'

'আগে কিছু খেতে দাও।'

নতুন কাজের মেয়েকে হুকুম দিয়ে গৌরী ওদের নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসলেন, 'তুই একেবারে স্নান করে খেয়ে নে। দেড়টা বাজে। তোর কুকুর তো দেরিতে খাওয়ার অভ্যেস। তুই যা।'

নীপা চলে গেলে সৌগত ডি আই জি-র কথা বলতে আরম্ভ করলে খাবার এল। খেতে খেতে সে কথা বলছিল, গৌরী গালে হাত দিয়ে শুনছিলেন। সৌগত থামলে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ!'

'চিন্তা কোরো না। দাদা ঠিক রাস্তা বের করতে পারবে।' সৌগত উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল। পৌনে দুটো। হঠাৎ মনে পড়ল গৌরীর, 'ও হ্যাঁ, তোমার। ফোন এসেছিল। মনীষা।'

'কিছু বলল?'

'না। খোঁজ করল তোমার' ব্যস।' গৌরী উঠে গেলেন।

একটু ভাবল সৌগত। তারপর উঠে গিয়ে মনীষার নাম্বার ডায়াল করল। চারবার রিং হওয়ার আগেই মনীষার গলা শোনা গেল, 'হ্যালো।'

'ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ। মাঝরাতে ফোন করেছিলে তুমি, কি হয়েছিল?'

'মাঝরাতে?'

'খুব খেয়েছিলে, মনে পড়ছে না?' মনীষা হাসল।

'ও হ্যাঁ।' মনীষার যে সি এল আই আছে কাল রাত্রে সেটা খেয়াল ছিল না। সে বলল, 'অত রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলে?'

'না। এগারোটার মধ্যে ফিরেছি। কিন্তু অ্যানসারিং মেশিন অফ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। অর্জুন আবার প্রবলেম তৈরি করেছিল। ও হ্যাঁ, তোমার ভাইঝির ছবি কাগজে দেখলাম। খুব সাহসী মেয়ে তো!'

'হ্যাঁ। সাহস দেখিয়ে এখন বিপদে পড়েছে।' সৌগত বলল।

'কি রকম?' মনীষার গলার স্বর পালটাল।

'অনেক কথা। টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'কাল রাতের ফোনের কারণটাও না?'

'আর বোলো না। রূপক আবিষ্কার করেছে কাল দুপুরে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আর সেটা পাঁচজনের সামনে বলে মজা পাচ্ছিল।'

'ও জানল কি করে?'

'ওর বউ শিবানী তোমাকে ফোন করেছিল। তুমি বলেছিলে ব্যস্ত আছ, সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিল তুমি আমার সঙ্গেই ব্যস্ত।'

'আশ্চর্য! ওকে বলতে হবে আমি অনেকের সঙ্গেই ব্যস্ত থাকি। এরকম একজোড়া গল্প আমি কখনও দেখিনি। রাখছি।' আচমকা ফোন রেখে দিল মনীষা। ওর মেজাজ বেশ গরম হয়ে গেছে, এই সময় রেহাই পেয়ে ভালোই লাগল সৌগতর।

আজ সকালে খুব ভালো কাজ হয়েছে কোর্টে। বিচারকের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি সৌমিত্রর বক্তব্যের সঙ্গে একমত। তবে নীপার ব্যাপারে এত লোক আগ বাড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে যে সৌমিত্র খুবই অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। দুপুরে নিজের চেম্বারে দরজা বন্ধ করে লাঞ্চ সারছিলেন তিনি। লাঞ্চের পরে যে দুটো মামলা আছে সেগুলো আজ হবে না বলে ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন। প্রতিপক্ষরা তারিখ নেবেন। তিনি প্রতিবাদ না করলে বিচারক তারিখ দিতে দেরি করবেন না।

খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন সৌমিত্র। সকাল থেকে মেয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় পাননি তিনি। পুলিশ তাদের কাজ করুক, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর হয়ে কথা বলার জন্যে একজন ভালো উকিলকে দায়িত্ব দিতে হবে। তাঁর পক্ষে লোয়ার কোর্টে গিয়ে সওয়াল করা বেশ দৃষ্টিকটু ব্যাপার হবে। এই সময় গোপাল ঘরে ঢুকে বলল, 'দুজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন দেখা করবেন বলে। একজন উকিল।'

'কি ব্যাপার বলেছেন?'

'বললেন খুব জরুরি।'

'নিয়ে এসো।'

টেবিল পরিষ্কার করে দিল পিওন। সিগারেট নেভাতেই একটি অল্প পরিচিত মুখের সঙ্গে অচেনা একজনকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন।

'আসুন।'

'নমস্কার। আমি এস কে সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয় কোর্টে।' পকেট থেকে কার্ড বের করে সামনে রাখলেন ভদ্রলোক। সেটা তুলে নিয়ে মাথা নাড়লেন সৌমিত্র, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। বলুন।'

'ইনি আমার ক্লায়েন্ট বিল্টু দত্ত। বিরাট ব্যবসায়ী। সক্রিয় রাজনীতি করেন না কিন্তু যাঁরা। ক্ষমতায় আছেন তাঁদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন।' সেনগুপ্ত বললেন।

'কিছু পেতে গেলে তো কিছু দিতেই হয় সেনগুপ্ত সাহেব। আমার এলাকার এম এল এর ইলেকশনের খরচ আমাকেই দেখতে হয়। কিন্তু তাতেও শেষ নেই। অন্য এলাকার নেতারা যখন ফোন তুলে কিছু বলেন তখন না বলতে পারি না।' বিল্টু দত্তের বাচনভঙ্গিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার টান স্পষ্ট।

'বলুন, কি করতে পারি?' প্রশ্ন করেই মনে পড়ল সৌমিত্রের, নীপারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছে। ডি আই জি-র সঙ্গে কি কথা হল তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এঁরা চলে গেলেই বাড়িতে ফোন করবেন।

বিল্টু দত্ত হাতজোড় করলেন, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'সেকি! কেন?' অবাক হলেন সৌমিত্র।

'খুব অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় করেছে ওরা। আমি ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে ও কার সঙ্গে মিশছে তার খবর রাখিনি। তার ওপর আছে ওর মা, ছেলের ব্যাপারে একদম অন্ধ। আমি কাল রাত্রেই ঠিক করে ফেলেছি ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব যদি আপনার অনুমতি পাই।' বিল্টু দত্ত খুব আবেগ দিয়ে কথা বললেন।

'আমার অনুমতির কি দরকার?'

'বাঃ, যতক্ষণ কেস থাকবে ততক্ষণ তো ও বিদেশে যেতে পারবে না।'

ব্যাপারটা ঝাপসা ছিল, পরিষ্কার হল। সৌমিত্র শান্ত গলায় বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই মিস্টার দত্ত।'

'প্রথমে সেটাই মনে হবে। আপনার জায়গায় আমি থাকলে একই কথা বলতাম।' বিল্টু দত্ত মাথা নাড়লেন। মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন, 'একটু ভেবে দেখুন। আপনি সিনিয়র মানুষ। এই ধরনের মামলা একবার আদালতে উঠলে ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়তে বাধ্য।'

সৌমিত্র তাকালেন, 'আপনারা ঠিক কি চাইছেন বলুন তো?'

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন, 'আজকের কাগজগুলোতে, টিভিতে যেভাবে ঘটনাটা প্রচারিত হয়েছে তাতে আপনার মেয়েকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। সে যা করেছে তা প্রাপ্য সম্মানই সে পেয়েছে। কিন্তু কেস যখন আদালতে উঠবে তখন তো অভিযুক্তরা যাতে শাস্তি না পায় সেই চেষ্টাই উকিলরা করবেন। সেটা করতে গিয়ে নানা গালগল্প, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলবে। আমরা চাইছি সেটা হতে না দিতে!'

'তার মানে অপরাধীরা শাস্তি পাক তা আপনারা চাইছেন না?'

বিল্টু দত্ত কিছু বলতে চাইছিলেন, মিস্টার সেনগুপ্ত তাঁকে থামালেন, 'আপনি বলুন, এত বছরের প্র্যাকটিসে কখনো কোনো অপরাধীর পক্ষে দাঁড়াননি? যার শাস্তি অবধারিত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে সফল হয়ে খুশি হননি? আমরা সবাই যদি ন্যায়, সৎ-এর পক্ষ নিতাম তাহলে কোনো মামলায় কনটেস্ট হত না। তাই না?'

'আপনারা চাইছেন নীপা সরে দাঁড়াক, তাই তো।'

'হ্যাঁ।' মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন।

'যদি সেটা না করে তাহলে নোংরা ছিটোবেন?'

'বাধ্য। মক্কেলকে বাঁচাতে সেটা করতে বাধ্য আমি।'

'তাতেও কি বাঁচাতে পারবেন?'

'জানি না। তবে যে লড়াই হবে সেটা কাম্য হবে না।'

'মানে বুঝলাম না।' সৌমিত্র মাথা নাড়লেন।

বিল্টু দত্ত বললেন, 'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছি বললে শাস্তি কমে যায়, যায় তো? আমার ছেলে অন্যায় করেছে। কিন্তু সে যদি নিজেকে বাঁচাতে বলে ওই রাস্তায় ওরা যখন বাইকে চেপে যাচ্ছিল তখন রাস্তার ধারে দাঁড় করানো একটি গাড়ির ভেতর দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে অশ্লীল কাজ করছিল দেখে প্রতিবাদ করে। তার ফলে মেয়ে দুটো পড়ে থাকা বাঁশ তুলে ওদের মারে। মেয়ে বলে ওরা আঘাত করতে চায়নি। পরে পুলিশের কাছে মিথ্যে বিবৃতি দিয়ে মামলা সাজানো হয়েছে।' বিল্টু দত্ত হাসলেন, 'এই কেস নিয়ে আমরা তো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারি।'

কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে সৌমিত্র বললেন, 'ওদের এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষীকে হাজির করতে তো পারবেন না।'

'কি যে বলেন! অন্তত দশজন লোক সাক্ষী দেবে যারা ওই রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে গেছে। মারপিট হচ্ছে কেউ গাড়ি থেকে নামেনি। কেউ অর্ধনগ্ন মেয়েদের গাড়িতে দেখে ভদ্রতায় সরে গেছে।' বিল্টু দত্ত বললেন।

মিস্টার সেনগুপ্ত ঝুঁকে বসলেন, 'আজকে আমরা বেল চেয়েছিলাম। পুলিশের আপত্তিতে ওটা পাওয়া যায়নি। সামনের সোমবার আবার তারিখ পড়েছে। সেদিন আপনারা আপত্তি না জানালে বেল পেয়ে যাবে ওরা। তারপর চুপচাপ থাকুন, থিতিয়ে যাক জল। সবাই ভুলে যাবে।'

'কি বলছেন? কেস উঠবে না?'

'পুলিশ যদি চার্জশিট না দেয় তাহলে কি করে উঠবে!' মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন। 'ব্যাপারটা ভাবুন। আপনার মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। একটা স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক হবে।'

বিল্টু দত্ত উঠে দাঁড়ালেন, 'একটা অনুরোধ করব?'

সৌমিত্র তাকালেন।

'আপনারা ব্যাংকক কুয়ালালামপুর দিন চারেকের জন্যে ঘুরে আসুন। মন হালকা হয়ে যাবে। আমি আপনাদের এয়ার টিকিট, হোটেলের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আচ্ছা নমস্কার।' বিল্টু দত্ত মিস্টার সেনগুপ্তকে ইশারা কবে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার সেনগুপ্ত কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে মক্কেলকে অনুসরণ করলেন।

মিনিট চারেক চুপচাপ বসে থাকলেন সৌমিত্র। তারপর টেলিফোন টেনে নিয়ে নিরুপমকে ফোন করলেন। ক্লাস ওয়ান থেকে ওঁরা একসঙ্গে পড়েছেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে। গ্রাজুয়েশনের পরে তিনি চলে এলেন আইন পড়তে আর নিরুপম আই পি এস করে পুলিশে জয়েন করল। এসবের পর বহু বছর কেটে গেছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো পার্টিতে দেখা হলে দুজনেই খুশি হয়। আর বিজয়ার পরে একবার ফোনে কথা হয়। কোনোবার সৌমিত্র ফোন করেন, কোনোবার নিরুপম।

নিরুপমের সেক্রেটারি বলল, 'স্যার এখন অফিসে নেই। কিছু বলার থাকলে বলুন, স্যারকে জানিয়ে দেব।'

'বলবেন সৌমিত্র ফোন করেছিল। সৌমিত্র সোম।'

'নিশ্চয়ই। স্যার, আজকের কাগজে আপনার মেয়েকে নিয়ে—।'

'হ্যাঁ। রাখছি।' কথা শেষ করতে দিলেন না সৌমিত্র।

গোপালকে ডেকে বাকি কেস দুটোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলে উঠে পড়লেন সৌমিত্র। মাথার ভেতর একটা অস্বাভাবিক ভার অথচ ঠিক মাথা ধরা বলতে যা বোঝায় তা নয়। ওই লোক দুটোর কথা শোনার পর থেকেই এটা হয়েছে।

ডি আই জি সাহেব নীপা এবং সৌগতকে যা যা বলেছেন তা গৌরীর মুখে শুনলেন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'বাঃ চমৎকার! ডায়েরিটা ওরা তাহলে সকালেই করে ফেলেছে।'

ডায়েরি করেছে এই কথাটা বিল্টু দত্তরা একবারও বলেনি। তবে প্রতিরোধ করতে হলে যেভাবে মামলা সাজাতে পারে তা বলেছে যেটা ওরা পুলিশকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে।

গৌরী বললেন, 'কি হবে বল তো? যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে চূড়ান্ত নোংরামো করবে ওরা।'

'সেটা করা ছাড়া ওদের বাঁচার কোনো পথ নেই।' সৌমিত্র বললেন।

'তাহলে কি টোটা আর ফুল্লরা যা করতে চাইছে তাই করবে নীপা?'

'ওরা কি করেছে?'

'ওরা এড়িয়ে যাচ্ছে। কোর্টে যাবে না।'

'নীপা কি চাইছে?'

'চুপ করে আছে। খুব ঘাবড়ে গিয়েছে মেয়েটা।'

'দ্যাখো, আজকের কাগজে, টিভিতে ওকে যে জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তারপর যদি ও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাহলে লোকে হাসাহাসি করবে। সেটা সহ্য করতে পারলে আমার কিছু বলার নেই।'

'ও ব্যাঙ্গালোরে স্বপ্নার কাছে চলে যাক। ওখানে কেউ জানতে পারবে না।'

'তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'এছাড়া আর কি রাস্তা আছে, বলো?'

কারও ধমক শুনে মুখ বন্ধ করার শিক্ষা কখনও পাননি সৌমিত্র। আবার এ কথাও ঠিক, এতদিন ধরে যাদের হয়ে কেস লড়েছেন তাদের সবাই সততার কারণে বিপদে পড়েছিল তাও তো নয়। অন্যায় করে মামলার মুখোমুখি হওয়া লোক যখন তাঁর ক্লায়েন্ট হতে চেয়েছে তখন কি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন একবারই। দলিল জাল করে নিজের নামে সম্পত্তি ট্রান্সফার করে সেটা ভোগ করছিলেন একজন মানুষ। সেটা ধরা পড়তেই বঞ্চিতরা এক হয়ে মামলা করে। লোকটা তাঁকে অনুরোধ করে মামলা নিতে। যাঁরা মামলা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লোকটার মা বাবা কাকাও ছিলেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনই। স্পষ্ট না বলে দিয়েছিলেন। মামলাটির খবর রেখেছিলেন সৌমিত্র। লোয়ার কোর্টে তো বটেই হাইকোর্টেও হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল লোকটা।

কিন্তু কেস লড়ে অপরাধীকে বাঁচিয়েছেন বা শাস্তি কমিয়েছেন এমন মামলার সংখ্যা তো কম নয়।

টেলিফোন বাজল। গৌরী ফোন ধরলেন, 'ও, আপনি! কেমন আছেন! কেমন আছেন? ও। আমরা? ভালোই ছিলাম। মেয়ে এমন একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল যে এখন দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। হ্যাঁ, বাড়িতেই আছে। ও, তাই নাকি? বাঃ, আসুন।'

রিসিভার রেখে গৌরী বললেন, 'নিরুপমবাবু আসছেন।'

'আসছেন?' সৌমিত্র তাকালেন।

'হ্যাঁ। এ পাড়াতেই কাজেই এসেছিলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করো না। তোমরা তো বহুকালের বন্ধু।' গৌরী বোধহয় নিজেকে ভদ্রস্থ করতেই তাঁর বেডরুমে ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরুপম চলে এলেন। কলকাতা পুলিশের খুব সিনিয়র অফিসার। বর্তমান কমিশনার অবসর নিলে ওঁর সেই পদে প্রমোশন পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বললেন, 'সকালে তোকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। এত বড় একটা নিউজের পরে ফোন বিজি থাকাই স্বাভাবিক। তোর মোবাইলের নাম্বারটা বল। স্টোর করে রেখে দিই।' পকেট থেকে নিজের সেটটা বের করলেন নিরুপম।

'আমি ওটা ব্যবহার করি না।' হাসলেন সৌমিত্র।

'সেকি! আজকের পৃথিবীতে কোনো কাজের লোক এটা ছাড়া থাকতে পারে?'

'আমি তো পারছি।' সৌমিত্র বললেন, দুদুবার হারিয়ে কিছু অর্থদণ্ড দিয়েছি। তারপর ভাবলাম তৃতীয়টা যে হারাব না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া ওই যন্ত্রটি পকেটে থাকলে নিজের মতো থাকতে পারবি না। কেউ না কেউ তোকে সমানে চেজ করে যাবে। আমাকে যার দরকার সে ল্যান্ডলাইনে ফোন করবে। দরকার হলে এসে দেখা করবে। কোর্টে ঢোকার সময় একবার ওটাকে সাইলেন্ট করতে ভুলে গিয়েছিলাম, ইমপর্টান্ট সওয়ালের সময় বেজে উঠল। যিনি ফোন করেছেন তিনি অনেকদিন দেখা হয়নি বলে খোঁজ নিচ্ছেন। জাজ আমার দিকে তাকিয়ে, কি অস্বস্তিকর অবস্থা। যাক গে, হঠাৎ এ পাড়ায়?'

'লোকাল থানাকে ম্যানেজ করে বাড়িওয়ালা ভাড়াটের জলের লাইন কেটে দিয়েছিল। এ সি কিছু করতে সাহস পাচ্ছিল না। বাড়িওয়ালার শালা আবার একজন এস পি-র ভাই। ভাড়াটে একজন সাংবাদিককে ধরে সি এ-র সেক্রেটারির কাছে পৌঁছে গেছে। ফলে আমার কাছে অনুরোধ এল কিছু একটা করার।'

'কি করলি?'

'সাপও মরল না, লাঠিও ভাঙল না।'

'কি রকম?'

হোহো করে হাসলেন নিরুপম, 'ছাড় তো! মেয়ে কোথায়? ডাক ওকে, উঠব।'

গৌরী চা এবং প্যাটিস নিয়ে এলেন।

'আমার খিদে পেয়েছিল, অনেক ধন্যবাদ বউদি।'

'তুমি ওঁকে সব বলেছ?' গৌরী স্বামীর দিকে তাকালেন?

অতএব সৌমিত্র সমস্ত ব্যাপারটা বন্ধুকে জানালেন।

শোনার পর নিরুপম বললেন, 'অফিসে ফিরে যখন শুনলাম তুই ফোন করেছিলি তখনই মনে হয়েছিল মেয়ের ব্যাপারে কোনো সমস্যা হলেও হতে পারে। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, ওরা আজ সকালে একটা গল্প ফেঁদে ডায়েরি করলেও আগামীকাল বিকেলের আগে ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করেছে।'

'সেকি রে। এটা হয় নাকি?'

'যুধিষ্ঠিরও বলেছিল, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে যদি একজন যুধিষ্ঠির হত তাহলে অন্তত একটা করে মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত হত। তা হয়নি যখন তখন একটা ডায়েরিকে ছত্রিশ ঘণ্টা চেপে রাখতে কোনো অসুবিধে নেই। বদলে তো কিছু অনুগ্রহ পাওয়া যেতেই পারে।'

'আজ বাদে কাল তুই চিফ কমিশনার হবি তবু কথাগুলো বলছিস?'

'এখানে চতুর্থ ব্যক্তি থাকলে বলতাম না। চিফ হওয়ার পর একথা কেউ বলেছে জানলে ব্যবস্থা নেব।' হাসলেন নিরুপম, 'অন্ধদের দেশে গিয়ে চোখ খুলে তাকালে ওদের নয়, তোরই যন্ত্রণা বাড়বে। যাক গে, কি সিদ্ধান্ত নিলি তোরা?'

'বুঝতে পারছি না।' গৌরী বললেন।

'বাকি দুজনকে একসঙ্গে এনে বোঝানো যায় না?'

সৌমিত্র বললেন, 'চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'বেশ। সেই চেষ্টা কর।' নিরুপমের কথার মধ্যেই নীপা এল ঘরে।

'কেমন আছ আঙ্কল!'

'ফাইন। তোমার কীর্তির কথা পড়ে বুক ভরে গিয়েছে। আচ্ছা মা, তুমি কি চাও না ওরা শাস্তি পাক?'

'নিশ্চয়ই চাই?'

'তাহলে যে যাই বলুক, তোমাকে লড়তে হবে।' নিরুপম বললেন।

'কিভাবে?'

'পুলিশ যাদের ধরেছে তারা জামিন পেয়ে যাবে। তারপর সমস্ত অভিযোগগুলো পুলিশ আদালতকে জানালে ওদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হবে। তখন বিচারক তোমাদের ডেকে পাঠাবেন। জানতে চাইবেন ঠিক কি কি ঘটেছিল। পুলিশের উকিল থাকবে, ইচ্ছে করলে তোমরাও উকিল দিতে পারো। ওদের উকিল প্রমাণ করার চেষ্টা করবে তোমরা, তুমি, মিথ্যে বলছ। নিজেরা কোনো অন্যায় করছিলে, ওরা প্রতিবাদ করার মিথ্যে মামলা সাজিয়েছ। সেসময় অনেক খারাপ কথাও শুনতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু তারপরেও যদি ওরা ছাড়া পেয়ে যায়?' নীপা হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'যাতে না পায় তার জন্যে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।'

'কিন্তু আমরা তিনজন ছাড়া আর কোনো সাক্ষী তো সেখানে ছিল না?'

গৌরী মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তিনজনের মধ্যে দুজন তো যেতেই চাইছে না।' যা থেকে বিচারককে বোঝানো যাবে ওরাই এই কাজটা করেছে।' নিরুপম উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে নীপার মনের জোর দেখে। কিন্তু নীপা, তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের ইনস্পায়ার করো প্রথমে। আচ্ছা চলি ভাই, যোগাযোগ রাখিস।'

নিরুপমকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে সৌমিত্র দেখলেন গৌরী গম্ভীর মুখে বসে আছেন। পাশে নীপা।

'কি হল?' চেয়ার টেনে বসলেন সৌমিত্র।

'আমার একটুও ভালো লাগছে না।' বললেন গৌরী।

'এখনই তো কিছু হচ্ছে না। এসব কেস কোর্টে উঠতে কয়েক মাস লেগে যায়। তখন দেখা যাবে। এখন ভেবে কোনো লাভ নেই।'

'তখন যদি তোমরা কেস করতে চাও—?'

'দেখা যাবে। ভালো উকিল পেলে—।'

বাধা দিল নীপা, 'তার মানে?' তুমি আমার কেস নেবে না?'

হাসলেন সৌমিত্র, 'দ্যাখ, আমি প্রফেশন্যাল লোক। ডাক্তার নিজের লোকদের চিকিৎসা করে না যদি ভুল হয়ে যায় এরকম প্রবাদ আছে। আমার বন্ধু বলেছিল, আসলে চিকিৎসা করে ফি নিতে পারবে না, তাই। তুই আমাকে টাকা দিবি কোত্থেকে? আর দিলেও কি নিতে পারব?'

চেয়ারটাকে সশব্দে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল নীপা, তারপর হনহনিয়ে চলে গেল তার ঘরে। সৌমিত্র এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন। গত সন্ধ্যায় পর এই বাড়িতে কেউ এমন গলায় হাসেনি।

এখন বিকেল। পরিপাটি হয়ে জানলার পাশের চেয়ারে বসেছিল সুভদ্র। পরনে রঙিন শার্ট, অনেক সময় নিয়ে চুল আঁচড়ানো তার শখ। জানলার ওপাশে তাকাল সে। মেয়েদের হোস্টেলের জানলাগুলোতে কেউ নেই। ওরা এতক্ষণ কোথায় থাকে কে জানে! এরপরে যখন ফিরবে তখন অন্ধকার নেমে যাবে। এতদূর থেকে ইলেকট্রিকের আলোয় আর কতটা দেখা যায়! পাশের নতুন আসা ভাড়াটের জানলা খোলা। সেদিকে তাকাতেই খুশি হল সুভদ্র। মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা কাজলের মতো দেখতে। মুখ তুলে আকাশ দেখছে। এখন ওই ভঙ্গিতে কাজল বলেই মনে হচ্ছে। মুখ নামাল মেয়েটি। নীচের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মুখের আদল। এখন রানির মতো মনে হচ্ছে। অবিকল রানি মুখার্জি। আশ্চর্য, মেয়েটা ওপর নীচ বাঁ ডান, সবদিকে তাকাচ্ছে কিন্তু সোজা মুখ তুলছে না কেন? তুললেই তো তার সঙ্গে চোখাচোখি হত। ও কি জানে না সে এখানে বসে আছে! না কি জানে বলেই তাকাচ্ছে না! সুভদ্রর ইচ্ছে করছিল কথা বলতে। কিন্তু এখানে বসে কথা বললে তো চিৎকার করে বলতে হবে। সেই চিৎকার বাড়ির লোক তো বটেই পাড়ার লোকের কানে যাবে। হয়তো নীপাই এসে তাকে জ্ঞান দেবে। ছিঃ ছোটকা, এটা কি করলে? তোমার সঙ্গে ওই গুণ্ডাদের কি কোনো পার্থক্য নেই? তুমি ওই মেয়েটাকে টিজ করছ?'

সুভদ্র মনে মনে সংলাপ ভাবল, 'টিজ করছি কোথায়? ও দেখতে পাচ্ছে না বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

'কি দরকার তোমার?' নীপা রেগে যাবে।

'কি করব বল! ওকে যে আমার ভালো লেগেছে।'

সুভদ্র এবার নীপার মুখটাকে অনুমান করতে পারল। প্রথমে রক্ত জমবে ওর মুখে, তারপর বিস্ময়। যার পা নেই তার কি করে ভালোবাসা তৈরি হয় এটা বুঝতে না পেরে ছিটকে সরে যাবে ঘর থেকে।

এইবার মেয়েটি সামনে তাকাল। চোখাচোখি হল। হতেই চোখ সরিয়ে নিল, মেয়েটি। ঠোঁটের কোণে কি এক চিলতে হাসি? তারপর দ্রুত ছুটে গেল ভিতরে, আর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সুভদ্র। তারপর ক্রাচে ভর দিয়ে বিছানায়

ফিরে এল। হাসিটাকে স্পষ্ট দেখেছে সে। কি মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল ওর মুখটা। মেয়েটার নাম কি? কি করে?

মিনিট পনেরো পরে বাবুরামের গলা কানে এল, 'শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

মাথা নাড়ল সুভদ্র।

'তাহলে টিভি খুলে দেব?'

'না। তুমি এখন যেতে পারো।'

বাবুরাম অবাক হল। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করল, 'আলো জ্বেলে দেব?'

'আঃ। কেন কথা বলছ!'

বাবুরাম বেরিয়ে গেলে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুভদ্র। মেয়েটির কত বয়স হতে পারে? একুশ-বাইশ? তার থেকে অনেক ছোট। কি নাম হতে পারে? মেয়েদের কত নাম, তার একটা নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার। অনুমানে বলা অসম্ভব। শুয়ে জানলার বাইরে তাকাতেই আকাশে একটা তারা ফুটে উঠল। এ দৃশ্য কখনও দ্যাখেনি।

টোটা যে বাড়িতে আসবে তা কল্পনাও করেনি নীপা। নতুন কাজের মেয়েটা যখন এসে জানাল একটা ছেলে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, নাম বলেছে টোটা তখন অবাক হয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়েছিল সে।

এখন সন্ধে। টিভি দেখছিল ওরা। গতকাল সব চ্যানেলে ছিল খবর, আজ একবারও তার নাম বা ঘটনাটার উল্লেখ কেউ করছিল না। এই সময় মেয়েটি এসে খবরটা দিল।

গৌরী উঠলেন, 'আমি যাচ্ছি। ওই নাম করে অন্য কেউ যদি আসে—!'

মা চলে গেলে চিন্তিত মুখে বসে থাকল নীপা। অন্য কেউ মানে ওই গুন্ডাদের দলের কেউ। কেন আসবে? তাকে খুন করতে জানিয়ে শুনিয়ে আসবে? হয় নাকি? অবশ্য আজকাল কাগজে যা ছাপা হয় তাতে সব কিছুই সম্ভব বলে ধরতে হবে।

'নীপা, একবার বাইরে আয়।' গৌরীর গলা কানে এল নীপার।

দরজার এসে সে টোটাকে দেখতে পেল। সোফায় বসে আছে। ওকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'তুই তো এখন লক্ষ্মীবাই।'

'মানে?'

'ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই।'

'ভ্যাট!'

'কি বলিস! তুই এখন পাবলিকের মুখে মুখে।'

'হ্যাঁ। গিলছে কিন্তু খাচ্ছে না।' নীপা এসে মায়ের পাশে বসল।

'তার মানে?' গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেউ কেউ প্রশংসা হয় তো করছে কিন্তু তাদের বাড়ির মেয়ে ওরকম কিছু করুক

এটা কখনই চাইবে না।' নীপা বলল, তার পরেই ওর মনে পড়ে গেল, 'তোর নাকি শরীর খারাপ? নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে!'

'তোকে কে বলল?'

'পুলিশের একজন ডি আই জি।'

'ওটা আমার বাবার মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

'কেন?'

'বাবা চাইছেন আমি ফারদার কোনো ঝামেলায় যেন না জড়াই। 'টোটা বলল, 'আমাকে অসুস্থ বানিয়ে রাখলে প্রেস নাগাল পাবে না। তাছাড়া—।' হাসল টোটা, 'আজ সকালে কেউ নাকি বাবাকে ধমকেছে। আমি যদি মুখ বন্ধ না করে রাখি তাহলে সে বাবার বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'কে বলেছে?'

'বাবা আমাকে নামটা বলেননি।'

'কি বারোটা বাজাবে?'

'বাবার তো প্রচুর দু-নম্বরি রোজগার আছে, লোকটা বোধহয় ওসবই জানিয়েছিল। তারপর থেকে বাবা একেবারে ফিউজ।'

'তাহলে এখন এলি কি করে?'

'বাবা বাড়িতে নেই। অবশ্য আমার গাড়ির চাবি লুকিয়ে রেখেছেন। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে চলে এলাম।' টোটা হাসল।

'কিন্তু উনি তো জানতে পারবেন!' গৌরী বললেন।

কিছু করার নেই আন্টি। আমরা তিনজনেই ভিক্টিম। আমি ছেলে, আমার কথা বাদ দিন, নীপা না থাকলে ফুলের অবস্থা কি হত ভাবলেই শিউরে উঠি।'

নীপা বলল, 'কিন্তু ফুল তো ওর মায়ের সঙ্গে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'আমি ফোন করেছিলাম। কাজের লোক বলল ওরা কেউ বাড়িতে নেই।'

'অথচ ফুলই ওদের নিয়ে থানায় যাওয়ার জন্যে ইনসিস্ট করেছিল।' নীপা বলল।

'দ্যাখ নীপা, এখন ফুল যা করছে তা মায়ের ভয়ে। কিন্তু ফুলকে যতটা জানি তাতে বলছি বেশিদিন ওকে ভয় দেখিয়ে আটকে রাখতে পারবেন না ওঁরা।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি করবে ঠিক করেছ?'

'আগের মতো নর্মাল থাকব।'

'কেস উঠলে সাক্ষী দেবে?' গৌরী তাকালেন।

'নীপা যদি দেয় আমিও দেব।'

টোটা কথাটা বলতেই নীপা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতে হাত ছোঁয়াল টোটা। তারপর বলল, 'আমি যে জন্যে এসেছি তোর কাছে সেটা খুব ইমপর্ট্যান্ট। ওরা যে প্রথমে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল, শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল তোদের—।'

বাধা দিল নীপা, 'ভুল বললি। সবচেয়ে বেশি শ্লীলতাহানি ওরা তোর করেছে। জামাপ্যান্ট খুলতে বাধ্য করেছে। মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুইয়ে দিয়েছিল শুধু আন্ডারওয়ার পরিয়ে।'

'তা ঠিক। কিন্তু এই ঘটনার কোনো সাক্ষী নেই। সাক্ষী না পেলে ওদের শাস্তি আদালত কি করে দেবে?' টোটা তাকাল, 'তোর মনে আছে একটা সুমো সেসময় রাস্তার মাঝখানে এসে দৃশ্যটা দেখে দাঁড়াতেই ওরা খুব তড়পে ছিল। ভয়ে চলে গিয়েছিল ওখান থেকে।'

'মনে আছে। আজ বিকেলে নিরুপম আঙ্কলকে বলেছি ও কথা।'

'তিনি কে?'

নিরুপম আঙ্কল কলকাতা পুলিশের একজন সিনিয়ার অফিসার।'

'উনি খুঁজে বের করে দেবেন বলেছেন?'

'না। নাম্বার দেখিনি আমরা। তুই দেখেছিলি?'

'না। তবে গাড়িটার দরজায় গায়ে অন্য রঙ ছিল। বোধহয় চোট পেয়েছিল কিছুদিন আগে।'

'এরকম গাড়িকে কি করে খুঁজে বের করবে?'

'আমার মনে হয় বিরাটি অঞ্চলের গাড়ি।'

'মনে হওয়ার ওপর কি করে নির্ভর করা যায়?'

'ওদিককার গ্যারাজগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

'আমি রাজি আছি।'

'তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

'যাব।'

এবার গৌরী কথা বললেন, 'কি পাগলের মতো কথা বলছিস? তোর এখন বাড়ির বাইরে যাওয়াই বারণ!'

'আমি বাবার সঙ্গে কথা বলব!'

এইসব সৌগতকে দেখা গেল বেশ সেজেগুজে ওপর থেমে নেমে এল।

গৌরী আলাপ করিয়ে দিল, 'নীপার বড় কাকু, আর এই হল টোটা।'

'ও! তুমি! তোমার তো শরীর খুব খারাপ।'

নীপা বলল, 'ওটা ওর বাবা প্রচার করেছেন। ও সাক্ষী দিতে চাইছে। বড়কা, একটা সুমো গাড়ি ঘটনার সময় আমাদের দেখেছে। তার ড্রাইভারকে খুঁজে বের করলে লোকটাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো যায়।'

'তার মানে তুই পিছিয়ে যাচ্ছিস না?'

'না।'

'ও। কিন্তু ওই গাড়িটাকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদা থেকে সূচ খোঁচা একই ব্যাপার। গাড়ির সন্ধানে কে যাবে?'

'আমি আর টোটা।'

'বাঃ! চমৎকার! তোদের মাথায় বাস্তববুদ্ধি নেই জানি কিন্তু এতটা নেই তা জানতাম না। তোরা কোথায় যাচ্ছিস, কার সঙ্গে কথা বলছিস, সেটা জানতে চাইবেই প্রতিপক্ষ। তোরা বিরাটিতে গিয়ে লোকটাকে খুঁজছিস জানা মাত্র ওরা লোকটার হদিস বের করার চেষ্টা করবে। এই আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন খুব শক্তিশালী হয়। ওই লোকটাকে ওরা পেয়ে গেলে তোরা কখনই ওর মুখ খোলাতে পারবি না।' হাসল সৌগত।

গৌরী বললেন, 'তোদের এই অ্যাডভেঞ্চার করার দরকার নেই।'

সৌগত মাথা নাড়ল, 'ঠিক। ও হ্যাঁ বউদি, তোমার তিন ননদ রবিবার আসছে। স্বামীসহ। এক রাত এ বাড়িতে থেকে যাবে।'

গৌরী খুশি হলেন, 'বাঃ, ভালোই তো।'

'বলছ? আমি ভাবছিলাম নীপাকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসব কিনা। তাহলে ওই তিনজনের সামনে ওকে পড়তে হত না।' হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল সৌগত, বলে বেরিয়ে গেল।

টোটা বলল, 'নীপা তোর যাওয়ার দরকার নেই, আমি যাব। বিরাটিতে আমার পরিচিত একজন থাকে। সে হেল্প করতে পারে।'

নীপা ঘাড় নাড়ল। তার খুব ইচ্ছে করছিল যাওয়ার। টোটা হয়তো দু-তিনটে গ্যারাজ দেখে হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু সেই ড্রাইভারটাকে খুঁজে বের করা দরকার।

এই সময় মোবাইলের রিং শোনা যেতে টোটা পকেটে হাত দিল। যন্ত্রটা বের করে পর্দায় নাম্বার দেখে বলল, 'সর্বনাশ।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'বাবা!' বলে অন করল যন্ত্রটা, 'হ্যাঁ, বলো। আমি এক বন্ধুর বাড়িতে। দরকার ছিল। আশ্চর্য! আমার কোনো অসুখ হয়নি, তুমি জোর করে আমার অসুস্থ বানিয়ে বাড়িতে শুইয়ে রাখলে হবে? না, কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করেনি। ঠিক আছে, আমি একটু বাদেই বাড়ি ফিরছি।' অফ করল যন্ত্রটাকে টোটা।

গৌরীর কানে টোটার বলা কথাগুলো গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'উনি যখন চাইছেন তখন ক'দিন বাড়ি থেকে নাই বা বেরুলে।'

'কোনো যুক্তি আছে? বলুন? অন্যায় করল ওরা আর ওদের ভয়ে আমরা গর্তে গুটিয়ে থাকব? স্ট্রেঞ্জ?' বিরক্ত টোটা ঘড়ি দেখল।

নীপা বলল, 'তুই যদি ফুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিস তাহলে আমাকে জানাবি। ও আর কদ্দিন বাড়ির বাইরে থাকবে!'

টোটা ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, যাই—!'

গৌরী বললেন, 'সাবধানে যেয়ো বাবা।'

নীপা বলল, 'বাড়িতে পৌঁছে একটা ফোন করিস।'

'ওকে!' টোটা চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে গৌরী বললেন, 'ওরকম রোগা শরীরে

কি তেজ!' নীপা হাসল। কিছু বলল না।

এই বাড়িতে এলে মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। দেওয়ালের রঙ, আসবাব, এমনকী টেলিফোনটার দিকে তাকালেই বোঝা যায় গৃহকর্ত্রীর রুচি অনেকের চেয়ে আলাদা। অর্জুন এবং মনীষা তার অনেককালের বন্ধু। অর্জুনটা চিরকালই হুইমজিক্যাল। একটার পর একটা ব্যবসা করেছে আর মার খেয়েছে। এই হেরে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া শেষদিকে ওর ব্যবহারে প্রকট হল। তখন থেকেই মনীষার সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে লাগল। সৌগত ওকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু যে বুঝবে না তাকে কি করে বোঝানো সম্ভব? অর্জুন বলেছে, 'আমি যখন প্রথমদিকে প্রায় সফল মানুষ ছিলাম তখন মনীষা আমার প্রপার্টি ছিল। না না, শোন, ওই আমাকে এটা বুঝিয়েছিল। আমি জানি কোনো মানুষ কারও প্রপার্টি হতে পারে না। কিন্তু ওর ব্যবহারে আমার মনে সেরকম একটা অনুভূতি জন্মেছিল। তারপর যতবার আমি ব্যর্থ হতে লাগলাম ততবারই বুঝতে পারছিলাম মনীষা আমাকে ওর প্রপার্টি হিসেবে দেখছে। এমন একটা প্রপার্টি যা শুধু লায়াবিলিটিতে নিঃস্ব। এই মানসিকতায় আর একসঙ্গে থাকা যায় না।'

'তাহলে আলদা যখন থাকছিস, বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছিস না কেন?'

'কেন দেব? মনীষার সুবিধে হবে বলে? অসম্ভব' মাথা নেড়েছিল অর্জুন।

কথাগুলো বলেছিল সৌগত মনীষাকে। মনীষা হেসেছিল, 'এরকম নির্বোধ কথা বোধহয় ও ছাড়া আর কেউ বলবে না।'

'কিন্তু ওর ডিভোর্স দিতে না চাওয়াটাকে তুমি কিভাবে দেখছ?'

'ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কারণই নেই।'

'বুঝলাম না!'

'দ্যাখো, ডিভোর্সের কেন দরকার? যদি আমি অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে চাই তবেই তো! সেরকম কোনো পুরুষ তো আমায় এসে বলেনি বিয়ে করতে চায় তাহলে ডিভোর্স নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?'

'যদি তোমার পছন্দ মতো কোনো পুরুষ প্রস্তাব দেয়?'

'দিক আগে, তারপর ভাবা যাবে। আরে সৌগত, আমাদের তো বয়স হচ্ছে। যতই সেজেগুজে থাকি, মেঘে মেঘে বেলা তো বয়ে যাচ্ছে।' মনীষা হেসেছিল।

আজ দরজা খুলে মনীষা বলল, 'এসো এসো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

ঘরে ঢুকে সৌগত বলল, 'বাঃ।'

'মানে?'

'এই পোশাকে তোমাকে দারুণ লাগছে।'

'থ্যাংক ইউ।'

একটা নীল প্যান্ট যার প্রান্ত গোড়ালির দুই ইঞ্চি ওপরে, আর স্কাইব্লু টপ মনীষার বয়সটাকে অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

সোফায় বসে মনীষা জিজ্ঞাসা করল, 'চা করতে বলব?'

'না।'

'ও হ্যাঁ শোনো, রূপকের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। শিবানী ফোন ধরেছিল। আলতু ফালতু কিছু বলার পর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম। ও তো আকাশ থেকে পড়ল। রূপকের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে ওর কোনো কথাই হয়নি। গতকালও আমাকে ফোন করেনি শিবানী। রূপক স্রেফ বানিয়ে বলেছে তোমাকে।'

'কেন?'

হাসল মনীষা, 'উত্তরটা শিবানীই দিয়েছে। জেলাসি। তুমি বিয়ে করোনি, আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে এটা আমাদের বন্ধুদের অনেকেই সহজভাবে নিতে পারছে না। সবাই ভাবছে তোমার মতো অবিবাহিত হয়ে যদি থাকতে পারত!'

'বাঃ।' সৌগত হাসল, 'তাহলে তো আমাকেই ওরা ঈর্ষা করে!'

'ইয়েস স্যার।'

'ছেড়ে দাও। কি জরুরি কথা বলবে বলছিলে, বলো।'

মনীষা মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার তাসের আড্ডা আজ নেই?'

'যদ্দিন কমলদা বেঁচে থাকবেন তদ্দিন বন্ধ হবে না।'

'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে ওখানে যাবে?'

'তাই তো ভেবেছি।'

'ভাবনাটা বদলে ফেলা যায় না?'

'কি রকম?'

'আজ আমার এখানেই নাহয় আড্ডা মারো।' মনীষা হাসল।

'তুমি তো জানো—।'

বাধা দিল মনীষা, 'জানি, যতক্ষণ তুমি ঠিক থাকবে, খেলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বেঠিক হলেই খাওয়া বন্ধ করবে।'

সৌগত হাসল, 'কখনও শুনেছ আমি বেঠিক হয়েছি? কিন্তু তাহলে তো আমাকে বেরুতে হয় একবার।'

'তার দরকার নেই। আমি এনে রেখেছি।'

'সর্বনাশ! তুমি মদের দোকানে ঢুকেছিলে?'

'কেন? অন্যায় কি করলাম?'

'মেয়েরা মদের দোকানে ঢুকে মদ কিনছে এটাতে আমি অভ্যস্ত নই। তাছাড়া তুমি একটা স্কুলে পড়াও, এটাও মাথায় রাখা উচিত। তুমি আমাকে ফোনে বলতে পারতে। ঠিক করোনি কাজটা।' মাথা নাড়ল সৌগত।

বেশ মজা পাচ্ছিল মনীষা সৌগতর প্রতিক্রিয়ায়। বলল, 'বাব্বা! তুমি যে এত কনজারভেটিভ তা আগে জানতাম না। মেয়েদের সঙ্গে বসে মদ খেতে আপত্তি করো না, তারা কিনতে গেলেই আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ল। আমি আজ পার্ক স্ট্রিটে

গিয়েছিলাম একটা কাজে। ওখানে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অ্যালকোহল বিক্রি হয়। দেখলাম মহিলারাও কিনছেন। আমিও চাইলাম। ওরা মুখের দিকে না তাকিয়েই টাকা নিয়ে বোতল র‍্যাপ করে দিয়ে দিল।'

সৌগত হেসে ফেলল। 'কিন্তু জরুরি কথাটা বললে না!'

'বলব। আগে ব্যবস্থা করি।' মনীষা উঠল।

মিনিট চারেক বাদে ভেতরের ঘর থেকে মনীষার ডাক এল। সৌগত উঠল। দেখল টেবিলে তরিবত করে সব সাজানো। দামি হুইস্কির বোতল, বরফের বাক্স, একটা গ্লাস এবং কাজু এবং কিশমিশ।

'তুমি?'

চোখ বড় করে মাথা নাড়ল মনীষা।

অগত্যা সৌগত বসল। ঘড়িতে এখন সন্ধে পার হওয়া রাত।

বরফ এবং হুইস্কি মিশিয়ে গ্লাসটা একটু ওপরে তুলে বলল, 'উল্লাস।'

উলটো দিকের চেয়ারে বসে মনীষা বলল, 'উল্লসিত হও।'

একটা চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করল সৌগত, 'এবার বলো।'

'কি বলব?'

'জরুরি কথাটা।'

'ও। একটু পরে অর্জুন এখানে আসবে।' মনীষা বলল।

'বাঃ, খুব ভালো খবর। কিন্তু—!' সৌগত তাকাল মনীষার দিকে, 'আমাকে আজ ডাকলে কেন?'

'ওই কারণেই তো!' মনীষা গম্ভীর হল।

'তার মানে?'

'আমি অর্জুনের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই না।'

'কেন?'

মনীষা তাকাল, 'আমি কি তোমাকে খুব অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছি?'

'কিছুটা। তুমি এবং অর্জুন আমার বন্ধু। অর্জুনের সঙ্গে ইদানিং আমার দেখা হয় না, তোমার সঙ্গে হয়। তোমরা আলাদা থাকো কিন্তু তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এখনো ভেঙে যায়নি। অর্জুন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি আলোচনা করতে এখানে আসছে। সেই আলোচনার সময় আমার এখানে থাকা ও পছন্দ কেন করবে? এখানে আমাকে দেখে সেটা মুখের ওপর বলেই দিতে পারে সে।' সৌগত বলল।

'না। সেটা বলবে না। কারণ তুমি যে এখানে থাকতে পারো তা আমি ওকে বলেছি। ওর আপত্তি থাকলে তখনই ও বলে দিত।' মনীষা বলল।

সৌগত হাসল, 'বেশ। কিন্তু মনীষা, আজ কি এমন ঘটনা ঘটল যে অর্জুনের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার মনে হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তির থাকা দরকার! এতকাল নিশ্চয়ই এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়নি!'

'হচ্ছিল। শেষবার ও এসেছিল মাস দুই আগে। কথা শুরু করার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ও এমন উত্তেজিত হয়ে গেল যে যা কোনোদিন ওরা মুখে শুনিনি সেইসব অশ্লীল শব্দের ঝড় বইয়ে দিল। দ্যাট ওয়াজ টু ম্যাচ ফর মি। আজ যখন ও ফোনে বলল কথা বলতে চায় তখন আমি প্রথমে রাজি হইনি। ও জোর করতে বললাম, কথা বলার সময় আমাদের পরিচিত কাউকে থাকতে হবে। আমি অবাক হয়ে শুনলাম ও তোমাকে খবর দিতে বলল।' মনীষা হাসল।

'অবাক হলে কেন?'

'রূপকের মতো দু-তিনজন আমাদের সম্পর্ক গল্প তৈরি করেছে। তা নিশ্চয়ই অর্জুনের কানে গিয়েছে। তারপরও ও তোমাকে খবর দিতে বললে আমি অবাক হব না! একি! তুমি গ্লাসে হাতই দিচ্ছ না যে!'

'স্লো চলছি। অর্জুন কি নিয়ে কথা বলতে আসছে?'

'টেলিফোনে বলেনি। আসলে ওর কোনো কথা নেই। আমায় বিরক্ত করতে ওর ভালো লাগে, তাই আসছে।'

মিনিট পাঁচেক বাদে বেল বাজল। সৌগতর দিকে একবার তাকিয়ে মনীষা গেল দরজা খুলতে। একটু পরে সৌগত শুনতে পেল, 'এসো।'

অর্জুনের গলা, 'সৌগত এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

অর্জুনই এগিয়ে এল সামনে, 'কি রে! কেমন আছিস?'

'চলছে।'

'চলছে কি রে! কাগজে পড়লাম খবরটা। তোর ভাইঝি যা করেছে তা পড়ার পর খুব গর্ব বোধ করছি। শাবাশ। ওইটুকু মেয়ে যখন এমন সাহস দেখাতে পারে তখন সব মহিলারাই এই দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন।' মাথা নাড়তে নাড়তে কথাগুলো বলছিল অর্জুন। সৌগত দেখছিল, অর্জুনের চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে। কথাও বলছে দ্রুত।

সৌগত বলল, 'আয়, বোস। একটা গ্লাস দিতে বলি!'

মনীষা মাথা নাড়ল, 'না। অন্তত যে জন্যে এসেছ সেটা শেষ করার আগে নয়!'

অর্জুন বলল, 'আমাকে আন্ডার এস্টিমেট কোরো না মনীষা।'

'যা বলছি তা অভিজ্ঞতা থেকেই—!'

সৌগত এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল, 'তোরা কথা বল। আমি চলি।'

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল নেশা না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকবে। বোসো।' মনীষা বলল।

ইশারায় ওকে বসতে বলল অর্জুন।

নতুন পেগ গ্লাসে ঢালার সময় সৌগত লক্ষ করল অর্জুনের চোখ চকচক করছে। সে বলল, 'যা বলার চটপট বলে নে। নইলে খেতে দেরি হবে।'

'হ্যাঁ। বলছি। মনীষা, আমি যদি এই বাড়িতে চলে আসি তাহলে কি আপত্তি করবে?'

'অবশ্যই।' মনীষা গম্ভীর হল।

'কেন?'

'অনেক চেষ্টার পরে প্রমাণিত হয়েছে যে তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। তারপর এই একা থেকে থেকে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। এই স্বস্তি হারাতে চাই না।'

'কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমাদের ডিভোর্স হয়নি।'

'আইনের হয়নি। মনের অনেকদিন আগে হয়ে গেছে।'

'তাহলে আমি আজ এলাম কেন?'

'তোমার প্রয়োজন হয়েছে বলে এসেছ। আমরা তো পরস্পরের শত্রু নই।'

অর্জুন সৌগতর দিকে তাকাল, 'তুই কি বলিস?'

সৌগত বলল, 'ব্যাপারটা তোদের, আমি কি বলব?'

'বলবি। তুই আমাদের দুজনের বন্ধু। এভাবে আলাদা কতদিন থাকা যায়?'

মনীষা বলল, 'একসঙ্গে থাকার তো কথাই ওঠে না। তুমি যদি আবার কাউকে বিয়ে করতে চাও তাহলে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে আমি রাজি।'

'আর একটা বিয়ে?' অর্জুন হাসল, 'পাত্রী কোথায় পাব?'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

'তাহলে তুমি রাজি নও?'

'না।'

'তুমি কি ডিভোর্স চাও?'

'এখনই দরকার বোধ করছি না।

'কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারো!'

'তাই নাকি?' হাসল মনীষা।

'হ্যাঁ। তুমি এখনও সুন্দরী, বেশ সুন্দরী।'

'ঠিক আছে। তোমার উপদেশ মনে থাকবে। তেমন পাত্র পেলে ভেবে দেখব।'

'পাত্র পেলে মানে? পাত্র তো পেয়েই গেছ!'

'বাঃ, আমি পেয়েও জানলাম না আর জেনেছ তুমি?'

'কেন? এই তো সৌগত বসে আছে এখানে। বিয়ে করেনি। ভালো ছেলে। নইলে একা বাড়িতে ডেকে ওকে মদ খাওয়াতে না? শুধু মদ নয়, কিশমিশ বরফ, এত তোয়াজ করতে না। তা তোমরা বিয়ে করলে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার কথা শেষ। এখন এই ব্যাপারটাকে সেলিব্রেট করা যাক। সৌগত ফার্স্ট পেগটা দে। নো ওয়াটার অর আইস।' অর্জুন বলল।

'তুমি একটি মিথ্যেবাদী। আজ দুপুরেও তুমি মদ গিলেছ। আমি ভদ্রভাবে অনুরোধ করছি এবাড়ি থেকে চলে যেতে।' মনীষা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি আমাকে অপমান করছ মনীষা।' অর্জুন গর্জে উঠল।

সৌগত বুঝল অবস্থা খারাপের দিকে এগোচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! তোমরা তো আলোচনা করতে চেয়েছিলে। ঝগড়া করতে নিশ্চয়ই নয়।'

মনীষা বলল, 'এই জন্যেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। 'ওকে! সৌগত, তুই আমার বন্ধু?'

'অবশ্যই।' সৌগত তাকাল।

'তাহলে আজকের পর তুই এই বাড়িতে আসবি না, বাইরেও ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি ওকে শিক্ষা দিতে চাই।'

'আমি যোগাযোগ না রাখলে মনীষা কি করে শিক্ষিত হবে?' সৌগত হাসল।

'অ। তুই তাহলে মরেছিস। মনীষা তোকে খেয়ে নিয়েছে। এখন তোর নিজের বলতে কিস্যু নেই। তুই ওর চামচে হয়ে গিয়েছিস। ছিলিস তো ভালো। দুপুরের ঠাকুরপো হয়ে বউদিদের মধু খেয়ে বেড়াতিস। অবিবাহিত দেওর হয়ে অ্যাডভানটেজ নিতিস। কেউ কিছু বলত না। দিব্যি সুখে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলি! শেষে কিনা পচা শামুকে পা কাটালি? ছিঃ। একটা কথা শোন। তুই যে এখানে আসছিস তা পাড়ার ছেলেরা পছন্দ করছে না। আমি একটু তাতিয়ে দিলেই তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে ওরা। এই আমার মার্সির ওপর আছিস।' হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল অর্জুন।

চেয়ারে বসে পড়ল মনীষা। দুহাতে মুখ ঢাকল। সৌগত কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মনীষা বলল, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি সৌগত। কিন্তু তোমাকেও যে ও অপমান করবে আন্দাজ করতে পারিনি।'

'ঠিক আছে। এ নিয়ে ভেবো না। কিন্তু ওকে সহ্য করে আছ কি করে?'

'না করে উপায় কি। আলাদা আছি বলে স্বস্তিতে আছি।'

'ডিভোর্স চাইছ না কেন?'

হাসল মনীষা, 'হ্যাঁ, ও কনটেস্ট করলেও আমি ডিভোর্স পাব। অনেক প্রমাণ আমার কাছে আছে। কিন্তু তারপরে?'

'তারপরে মানে?'

'আমি এখনও বিবাহিত জেনে অনেক নখ লুকিয়ে আছে। ধারালো দাঁতেরা এখনো দেখা দেয়নি। ডিভোর্সি শুনলেই সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'তাই বলে মিথ্যে সম্পর্কটাকে বয়ে বেড়াবে?'

'জানি না। আমি জানি না আমার কি করা উচিত।'

সৌগত উঠল। 'বেশ রাত হয়েছে এবার চলি।'

'যাবে! বেশ। এসো।'

'ফোন করব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সৌগত। মনে ভার জমেছিল। আজকে তার বিন্দুমাত্র

আনন্দ হয়নি পান করে। আবার এখন এত রাত যে কমলদার বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। দু'পাশের বাড়িগুলো ঝিমোচ্ছে। রাস্তায় আলো নেই বললেই ঠিক বলা হবে। হঠাৎ চারটে ছেলে অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সৌগত জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ভাই?'

সঙ্গে সঙ্গে হাত চলল। মাটিতে পড়ে গেল সৌগত। লাথি ঘুষি পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়ার পরেও ওরা খুশি হল না। সৌগত চিৎকার করে উঠল। তার পেটের ভেতর শক্ত কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা। সৌগতর চেতনা চলে গেল।

ফোনটা বাজছিল। একটু আগে রাতের খাওয়া শেষ করে সৌমিত্র এবং গৌরী বিছানায় এসেছেন। নীপা শুয়ে পড়েছে তার ঘরে। নীপাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন গৌরী কিন্তু সৌমিত্র বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া মাত্র ওই যে চোখ বন্ধ করেন, হুঁ হ্যাঁ ছাড়া শব্দ বের হয় না মুখ থেকে। একসময় সেটাও বন্ধ হল। এবং তখনই ফোন বাজল।

গৌরী নামলেন বিছানা থেকে। ঘড়িতে এখন পৌনে বারোটা।

'হ্যালো।'

'নমস্কার। সৌমিত্রবাবু আছেন? আমি লোকাল থানার ও সি বলছি।'

এতরাত্রে পুলিশ? আবার কি হল? টোটা বাড়ি ফিরে গিয়ে ফোন করেনি। ওর কিছু হয়নি তো? গৌরী স্বামীর শরীরে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ফোনের কথা বললেন।

বিরক্ত সৌমিত্র বিড়বিড় করলেন, 'রিসিভারটা নামিয়ে রাখা উচিত ছিল।'

খাট থেকে নেমে রিসিভার তুললেন। 'সৌমিত্র বলছি।'

'নমস্কার। আমি লোকাল থানার ও সি বলছি। খবরটা খারাপ বলেই এতরাত্রে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। সৌগতবাবু, আপনার ভাই, গুড হেলথ নার্সিং হোমের আই সি ইউ-তে আছেন। অবস্থা ভালো নয়।' ও সি বললেন।

'সেকি! কি হয়েছে ওর?' চিৎকার করলেন সৌমিত্র।

'ঘণ্টা দেড়েক আগে ওঁকে আপনাদের পাড়ার কাছেই একটা অন্ধকার গলিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দ্যাখেন একজন এস আই। তখন তার পরিচয় জানা যায়নি। সারা শরীরে ক্ষত, বিশেষ করে পেটে। ওই নার্সিং হোম কাছাকাছি থাকায় সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় ওঁকে। তখন দেখা যায় ওঁর পেটে ছুরি মারা হয়েছে।' ওসি বললেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে সৌমিত্র এবং গৌরী গেলেন গুড হেলথ নার্সিং হোমে। জানলেন সৌগতর তখনও জ্ঞান ফেরেনি। অক্সিজেন, স্যালাইন চলছে। ওকে আইডেন্টিফাই করেছেন একজন নার্স যিনি মনীষাদের পাড়ায় থাকেন। মনীষাকে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি কারণ ওর বাড়িতে সৌগতকে যেতে দেখেছিলেন কয়েকবার। মনীষা ছুটে আসে। আইডেন্টিফাই করে। সে-ই দায়িত্ব নিয়ে ডাক্তারদের বলে প্রাণ বাঁচাতে যা করার তাঁরা যেন করেন। ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখনই

অপারেশন করবেন। নার্সটি জানালেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে মনীষা?'

সৌমিত্র বললেন, 'আমি জানি না।' তিনি নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনীষা দেবী কি এখন এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ। আছেন। টেনশনে ওঁর ব্লাড প্রেশার খুব কমে যাওয়ায় ওঁকে রেস্ট নিতে বলা হয়েছে। ওঁর কাছ থেকে আপনাদের ফোন নাম্বার পেয়ে আমরা পুলিশকে জানাই। পুলিশ একবার ঘুরে গেছে।' নার্স জানালেন।

সৌমিত্র ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। এই ওষুধগুলো এখনই দরকার হবে। আমরা অ্যানাসথেসিস্টের জন্যে অপেক্ষা করছি। তার মধ্যে নিয়ে আসুন।'

গৌরীকে হাসপাতালে থাকতে বলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বেরুতে বেরুতে সৌমিত্র ভেবে নিলেন, তাঁকে প্রথমে বাড়িতে গিয়ে টাকা নিতে হবে। এত রাত্রে কোন্ অঞ্চলে গেলে ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া যাবে ভাবতেই মনে পড়ল গড়িয়াহাটের একটা ওষুধের দোকান সারারাত খোলা থাকে বলে শুনেছেন।

নার্সিংহোমের গেটের কাছে পৌঁছোতেই গাড়িটা এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে যে ভদ্রলোক দ্রুত তাঁর কাছে চলে এলেন তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেননি সৌমিত্র। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ভাই এখন কেমন আছেন?'

চিনতে পারলেন সৌমিত্র, বিল্টু দত্ত। বললেন, 'ভালো নয়।'

'একটু আগে খবরটা পেয়েই ছুটে এলাম। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, অতি সজ্জন মানুষ আপনি, আপনার ভাইও নিশ্চয়ই—। এসব কথা থাক এখন। পুলিশ এসেছে?'

'হ্যাঁ'।

'কোনো শত্রু ছিল?'

'আমি কিছুই জানি না মিস্টার দত্ত। কিন্তু আমাকে এখনই ওষুধ নিয়ে আসতে হবে। এখনই ওর অপারেশন করবেন ডাক্তাররা।'

'দেখি প্রেসক্রিপশনটা?' সৌমিত্রর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন বিল্টু দত্ত। এক পলক দেখে বললেন, 'এসব ওষুধ এই তল্লাটে পাবেন না।' তারপর চিৎকার করে ডাকলেন, 'উঙ্কি, কুইক!'

সঙ্গে সঙ্গে একটি লম্বা লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। কাবুলিয়ালার মতো কালো পোশাক। বিল্টু দত্ত বললেন, 'আধঘণ্টার মধ্যে ওষুধগুলো চাই। পিজির সামনে পাবে। বিল্টু দত্তর জীবনে না বলে কিছু নেই। কুইক।'

লোকটা গাড়ি নিয়ে মিলিয়ে গেল।

সৌমিত্র হতভম্ব। বললেন, 'এটা কি হল?'

'ওষুধটা তাড়াতাড়ি আনা খুব জরুরি। আপনি যে সময় নিতেন তার ওয়ান থার্ড সময়ে ওটা এসে যাবে। চলুন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি।'

কোনো প্রতিবাদ করার সুযোগ পেলেন না সৌমিত্র।

ডাক্তাররা আলোচনা করছিলেন। বিল্টু দত্ত ঘরে ঢুকে বললেন, 'অপারেশন টেবিল রেডি করুন। ওষুধ এসে যাচ্ছে।'

'দেরি করা ছাড়া উপায় নেই। অ্যানাসথেসিস্ট অন্য নার্সিংহোমে, ছোট অপারেশনে ব্যস্ত আছেন।' একজন ডাক্তার বললেন।

'তার আসার আগে যদি পেশেন্টের মৃত্যু হয়—।'

'কিন্তু অ্যানাসথেসিস্ট ছাড়া কি করে অপারেশন করব?'

বিল্টু দত্ত মোবাইল বের করে নিচু গলায় কথা বললেন। মাথা নাড়লেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের অ্যাম্বুলেন্স আছে?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'কুইক। আমরা পেশেন্টকে টেগোর হসপিটালে নিয়ে যাব। এখনই।'

'কিন্তু—!'

'এখন অবধি যা খরচ হয়েছে সব পেয়ে যাবেন।'

খবর শুনে গৌরী এলেন, 'একি শুনছি!

বিল্টু দত্ত বললেন, 'এখানে হাপিত্যেশ করে বসে থাকলেও সেটা হতে পারে। এঁরা বলতেই পারছেন না কখন অপারেশন হবে!'

সৌমিত্র বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী।'

'ও। নমস্কার। এমন সময়ে আলাপ হল—!'

'ওই মহিলা মনীষা কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা করলেন সৌমিত্র।

'ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। খুব আপসেট হয়ে পড়েন। নার্সকে বলেছেন, 'ওঁর বাড়িতে যদি ঠাকুরপো না যেতেন তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। নিজেকে দায়ী করছেন।'

'ওঁর কি করার আছে! কখন ছাড়বে ওঁকে?' সৌমিত্র প্রশ্ন করলেন।

'বলল, কাল সকালে।'

'মনে করিয়ে দিয়ো, কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

টেগোর হসপিটালে সৌগতকে নিয়ে যাওয়া মাত্র ওকে অপারেশন টেবিলে তোলা হল। মোবাইল মারফত খবর পেয়ে উঙ্কি ওষুধ নিয়ে সেখানে হাজির।

অপারেশন শুরু হলে বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের খবরটা কে দিয়েছে? পুলিশ?'

'হ্যাঁ।'

'ভাগ্য ভালো। বেশির ভাগ লোক সঙ্গে কোনো আইডেন্টিটি কার্ড রাখে না। তাদের ক্ষেত্রে পরিচয় জেনে আত্মীয়দের জানানো অসম্ভব হয়ে যায়। আচ্ছে, কারা এই কাজ করল বলে আপনার মনে হয়?' বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি জানি না। ও বোধহয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে থেকে ফেরার সময় আক্রমণ করা হয়!'

'ওঁর কাছে আইডেন্টিটি কার্ড ছিল?'

'না। একজন নার্স ওকে চিনতে পারেন। যে বন্ধুর বাড়িতে যেত সেই পাড়ায় মহিলা থাকেন।'

'সেই বন্ধু খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। উনিই নার্সিংহোমে ছুটে এসে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার টেলিফোন নাম্বারও পুলিশকে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরই টেনশনে ওঁর শরীর এত খারাপ হয়ে যায় যে ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছে। ভদ্রমহিলা ওই নার্সিংহোমেই ঘুমোচ্ছেন।'

'ভদ্রমহিলা?' বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ভাই তো ব্যাচেলার?'

'হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?'

'জানতে হয়।' বিল্টু দত্ত বললেন, 'ব্যাপারটা মহিলা-সংক্রান্ত হলেও হতে পারে। পুলিশ ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বললেই জানতে পারবে।'

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, 'অপারেশন ভালো হয়েছে। আর কোনো চিন্তা নেই। তবে আর কিছু দেরি হলে বাঁচানো যেত না। শরীরে রক্ত ছিল না। আপনাদের আর রাত্রে থাকার দরকার নেই। কাল সকালে এলে কথা বলতে পারবেন। বোধহয় কিছু ফর্মালিটিজ আছে, সেটা কালকেই করবেন।'

সৌমিত্রর মুখে হাসি ফুটল। 'ভাগ্যিস আপনি জোর করে ওকে এখানে নিয়ে এলেন। কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব!'

'অনেক সময় এবং সুযোগ পাবেন। এখন রাত শেষ হয়ে আসছে। যান, বাড়ি চলে যান মিসেসকে নিয়ে।' বিল্টু দত্ত বললেন।

'আপনি!'

'না মশাই। আমি ঘরপোড়া গোরু। ডাক্তার যা-ই বলুন, আমি এখানে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আপনি এলে আমার ছুটি।' বিল্টু দত্ত হাসলেন।

'আশ্চর্য! আপনি কেন রাত জাগবেন?'

'বেশ। আপনি জাগুন। আমি না হয় কাল সকালে আসব।'

বিল্টু দত্ত চলে গেলে গৌরীকে ড্রাইভার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন সৌমিত্র। একা হওয়ার পর চিন্তাটা মাথায় এল। আর আসামাত্র প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না।

মনীষার ঘুম ভেঙেছিল খুব ভোরে। নার্সিংহোমের বিছানায় নিজেকে দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন প্রথমে। তারপরে একটু একটু করে সব মনে পড়ল।

হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কাল রাত্রে একজন পেশেন্টের অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। উনি কেমন আছেন?'

'সৌগত--!' নার্স নামটা মনে করে বললেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ওকে তো কাল রাত্রেই পেশেন্টের লোকজন অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।'

'অপারেশন হয়নি?'

'না।'

'সেকি! কোন্ হাসপাতালে?'

'তা জানি না। রিসেপশনে খোঁজ নিন।'

রিসেপশনিস্ট খাতা দেখে বলল, 'টেগোর হসপিটালে।'

'ও। কাল রাত্রে আমাকে এখানে থাকতে বলা হয়েছিল। কি দিতে হবে?'

'কিছু না। কাল ভোরের আগে আপনার রুম চার্জ, ইনজেকশনের দাম আর সৌগতবাবুর বিল মিটিয়ে দিয়ে গেছেন এক ভদ্রলোক।'

'কে?'

খাতা দেখে নামটা বলল মেয়েটি 'বিল্টু দত্ত।'

'বিল্টু দত্ত? কে তিনি?' মনীষা অবাক।

'তা জানি না। আপনাদের হয়ে টাকা দিল, আপনাদের জানা উচিত।'

আজ শরীর অনেকটা ভালো হলেও ঝিমঝিম ভাবটা যায়নি। ট্যাক্সিতে টেগোর হসপিটালে যখন মনীষা পৌঁছোলেন তখন ভালো করে সকাল হয়নি। ভিজিটার্স রুমে যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁদের মধ্যে কোনো পরিচিত মুখ নেই। সে রিসেপশনে খোঁজ করল। রিসেপশনিস্ট একজন বয়স্কা মহিলা। নাম শুনে দূরে বসা সৌমিত্রকে দেখিয়ে বললেন, 'অপারেশন ভালো হয়েছে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি পেশেন্টের দাদা।'

সৌমিত্রকে দেখল মনীষা। সৌগতর সঙ্গে সামান্যই মিল। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নমস্কার! আপনি সৌগতর দাদা?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সৌমিত্র, মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'আমি মনীষা, সৌগতর বন্ধু।'

'ও!' উঠে দাঁড়ালেন সৌমিত্র, 'আপনি, আপনি কি অসুস্থ ছিলেন?'

লজ্জা পেল মনীষা, 'ঠিক তা নয়। নার্ভাস হয়ে গিয়ে, প্রেশার ড্রপ করল আচমকা। এখন ঠিক আছি। কেমন হয়েছে অপারেশন?'

'সাকসেসফুল। ওখানে অ্যানাসথেসিস্ট না পাওয়া যাওয়ায় এখানে নিয়ে আসতে হল। আপনি এখন ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ। ওর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে?'

'না। এখনো না। কাল কি হয়েছিল জানেন?'

'জানি না। আমার বাড়িতে সৌগত এসেছিল। আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু ও। সে ছিল। কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ও, সৌগত তাতে সায় না দেওয়াতে ওর ওপর খেপে গিয়ে যা-তা বলে বেরিয়ে যায়। সৌগতও বেশিক্ষণ

থাকেনি। হঠাৎ ওই হাসপাতালের নার্স আমাকে জানাল ওকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আমি ভাবতেই পারছি না কেউ ওকে আঘাত করতে পারে।' মনীষা বলল।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার স্বামী মানুষ হিসেবে কেমন?'

'একটু রগচটা। আমার সঙ্গে যাই থাক এই কাজ ও করতে পারে না।'

'সৌগতর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কি ঘটেছিল তা জানতে।'

একটু বাদেই দুটো পুলিশের জিপ এল হাসপাতালে। সৌমিত্রর পরিচিত ও সি বললেন, 'আরে বলবেন তো, পেশেন্টকে এখানে নিয়ে এসেছেন! বিল্টুবাবু খবরটা না দিলে ওখানে যেতে হত। ইনি এই এলাকার ও সি। ইনি বিখ্যাত আইনজ্ঞ—।'

'জানি। পেশেন্টের সেন্স ফিরেছে?'

'এখন ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আছে।'

'চলুন, হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে যাই।' দুই অফিসার ভেতরে চলে গেল মনীষা বলল, 'আচ্ছা, বিল্টু দত্ত কে?'

চমকে উঠলেন সৌমিত্র, 'কেন?'

'সকালে ওই নার্সিংহোমে কি দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম বিল্টু দত্ত নাকি সব পেমেন্ট করে গেছেন। সৌগতর হাসপাতালে আসার খবরটাও শুনলাম উনিই পুলিশকে দিয়েছেন। আপনাদের আত্মীয়?'

'না।'

'বুঝতে পেরেছি, আপনার কোনো মক্কেল। কিন্তু উনি আমার দেয় টাকা দিতে গেলেন কেন?'

উত্তরটা দিতে হল না। কারণ সেইসময় গৌরী নীপাকে নিয়ে চলে এল।

নীপা দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা কলল, 'বড়কা কেমন আছ বাবা?'

'বিপদ কেটে গেছে। এখন ঘুমোচ্ছে।'

'দেখতে দেবে না?' নীপা ব্যস্ত।

'এখন না। সময় হলে ডাক্তার ডাকবেন।'

গৌরী বললেন, 'তুমি বাড়ি চলে যাও। সারারাত জেগে আছ।'

'ঠিক আছে। গৌরী, ইনি মনীষা। সৌগতর বন্ধু।'

'ও। কেন হল এরকম?' গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'বিশ্বাস করুন, আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না।'

'ও, আমার মেয়ে নীপা।'

'বুঝেছি। তোমার কথা কাগজে পড়েছি। তোমার মতো সাহসী মেয়ের জন্যে বুক আনন্দে ভরে গেছে। লোকগুলোর ভয়ংকর শাস্তি হওয়া দরকার।'

'আর শাস্তি! এখন তো আমরা ভয়ে মরছি।' গৌরী বললেন।

'কেন?'

'ওরা কি ওকে ছেড়ে দেবে?' তারপর স্বামীর দিকে তাকালেন, 'শোনো, বাড়িতে

হাজার দশেক ছিল। নিয়ে এসেছি। হাসপাতালে জমা দিয়ে দাও।'

ওদের নিয়ে রিসেপশনে এলেন সৌমিত্র। টাকা দিতে চাইলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, 'সেকি! আপনারা জানেন না! কাল রাত্রেই তো মিস্টার বিল্টু দত্ত তিরিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে গেছেন। মনে হয় ওতেই হয়ে যাবে।'

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বিল্টু দত্ত কে বাবা?'

চোখ বন্ধ করে সৌমিত্র বললেন, 'পরিচিত। আচ্ছা, ওর টাকা ফেরত দেওয়া যায় না? টাকাটা আমরা নিতে চাই না।'

'সরি। অলরেডি অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে। তাছাড়া ওঁকে আমরা অসন্তুষ্ট করতে চাই না।'

সৌমিত্র বললেন, 'চল, এখানে অপেক্ষা করে আর কোনো লাভ নেই।'

যেতে যেতে নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার একজন পরিচিত লোক কেন এত টাকা দেবেন?'

'কেউ যদি গায়ের জোরে টাকা দেয় তাহলে আমি কি করব!' সৌমিত্র খুব বিরক্ত হলেন।

'গায়ের জোরে মানে?'

'নিজে থেকেই লোকটা টাকা দিচ্ছে। হ্যাঁ, কাল যদি তোর বড়কাকে তাড়াতাড়ি ও এই হাসপাতালে নিয়ে না আসত তাহলে ওকে বাঁচানো যেত না। এর জন্যে আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ। তাই টাকা কেন দিচ্ছে বলে অপমান করতেও পারছি না।'

'উনি কি বড়কাকে চেনেন?'

'না।'

'বড়কা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন এ পেলেন খবর কি করে?'

'জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, আমি সব খবর পাই।'

বিকেলে ওরা হাসপাতালে গিয়ে শুনল সৌগতর জ্ঞান ফিরেছে। তবে বেশিক্ষণ ওর কাছে থাকা যাবে না। সৌমিত্র, গৌরী এবং নীপা কেবিনে ঢুকে দেখলেন মনীষা ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

'কেমন আছিস?' সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু হাসার চেষ্টা করল সৌগত।

গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?' মাথা নেড়ে না বলল সৌগত।

'বড়কা, যারা তোমাকে মেরেছে, তাদের দেখেছ?'

মাথা নাড়ল সৌগত, না। মনীষা বলল, 'আমি আজ অর্জুনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওর কথা থেকে বুঝেছি এ ব্যাপারে ও কিছু জানে না। খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছি।'

এইসময় লোকাল থানার ও সি এলেন, 'আপনার সঙ্গে কাল কথা বলব। একটা

খবর পেয়েছি। চারজন লোক একটা গাড়িতে করে পাড়ায় ঢুকেছিল। তারা বন্ধ হতে যাওয়া সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কেনে। গাড়ির নাম্বার কেউ মনে রাখেনি। এই দলটাই কাজটা করেছে।'

'ওদের খুঁজে পাবেন?' সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'দেখা যাক। কোনো ক্লু না পেলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

নার্স এসে তাড়া দিলেন। আর থাকা যাবে না।

রাত্রে টেলিফোন পেলেন সৌমিত্র। বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই তো বিপদমুক্ত?'

'হ্যাঁ।'

'যাক। ভালো খবর। ও হ্যাঁ। আমার ছেলে বন্ধুদের নিয়ে ওই অন্যায় কাজটা যখন করছিল তখন একটা সুমো গাড়ির ড্রাইভার একটু দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেছে। কিন্তু কি বলব স্যার, আজ লোকটা বেমালুম অস্বীকার করল। বলল ও নাকি ওদিকে সেদিন যায়নি। বুঝুন!' হাসলেন বিল্টু দত্ত।

'তার মানে একমাত্র সাক্ষীকেও আপনি মুখ বন্ধ করতে বাধ্য করলেন?'

'কি করব চলুন! উপায় নেই। ওদের সংশোধনের ব্যবস্থা না করে শাস্তি দেওয়া হোক আমি চাই না। যেমন চাইনি আপনার ভাই একজন অ্যানাসথেসিস্টের অভাবে মারা যাক। আচ্ছা, আজ রাখি।'

'শুনুন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমার মনে হচ্ছে সৌগতকে যারা খুন করতে চেয়েছিল তাদের আপনি জানেন! কিন্তু কেন খুন?' পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলেন সৌমিত্র।

'না না। আমি কিছুই জানি না। শুধু আপনার কাছে পৌঁছোতে একটা সেতু খুঁজছিলাম। ওটা পেয়ে গেলাম। ব্যস।' ফোন রেখে দিলেন বিল্টু দত্ত।

সৌমিত্র বুঝলেন অদৃশ্য নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছেন। নীপাকে সঠিক উত্তর দেওয়ার, ওকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার ক্ষমতাও তাঁর কমে আসছে।

সৌমিত্র জানেন না তিনি কি করবেন।

দুদিন বাদে পুলিশ এসে সৌগতকে জেরা করল। শেষ পর্যন্ত ওঁদের ধারণা তৈরি হল মনীষার বাড়িতে যাওয়ার কারণেই সৌগতকে এইরকম আহত হতে হয়েছে। মনীষার বাড়ি থেকে বেরুবে সৌগত এটা আততায়ীদের জানা না থাকলে ওরা ওর জন্য অন্ধকারে অপেক্ষা করত না। অতএব আততায়ীদের সঙ্গে মনীষার অথবা তার স্বামীর যোগাযোগ আছে। সৌগতকে আহত করতে তারাই আততায়ীদের ওখানে অপেক্ষা করতে বলেছিল।

পুলিশ এরকম সিদ্ধান্তে আসছে বলে সৌগত তীব্র প্রতিবাদ করল। যদিও অক্সিজেন এবং স্যালাইনের নল তার শরীর থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ডাক্তার তাকে

শুয়ে থাকতে বলেছেন। সে ওঠার চেষ্টা করতেই নার্স তাকে বাধা দিল, 'উঠবেন না। প্লিজ।'

হাল ছেড়ে দিয়ে সৌগত বলল, 'আপনারা বিরাট ভুল করছেন। মনীষা আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে কোনো লেনদেনের সম্পর্ক নেই। ও কখনও আমার ক্ষতি করতে ভাড়াটে গুন্ডা লাগাতে পারে না।'

একজন অফিসার বললেন, 'ওঁর স্বামী? ওঁরা তো একসঙ্গে থাকেন না। ভদ্রলোক প্রচণ্ড পান করেন। খুব রগচটা। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। আপনি যতই বন্ধু হোন না কেন হয়তো উনি আপনাকে সন্দেহ করেন। হয়তো ঈর্ষায় আপনাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। থানায় নিয়ে গিয়ে একটু রগড়ালেই সত্যি কথা বেরুবে।'

'না। অর্জুন যাই হোক, আমার সঙ্গে এরকম করতে পারে না।'

'আপনি যে মনীমাদেবীর বাড়িতে যাবেন তা অর্জুনবাবু জানতেন?'

'হ্যাঁ। মনীষা তাকে জানিয়ে রেখেছিল।'

'ব্যস। সমস্যা স্বাভাবিক হয়ে গেল। আগাম খবরটা পেয়ে উনি কাজটা করাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়ে গিয়েছিলেন।' অফিসারকে উৎফুল্ল দেখাল।

'আমি বিশ্বাস করি না।' জোর দিয়ে বলল সৌগত।'

'বেশ তাহলে বলুন কে আপনার ওপর আক্রোশ মেটাতে চেয়েছে?

'আমি জানি না।'

'আপনি তো আততায়ীদের কাউকে চিনতেও পারেননি?'

'না।'

'যে কোনো ঘটনার পেছনে একটা কারণ থাকে সৌগতবাবু।'

'আমার মনে হয় ওরা ভুল করেছে। অন্ধকারে অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে। এবং এটাই সত্যি।' সৌগত কথাগুলো বলতে বলতে দেখল দরজায় অর্জুন এসে দাঁড়িয়েছে।'

কয়েক পা এগিয়ে এসে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ এখন?'

'অনেকটা ভালো।' সৌগত বলল।

'আমি আগে একদিন এসেছিলাম তখন দেখা করতে দেয়নি। আমি ভাবতেই পারছি না কেউ তোমাকে এভাবে আঘাত করতে পারে।' অর্জুন বলল।

'ঈর্ষা, মশাই ঈর্ষা মানুষকে কোথায় ঠেলতে পারে চিন্তাও করতে পারবেন না। আমি এরকম ঘটনা অনেক দেখেছি।' সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ অফিসার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লেন।

'ঈর্ষা? ঠিক বুঝতে পারলাম না।' অর্জুন বলল।

সৌগতকে জিজ্ঞাসা করলেন পুলিশ অফিসার, 'ইনি আপনার বন্ধু?'

মাথা নেড়ে সৌগত হ্যাঁ বলল।

'তাহলে ওঁকে বলা যায়। সৌগতবাবু এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন—।'

'বান্ধবী নয়, বন্ধু।' বাধা দিল সৌগত।

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। আজকাল তো তাই হয়েছে। অভিনেত্রীকেও ইংরেজিতে এখন অ্যাক্টর বলা হয়। যাকগে, বন্ধু, মেয়েবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই মহিলার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক খুব খারাপ। দুজনে আলাদা থাকেন। সৌগতবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক সহ্য করতে না পেরে গুন্ডা লাগিয়ে মারতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। ওঁর কপাল ভালো তাই বেঁচে গেছেন।' অফিসার বললেন।

অবাক হয়ে শুনছিল অর্জুন। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

পুলিশ অফিসার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসির কি হল?'

'টু প্লাস টু চার হয় এটা একটি শিশুও বলতে পারবে, তার জন্য আপনাদের মতো মানুষকে মাথা ঘামাতে হবে কেন?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন।

'সৌগতকে হাসপাতাল নিয়ে গিয়েছিল কে?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

'একজন এস আই ওঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে পাঠায় বলে জানা গেছে।' অফিসার বললেন।

'কোত্থেকে জানলেন?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'সেই এস আই-কে জিজ্ঞাসা করেছেন?'

'না। কারণ তাঁর নাম জানতে পারিনি।'

'কেন! ঘটনাটা যেখান ঘটেছে সেখানে নিশ্চয়ই অন্য থানার এস আই রাত্রে বেড়াতে যাবেন না। লোক্যাল থানার এস আইদের জিজ্ঞাসা করলেই তো জানা যেত কে কাজটা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিশ্চয়ই থানাকে জানিয়েছেন ঘটনাটা।' অর্জুন বলল।

অফিসারকে চিন্তিত দেখাল, 'এটা সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার। কোনো এস আই থানায় কিছু জানায়নি। হাসপাতাল থেকেই জানিয়েছিল।'

' হাসপাতালে যাওয়ার পরপরই বিল্টুও দত্ত সেখানে হাজির হয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিল। তাঁকে খবরটা কে দিল।'

অফিসার বললেন, 'হয় হাসপাতাল থেকে নয় সৌগতবাবুর বাড়ি থেকে?'

সৌগত কথা বলল, 'আমার দাদা খবর পাওয়ামাত্র বউদিকে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন। কাউকে খবর দেননি।'

'তাহলে হাসপাতাল থেকে বিল্টুবাবু খবর দেওয়া হয়েছিল।'

অর্জুন হাসল, 'কেন? সৌগতর সাথে তো ওর যতদূর জানি কোনো সম্পর্ক নেই। কি সৌগত?'

'চিনিই না ভদ্রলোককে।'

'তাছাড়া ওর টেলিফোন নাম্বার কোত্থেকে পেল হাসপাতাল? মনীষা খবর না

হয় নার্সের মাধ্যমে পেয়েছিল। তাছাড়া বিল্টুবাবুর নম্বর যদি জানাও থাকে তাহলে সৌগতর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি করে হাসপাতাল খুঁজে বের করল? অফিসার, এগুলো নিয়ে একটু ভাবুন।' অর্জুন বলল।

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, 'দেরি হয়ে গেছে। চলি। ও হ্যাঁ, আপনার পরিচয় এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।'

সৌগত বলল, 'ও অর্জুন, মনীষার স্বামী। ওকেই সন্দেহ করছিলেন আপনি।'

'আচ্ছা।' অদ্ভুত চোখে অর্জুনকে দেখলেন অফিসার। তারপর বলতেন, 'আপনার কথাগুলো আমার মনে থাকবে। আপনার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার বলুন।'

অর্জুন বলতে ভদ্রলোক নোটবই বের করে লিখে নিলেন।

'বুঝতেই পারছেন এ ব্যাপারে তদন্ত চলবে। এখন কিছুদিন কলকাতার বাইরে যাবেন না।'

'কতদিন?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

'অন্তত দিন সাতেক।' অফিসার গম্ভীরমুখে বেরিয়ে গেলেন।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল অর্জুন, 'তোমারও কি আমাকে সন্দেহ হচ্ছে?'

হাসল সৌগত, 'না'।

'কিন্তু কে এটা করাল? তুমি তো মারাও যেতে পারতে।'

'ডাক্তার তাই বলছিল। ওই বিল্টু দত্ত না থাকলে মরে যেতাম।'

'হু ইজ দিস বিল্টু দত্ত। চেনো?'

'না ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করেননি?'

'অদ্ভুত। আচ্ছা, তুমি মনীষার বাড়িতে যাচ্ছ একথা মনীষা আর আমি জানতাম' তুমি তো নিয়ম করে রোজ একই সময়ে ওখানে যাও না। আমরা যখন কাউকে জানাইনি তখন বুঝতে হবে আততায়ীরা তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুনোর পরেই অনুসরণ করেছিল। কোথায় যাচ্ছ দেখেছে। তারপর অপেক্ষা করেছে তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত। প্রশ্ন হল তোমার সঙ্গে কে এরকম শত্রুতা করতে পারে?' অর্জুন তাকাল।

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল সৌগত।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন সৌমিত্র এবং গৌরী। সৌমিত্র কাছে এলেন, 'কেমন আছিস?'

'অনেকটা ভালো।'

'আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। যারা তোকে ছুরি মেরেছে তারা তো এখানেও আসতে পারে। যে কেউ তো উঠে আসছে। তোকে যদি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে আপত্তি করবে কিনা জানতে হবে।' সৌমিত্র বললেন।

সৌগত বলল, 'দ্যাখো ওহো, ইনি অর্জুন, মনীষা ওঁর স্ত্রী। আমার দাদা।'

'ও।' ওরা দুজন নমস্কার জানাল।

সৌমিত্র বললেন, 'সব শুনেছেন তো।'

'হ্যাঁ। আচ্ছা ওই বিল্টু দত্ত লোকটা কে?'

'যতদূর জানি, বড় ব্যবসায়ী, পলিটিক্যাল দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো।'

'ইনি অতরাত্রে কি করে খবর পেলেন?'

'জানি না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছেন খবর ঠিক পেয়ে যাই।'

'লোকটি কেমন?'

'স্পষ্ট জানি না।

নার্স এসে জানাল এবার ওদের যেতে হবে। সময় হয়ে গেছে।

শনিবার সকালে বন্ড লিখে বাড়িতে নিয়ে আসা হল সৌগতকে। এখন একদম শুয়ে থাকা। স্টিচ না কাটা পর্যন্ত হাঁটা চলা নয়। পুলিশ সেই এস আই-এর খোঁজ পায়নি। কেউ গ্রেফতার হয়নি। সৌমিত্র লক্ষ্য করেছেন, সৌগতর ঘটনাটা কোনো কাগজে ছাপা হয়নি। সকালে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় মনীষা ছিল। বাড়িতেও এসেছিল। গৌরী তাকে বলেছেন, ইচ্ছে হলেই যেন সে চলে আসে। বেচারা খুব মনমরা হয়ে আছে। সে যদি না বাড়িতে ডাকত তাহলে সৌগতর এই অবস্থা হত না। পুলিশের আর টিকি দেখা যাচ্ছে না।

মনীষা আবার এল বিকেলবেলায়। সৌগতকে জিজ্ঞাসা করল, 'কমলদারা কি খবর পায়নি?'

'জানি না।'

'মনে হচ্ছে পায়নি। পেলে না এসে পারত না। আমি খবরটা দেব?'

'দূর! এখন তো ঠিক আছি, ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি?'

'অর্জুন ফোন করেছিল।'

'কি বলল?'

'তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করল। ওর পরিচিতি একটা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সি আছে। ও বলছে তোমার আপত্তি না থাকলে তাদের দায়িত্ব দিতে পারে কারা অথবা কে কাজটা করেছে তা খুঁজে বের করতে।'

'তোমার কি মনে হয়?' সৌগত তাকাল মনীষার দিকে।

'এরকম অপরাধ যে করেছে তার ধরা পড়া উচিত।' মনীষা বলল।

'দাদার সঙ্গে কথা বলি—।'

এই সময় রমা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। মনীষা চেয়ারে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল, 'আসুন মাসিমা। আপনার ছেলের মুখের চেহারা অনেকটা নর্মাল হয়ে আসছে।''

'ভালো।' রমা ছেলেকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এভাবে ওকে কতদিন থাকতে হবে?'

'আরও দিন সাতেক। তারপরেও তিন সপ্তাহ বাড়ি থেকে বেরুতে পারবেন না।'

'ও পারবে?'

'মানে?'

'বড় হওয়ার পর থেকে শুধু খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া ওকে এ বাড়িতে দেখতে পাইনি। তাহলে বলছ একমাস ওকে সবসময় দেখতে পাব।' রমা বললেন।

নীপা এসে দাঁড়াল ঠাকুমার পাশে, 'একেই বলে শাপে বর।'

বালিশে মাথা ঘোরালো সৌগত, 'তার মানে?'

'তোমার পেটে ছুরি ঢুকেছিল বলেই তো ঠাকুমা তোমাকে একমাস ধরে সবসময় দেখতে পাবে। কেমন আছেন আপনি?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

মনীষা হাসল, 'ভালো।'

ফোন বাজছিল। দোতলার রিসিভার তুলতে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সেটা চুপ করে গেল। অর্থাৎ নীচে কেউ ধরেছে। তবু কৌতূহল হল নীপার।' নিঃশব্দে রিসিভার তুলতেই মায়ের গলা কানে এল, 'হ্যালো?'

'নমস্কার নমস্কার ভালো আছেন তো ম্যাডাম?' আবেগ ধরা গলা।

'কে কথা বলছেন?' মায়ের প্রশ্ন।

'ওহো! আমার গলা টেলিফোনে চিনবেন কি করে? আমি বিল্টু দত্ত।'

'বিল্টু!"

'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? ওই যে আপনার দেওর যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সেই রাত্রে দেখা হয়েছিল—।'

'ও হ্যাঁ!' মায়ের গলা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রাণ হয়ে গেল?

'দেওরকে বন্ড লিখে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। ভালোই করেছেন। এখন কেমন আছেন উনি?' বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।'

'ভালো।'

'বাঃ। খুব সুখবর।'

'আপনি কি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?'

'না না। ওঁকে ব্যস্ত করব না। কাজের মানুষ। আপনার সঙ্গেই কথা বলছি। দেখুন ম্যাডাম, আপনি যেমন মা তেমনি আমিও বাবা, ছেলেমেয়েরা যতই অন্যায় করুক বাবা-মা কখনই চাইবে না তাদের জীবন বরবাদ করে দিতে। বরং চেষ্টা করবে তাদের সংশোধন করতে। হ্যাঁ কি না, বলুন?' বিল্টু দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন। গৌরীর উত্তর না পেয়েও বিন্দুমাত্র দমলেন না, 'আপনি ভাববেন না আমার ছেলেকে আমি এরপরে শাসনের মধ্যে রাখব না। নিশ্চয়ই রাখব। মুশকিল হল আগামীকাল কোর্টে ওর উকিল জামিনের আবেদন করবে। যদি আপনাদের বা পুলিশের উকিল তার বিরোধিতা করে তাহলে কোর্ট ওর জামিন দেবে না। ম্যাডাম, যত চোর-ছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে ওকে হাজতে রেখেছে, আর কিছুদিন থাকলে ওরাই ওর বারোটা বাজিয়ে দেবে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, সৌমিত্রবাবুকে বলুন জামিনের বিরোধিতা না করতে। তাতে কেস তো মিটছে না, ওকে একটু সংশোধনের সুযোগ দেওয়া যাবে।'

গৌরী বললেন, 'আমি এসব ব্যাপার কিছুই বুঝি না। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।'

'বলব, বলব। অবশ্যই বলব। কিন্তু আপনার ওপর নির্ভর করে আছি ম্যাডাম।'

রিসিভারটা রেখে স্বামীর খোঁজ করতে ওঁকে চেম্বারে পেলেন গৌরী. 'শোনো বিল্টু দত্ত ফোন করছে।'

'কি বলছে?'

'বলছে কাল যেন আমরা ওর ছেলের জামিনের বিরোধিতা না করি।'

'ইম্পসিব্‌ল।'

'রিসিভার তোলো। এখনও লাইনে আছে।"

রিসিভার তুলে সৌমিত্র বললেন, 'নমস্কার বিল্টু বাবু—।'

'নমস্কার নমস্কার।'

'ফোন করে ভালোই করেছেন। আজ ওর ট্রিটমেন্টের যা খরচ হয়েছিল তার হিসেব পেয়েছি। আপনাকে কোন্ ঠিকানায় চেক পাঠাব যদি বলেন!'

'কেন?'

'বাঃ আপনিই তো সমস্ত খরচ মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই টাকাটা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

'আরে না না। যা মিটে গেছে তা নিয়ে কথা তুলব না।'

'কি বলছেন আপনি। এত হাজার টাকা একজন অচেনা মানুষের কাছ থেকে নেব কোন যুক্তিতে।' সৌমিত্র রেগে গেলেন।

'দেখুন সৌমিত্রবাবু, আমি আপনার ভাই-এর প্রাণ বাঁচিয়েছি আপনি আমার ছেলের কথা ভাবুন। ব্যস, এর মধ্যে কোনো টাকা-পয়সা নেই।"

'আপনার ছেলের কথা আমি ভাবব?' অবাক হলেন সৌমিত্র।

'হ্যাঁ। কাল জামিনের ব্যাপারে আপত্তি করবেন না।'

'অসম্ভব। আপনার ছেলে যা করেছে তাতে চার্জশিট না দেওয়া পর্যন্ত ওকে কাস্টডিতে থাকতেই হবে।'

'হবে না। আপনি যদি কাল কোর্টে না যান তাহলে ওর জামিন হয়ে যাবে। পুলিশ আপত্তি করার মতো কিছু খুঁজে পাবে না।' বিল্টু দত্ত হাসল।

'হাস্যকর কথা বলছেন। আপনার ছেলের বন্ধুরা যে স্টেটমেন্ট পুলিশের কাছে দিয়েছে সেটা প্রোডিউস করলে কোর্ট কখনই জামিন দেবে না।' সৌমিত্র বললেন।

'আপনার কাছে এখন যেটা হাস্যকর শোনাল কাল সেটাই ঘটবে। ওই স্টেটমেন্টের কথা পুলিশ বেমালুম ভুলে যাবে। সৌমিত্রবাবু, আপনার কাছে আমি অনুরোধ করছি। ছেলেটাকে সংশোধনের সুযোগ দিন। আপনি যদি ওর জামিনে বাধা দেন তাহলে আমি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারব না। এখন পর্যন্ত আপনার মেয়েকে আমি বিব্রত করিনি। কিন্তু দেখলেন তো। মানুষ কত অসহায়। আপনার ভাই বান্ধবীর বাড়ি থেকে

বেরিয়ে অসহায়ভাবেই ছুরি খেল। আমি চাইনি উনি মারা যান তাই মারেননি। ওঁকে বাঁচাবার ব্যাপারে আমার চেষ্টা ছিল একথা ডাক্তারও আপনাকে বলেছে। ভেবে দেখুন, কি করবেন।' লাইন কেটে দিল বিল্টু দত্ত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সৌমিত্র। তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। তাহলে সৌগতকে ছুরি মেরেছে বিল্টু দত্তের লোক? ওকে অনুসরণ করে মনীষার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করেছে বিল্টুর। আবার রাস্তা থেকে তুলে ওরাই হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এসব করেছে সে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যে!

আজ নীপার প্রসঙ্গ তুলে চেপে গেল। ইঙ্গিত পরিষ্কার।

সৌমিত্র ভেতরে এলেন। দোতলায় উঠে দেখলেন নীপা আর গৌরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হবে?'

'সব শুনেছ?'

'হুঁ।'

'আজ পর্যন্ত কখনও অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাইনি, নীপার কথা ভেবে আজ—!' কথা শেষ করলেন না সৌমিত্র।'

'একদম নয় বাবা। তুমি কোর্টে যাবে কাল।'

এইসময় মধু এসে জানাল এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।'

বিরক্ত হলেন সৌমিত্র। বললেন, 'ফোন করে আসতে বল।'

'বললেন খুব জরুরি। মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।'

'সৌগতর সঙ্গে? কি চায়?'

এতক্ষণে হাতে ধরা কার্ড এগিয়ে দিল মধু। সৌমিত্র পড়লেন, প্রকাশ দত্ত, এ টি এল ডিটেকটিভ এজেন্সি।'

সৌগতর ঘরে ঢুকে দেখলেন মা এবং মনীষা সৌগতর পাশে বসে আছে। সৌমিত্র বললেন, 'প্রকাশ দত্ত নামে একজন ডিটেকটিভ তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কথা বলবি?'

'ডিটেকটিভ?' অবাক হল গৌগত। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মুখ মনে হল। সে এজেন্সির কথা বলছিল।

সৌগত বলল, 'আসতে বল।'

মধুকে সেই নির্দেশ দিয়ে সৌমিত্র বললেন, 'বিল্টু দত্ত ফোন করেছিল।'

সৌগত তাকাল, 'কেন?'

'কাল যেন কোর্টে ওর ছেলের জামিনের বিরোধিতা না করি। পুলিশকে উনি ম্যানেজ করে নিয়েছেন।'

'সেকি! তুমি কি বললে?' সৌগত উত্তেজিত।

'আমি শুনলাম। কিছু বলিনি।' সৌমিত্র বললেন।

'সেকি? তুমি প্রতিবাদ করলে না?' সৌগত অবাক হয়ে গেল।

'কিছু না বলা মানে এই নয় বিল্টু দত্তর প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমাকে ভাবতে হচ্ছে। বিল্টু দত্তর হাত যেরকম লম্বা দেখছি তাতে ওর সঙ্গে লড়াই শুধু আদালতের ভেতর করলেই হবে না, আদালতের বাইরেও করতে হবে। লোক লাগিয়ে তোকে অনুসরণ করিয়ে যে ছুরি চালাতে পারে, সেখানেই থেমে না গিয়ে পুলিশকে দিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যেতে পারে সে পারে না এমন কাজ নেই।' সৌমিত্র বললেন।

'কিন্তু আমাকে ছুরি মারিয়ে ওর কি লাভ হল?'

'ওর ক্ষমতা কতখানি তা বুঝিয়ে দিল।'

মধু যে লোকটিকে নিয়ে এল তাকে আদৌ ডিটেকটিভ বলে মনে হল না নীপার। শার্লক হোমস দূরের কথা, ফেলুদার ধারে কাছে যায় না প্রকাশ দত্তর হাবভাব। দরজার দাঁড়িয়ে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে যখন নমস্কার বললেন তখন তাঁর সরু কণ্ঠস্বর শুনে বেশ মজাই পেল নীপা।

'নমস্কার। বলুন?' সৌমিত্র তাকালেন।

'আমি প্রকাশ দত্ত। উনি সৌগতবাবু?'

'হ্যাঁ।' সৌমিত্র বললেন। কিন্তু আমরা তো কোন ডিটেকটিভের সাহায্য চাইনি। আপনার আমার উদ্দেশ্যটা যদি বলেন।'

'নিশ্চয়ই। অর্জুনবাবু আমাকে নিয়োগ করেছেন। তাঁর ধারণা সৌগতবাবুকে পরিকল্পিতভাবে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার দায়িত্ব কে কাজটা করেছিল, কেন কিভাবে করেছিল তা খুঁজে বের করা।' প্রকাশ দত্ত নাকিসুরে কথাগুলো বলে গেলেন।

সৌমিত্র ভাই-এর দিকে তাকালেন, 'তুই কি এটা চাইছিস?'

'নিশ্চয়ই। আমরা ভাসা ভাসা অনুমান করছি। কোনো প্রমাণ নেই।'

'অবশ্যই। অনুমান মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সঠিক প্রমাণ ছাড়া আমরা কাউকে অপরাধী বলতে পারি না। এই প্রমাণ সংগ্রহ করতে আপনারা চাইছেন?' প্রকাশ দত্ত একটু এগিয়ে এলেন।

'হ্যাঁ।'

নীপা একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে তাতে আরাম করে বসলেন প্রকাশ দত্ত, 'আপনাদের এই বাড়িটি বেশ বনেদি। আপনার আগে এই বংশের কেউ কাউকে খুন করেছেন বা কাউকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে?'

'না।' সৌগত বিরক্ত হল।

'অর্জুনবাবু মোটামুটি ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছেন। অর্জুনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী মনীষা দেবী আলাদা থাকেন। সম্পর্ক মধুর না। এই মনীষাদেবীর কাছে আপনি যেতেন, ঠিক কিনা?' চোখ ছোট করলেন প্রকাশ দত্ত।

'মনীষা আমার বন্ধু, মাঝ মাঝে যেতাম।'

'অর্জুনবাবুর কাছে যেতেন না?'
'না। সে যোগাযোগ রাখেনি।'
'ঘটনার রাত্রে মনীষাদেবী আপনাকে যেতে বলেছিলেন না আপনি নিজে থেকে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন?'
'একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে ও আমাকে ডেকেছিল।'
'সেখানে অর্জুনও পৌঁছে গিয়েছিলেন।'
'হ্যাঁ।'
'মনীষাদেবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় অর্জুনবাবু আগে বেরিয়ে যান। তাইতো? বেশ। তাহলে দুজন লোক জানত আপনি ওই বাড়িতে ছিলেন। এক মনীষাদেবী, দুই অর্জুনবাবু। আর কেউ?'
'না।' মাথা নাড়ল সৌগত।
'গুড। মনীষা দেবী আপনার বাড়িতে ডেকে গুন্ডা দিয়ে ছুরি মারাবেন কেন? কি স্বার্থ তাঁর? বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে তো? তার চেয়ে মনীষাদেবীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব দেখে রেগে গিয়ে অর্জুনবাবু ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে কাজটা করাতে পারেন। তাহলে তাঁকে ও বাড়িতে যাওয়ার আগেই জানতে হবে আপনি ওখানে যাচ্ছেন। নইলে গুন্ডাদের অর্গানাইজ করার সময় তিনি পাবেন না। অর্জুনবাবু কি আগেই জানতেন?'
'জানত। মনীষা তাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল।'
'তাহলে তো অর্জুনবাবুকে অপরাধী বলতে হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠছে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে নিয়োগ করলেন কেন?'
নীপা না বলে পারল না, 'ডিটেকটিভ উপন্যাসে এরকম প্রায়ই হয়।'
নীপার দিকে তাকালেন প্রকাশ দত্ত, 'ঠিক বলেছ মা। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে যার জন্যে অর্জুনবাবুকে অপরাধী ভাবতে পারছি না। ভাড়াটে গুন্ডারা ছুরি মেরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এক্ষত্রে তারা আহত সৌগতবাবুকে তুলে নিয়ে যায় হাসপাতালে, একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। ওকে বাঁচানোর চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। তাই তো?'
সৌমিত্র বললেন, 'হ্যাঁ।'
'যেকোনো স্বাস্থ্যবান মানুষ ইউনিফর্ম পরে রাতের বেলায় যদি হাসপাতালে ঢোকে তাহলে তাকে পুলিশ বলেই সেখানকার কর্মীরা মনে করবে। তাই মনে করেছিল। লোকাল থানার কোনো অফিসার ঘটনাটা রিপোর্ট করেনি। এই কথাতেই অর্জুনবাবুকে আর সন্দেহ করা যাচ্ছে না। তাহলে কে তিনি? হাসপাতালে আপনারা খবর পেয়েই গিয়েছিলেন?'
'নিশ্চয়ই।' সৌমিত্র জবাব দিল।
'গিয়ে কি দেখেছিলেন?'
'ওর তখনই অপারেশন করা দরকার কিন্তু অ্যানাসথেসিস্ট নেই। ওকে সঙ্গে সঙ্গে

অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো হয়। আর দেরি হলে প্রাণ সংশয় হত।' সৌমিত্র বললেন।

'এসব ব্যবস্থা আপনি করলেন?'

'না।'

'কে করল?'

'বিল্টু দত্ত।'

'আপনার আত্মীয় অথবা পরিচিতি?'

'না।'

'সেকি! তাহলে তিনি কেন এসব করতে গেলেন?'

'আমি জানি না। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উত্তর দেননি।'

'খোঁজ নিয়েছি। তিনি হাসপাতালের বিলও আপনাদের পে করতে দেননি।'

'ঠিক। একারণে আমি খুব অস্বস্তিতে আছি।' সৌমিত্র বলল।

'সৌগতবাবু। যখন ছুরি মারা হচ্ছিল তখন কি আপনি ওদের মুখ দেখেছেন?'

'না।'

'কেন? ছুরি মারতে হলে শরীরের কাছে আসতে হয়। আপনি কি বেশি মাত্রায় পান করে ছিলেন যে দৃষ্টিশক্তি অস্বচ্ছ হয়ে ছিল? মনে করে দেখুন!' নির্লিপ্তমুখে প্রশ্ন করলেন প্রকাশ দত্ত।

সৌগত আড়চোখে দাদার দিকে তাকালেন। সে মদ্যপান করে একথা বাড়ির সবাই জানে এবং এও জানে কখনও মাতাল হয়নি। তবু ওঁদের সামনে প্রশ্নটা শুনতে তার ভালো লাগল না। সে জবাব দিল, 'আমি স্বাভাবিক ছিলাম।'

'তাহলে তো আপনার লোকটাকে দেখা উচিত ছিল।'

'জায়গাটা অন্ধকার ছিল।'

'তা তো থাকবেই, নইলে চান্স নেবে কেন?' মাথা নাড়লেন প্রকাশ দত্ত।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন, এবার না বলে পারলেন না সৌমিত্র, 'আপনাকে জানানো দরকার যে কাজটা করিয়েছে সে আমাদের ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্যেই করিয়েছে। আপনি কোনো প্রমাণ খুঁজে পাবেন না এ ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করার।'

'আপনি একসাথে একতলা থেকে চারতলা উঠে গেলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। কিন্তু প্রমাণ নেই বললে তো চলবে না। একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেটা মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় যখন তখন নিশ্চয়ই তার সত্যতা প্রমাণ করা যাবে। হ্যাঁ, যিনি সৌগতবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন, প্রয়োজনে হাসপাতাল পরিবর্তন করিয়েছেন, সমস্ত বিল মিটিয়ে দিয়েছেন তিনি আপনাদের কি ওয়ার্নিং দিয়েছেন জানতে পারি?' প্রকাশ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি খবরের কাগজে একটা ঘটনার কথা কয়েকদিন আগে পড়েছেন? বড়লোকের ল্যাম্পেন ছেলেরা তিনজন ছেলেমেয়ের ওপর—।'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি আমার কন্যা। ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রকাশ দত্ত ঘুরে বসলেন, 'বাঃ। খুব ভালো। ক্যারাটে জানো?'

'না।' নীপা মাথা নাড়ল।

'শিখে ফ্যালো। খুব কাজে দেবে।' প্রকাশ দত্ত বললেন।

'ওই গ্রেফতার হওয়া ছেলেদের একজনের বাবা খুব ক্ষমতাবান। যখন যা ইচ্ছে করাতে পারেন। তিনি চাইছেন আমরা যেন মামলা থেকে সরে আসি। আমি রাজি হইনি বলে আমার ভাই-এর ওপর এই আক্রমণ যাতে আমরা বুঝতে পারি রাজি না হলে আরও কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে।' একনাগাড়ে বলে গেলেন সৌমিত্র।

হাসলেন প্রকাশ দত্ত, 'আচ্ছা, আপনাদের কে পরামর্শ দিয়েছে জামিনের বিরোধিতা করতে?'

নীপা চেঁচিয়ে উঠল, 'কি বলছেন আপনি?'

'যেকোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা করার উচিত তাই বলছি। ধরো, তোমরা রাজি হলে না এবং ও জামিন পেল না। কিন্তু কতদিন? বড়জোর দুসপ্তাহ। এই অপরাধে দীর্ঘকাল জেলে আটকে রাখার বিধান আইনে নেই। আর ধরো ওর শাস্তির কথা। কোন উকিলের পক্ষে নির্জন জায়গায় কি ঘটেছিল তার বর্ণনা যেমন বানিয়ে বলতে অসুবিধে হবে না তেমনি প্রতিপক্ষের উকিলও কম যাবে না। তাই শেষ পর্যন্ত বয়স বিচার করে একটা জরিমানা দিয়ে বিচারক ছেড়ে দেবেন। তাতে তোমাদের কি লাভ হবে? কিস্যু না। বদলে এই শহরে দুটো লোককে সব সময় শত্রু করে রেখে দেবে। মনের ওপর সেই চাপ তো একধরনের শাস্তি।'

'তাই বলে ওরকম জঘন্য অপরাধীর শাস্তি হবে না?'

'হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে কোথায়? এই যে কত নিরাপরাধ মানুষ প্রতিদিন উগ্রপন্থীদের ছোঁড়া বোমায় মারা যাচ্ছে। কেউ শাস্তি পাচ্ছে? কজন?' মাথা নাড়লেন প্রকাশ দত্ত, 'কিন্তু ওটা আমার এক্তিয়ারে পড়ে না। সৌগতবাবুর ওপর কে ছুরি মারিয়েছে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব অর্জুনবাবু আমাকে দিয়েছেন। প্রমাণ সহযোগে সেটা আমাকে খুঁজতে হবে। আচ্ছা আমি উঠব। মনীষা দেবীর বাড়িতে যেতে হবে।'

'কেন?' সৌগত প্রশ্ন করল।

'আহত হওয়ার আগে সুস্থ অবস্থায় তিনি আপনাকে শেষবার দেখেছেন। অতএব তাঁর কথা শোনা খুব দরকার।'

গৌরী এতক্ষণ একমনে লোকটার কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মামলায় না জড়ানোর ব্যাপারটা এখন তাঁর কাছে ভেবে দেখার বিষয় বলে মনে হচ্ছে তিনি বললেন, 'আপনাকে কষ্ট করে ওর বাড়িতে যেতে হবে না। মনীষা এইখানেই রয়েছে।'

'ও। দেখতে এসেছেন বুঝি বন্ধুকে। তার মানে উনি সুখের পায়রা নন, দুঃখেরও সঙ্গী। আপনি তো?' মনীষার দিকে তাকালেন প্রকাশ দত্ত।

মনীষা বসেছিল চুপচাপ। স্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আমিই মনীষা।'

'আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?' প্রকাশ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।'

'অর্জুনবাবুকে?'

'সৌগতকে লোক দিয়ে আহত করার কোনো প্রয়োজন তো ওর নেই।'

'এমন তো হতে পারে আপনার সঙ্গে সৌগতবাবু সম্পর্ক নিয়ে ওঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। তাই সহ্য করতে না পেরে—।'

'দূর।' হাসল মনীষা শব্দ করে।

'বুঝতে পারলাম না।' প্রকাশ দত্ত মাথা নাড়ল।

'আমার যদি কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে অর্জুনের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। একই কথা আমিও ওর সম্পর্কে বলতে পারি।'

'তাহলে সেরকম ঘটনা ঘটছে না কেন?'

'জোর করে ঘটানো যায় না, তাই ঘটছে না।'

'যে জায়গায় সৌগতবাবু আহত হয়ে পড়েছিলেন সেটা আপনার বাড়ি থেকে কতদূরে?'

'পরে যা শুনেছি তাতে মনে হয় মিনিট আটেকের পথ।'

'কোনো চিৎকার শুনেছেন?'

'না।'

'আচ্ছা একটা লোক পেটে ছুরি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল অথচ আর্তনাদ করবে না এটা কি স্বাভাবিক? কিন্তু কেউ নাকি আর্তনাদ শোনে নি। ঠিক আছে। আজ উঠি। যতক্ষণ না সুরাহা হচ্ছে ততক্ষণ চিন্তায় থাকব। দরকার পড়লে বিরক্ত করব, দরজার দিকে এগোলেন প্রকাশ দত্ত। শেষ পা ঘরের বাইরে রেখে বললেন, 'একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি আপসেই নিভে যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কিন্তু তার শিখায় আঙুল রাখলে ফোসকা পড়তে বাধ্য। তাই না সৌমিত্রবাবু?'

সৌমিত্র অবাক হয়ে তাকালেন। মধু প্রকাশ দত্তকে পৌঁছে দিয়ে এল বাড়ির বাইরে।

দুপুরের আগেই ওরা এসে গেল। নীপার তিন পিসি, দুই পিসেমশাই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনেনি ওরা। বোঝাই গেল কোথাও একত্রিত হয়ে ওরা এ বাড়িতে এসেছে। গৌরী বললেন, 'তোমাদের দেরি দেখে ভাবছিলাম ফোন করব কিনা।'

বড়বোন বলল, 'নীপা কোথায়?'

'ওর কাকার ঘরে। গল্প করছে।'

তিনজনেই থমথমে মুখ করে তাকাল। মেজবোন জিজ্ঞাসা করল 'মেজদা এসময় বাড়িতে? শরীর খারাপ নাকি?'

ঠিক তখনই খেয়াল হল। সৌগতর আহত হওয়ার খবরটা এ বাড়ির বাইরের

কাউকে দেওয়া হয়নি। অবশ্যই ইচ্ছে করে নয়, সমস্ত ব্যাপারটা এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে খবর দেওয়ার কথা মাথায় আসেনি।

'না। শরীর--।' গৌরী কথা শেষ করার আগে রমা এসে দাঁড়ালেন।, 'ও, তোরা এসেছিস! যা, সবাই, একসঙ্গে থাকলে ভরসা বাড়ে।'

ছোটবোন বলে এল মায়ের পাশে, 'কেমন আছ মা?'

'আমি ভালো আছি। এখন বেশ কদিন মেজকে চোখের সামনে সবসময় দেখতে পাব। ডাক্তার বলে দিয়েছে ওকে বিশ্রাম নিতে। ও তো ঘুমোনো ছাড়া বাড়িতে থাকত না।'

'ডাক্তার?' বড়বোন কথাটা ধরতে পারল না, 'ডাক্তার কেন?'

'ওরে বাবা! এত বড় ছুরি ওর পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কপালে মরণ নেই তাই বেঁচে গেছে। বউমা আর বড়খোকা তো সেই থেকে হাসপাতালে পড়েছিল।'

তিনজনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটকে এল। এক পিসেমশাই গম্ভীর গলায় বললেন, 'এরকম মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল অথচ আমাদের জানানোর প্রয়োজন বলে মনে করলেন না?'

রমা বললেন, 'জানালে কি করতে বাবা? কাজকর্ম সংসার ফেলে ছুটে এসেও তো কোন লাভ হত না। ডাক্তার যা করার করেছে, বড়খোকা শুধু টাকার যোগান দিয়ে গিয়েছে।'

গৌরী মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'না মা, ওঁকে টাকা দিতে হয়নি।'

মেজবোন কাঁধ ঝাঁকালো। 'দাদাকে কে ছুরি মারল?'

'অন্ধকারে ঘটনাটা ঘটেছিল। ধরা পড়েনি।' গৌরী বললেন।

'এমনি এমনি তো ছুরি মারবে না। কি হয়েছিল বলতো?'

গৌরী বললেন, 'পুলিশ এখনও কারণটা ধরতে পারেনি।'

বড়বোন জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি বলছে?'

'ঠাকুরপো চিনতে পারেনি।'

মেজবোন বলল, 'সর্বনাশের কাণ্ড। নীপা গুন্ডা ঠেঙিয়ে কাগজে নাম তুলতেই ওর কাকা ছুরি খেল। তুমি কি নীপাকে বাইরে যেতে দিচ্ছ?'

'এখন পর্যন্ত যায়নি।'

'দিয়ো না। কাকার পেটে ছুরি মেরেছে, ভাইঝিকে পেলে বুকে গুলি ঢুকিয়ে দেবে। এই জন্যেই বলে মেয়েদের পা বড় হওয়া ঠিক নয়।'

এইসময় মনীষাকে নিয়ে নীপা সৌগতর ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। পিসিদের দেখে নীপা উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কখন এলে?'

দুই পিসি চুপ করে ওকে দেখল, শুধু ছোটপিসি বলল, 'এই তো, একটু আগে।'

নীপা একবার মনীষার দিকে তাকাল, চট করে ভেবে নিয়ে 'আসছি' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মনীষার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিল না।

সিঁড়ি ভেঙে যেতে নীপা বলল, 'ওরা আমার পিসি। তোমার সঙ্গে ইচ্ছে করেই আলাপ করিয়ে দিলাম না।'

'বেশ করেছ। চলি!'

'আবার কখন আসছ?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'আসব। এখন তো সৌগত অনেকটা ভালো। তাছাড়া বাড়িতে তোমাদের চোখের সামনে থাকবে। আচ্ছা—।' মনীষা চলে গেল।

ওপরে উঠে নীপার মনে হল যেন শোকসভা চলছে। প্রত্যেকের মুখ খুব গম্ভীর। বড়বোন তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'রাজারহাটে যাওয়ার কি দরজার ছিল? ওরকম নির্জন জায়গায় ছেলেরাই ছিনতাই-এর ভয়ে যেতে যায় না আর তুমি ড্যাঙডেঙিয়ে দুই বন্ধুর সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলে। যদি কিছু হয়ে যেত?'

'কিছু তো হয়েইছে।' নীপা হাসল।

'হয়েছে মানে?' সোজা হয়ে বসে চিৎকার করল মেজবোন।

'সবাই জানতে পেরেছে মেয়েরাও ইচ্ছে করলে প্রতিবাদ করতে পারে। এরপরে বদমায়েশ ছেলেরা মেয়েদের ওপর হামলা করার আগে দুবার ভাববে। মেয়েদেরও ভয় কেটে যাবে এই ঘটনা থেকে।' নীপা বলল।

'বাঃ। চমৎকার।' মেজবোন বলল, 'তোমাকে সমাজ-সংস্কার করার দায়িত্ব কে দিয়েছে? বউদি, তোমরা এসব অ্যালাউ করছ? ওইসব গুন্ডা বদমাশরা যে কি করতে পারে তার কোনো ধারণা আছে?' মেজবোন গৌরীর দিকে তাকাল।

হঠাৎ নীপা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি মা।'

বড়বোন তড়বড়িয়ে উঠল, 'কী! বেরুচ্ছিস মানে? তোর এত সাহস বেড়ে গেছে?'

গৌরী মেয়ের কথায় অবাক হয়েছিলেন। বললেন, 'কি দরকার?'

নীপা মাথা নাড়ল, 'কিছু না।' তারপর নিজের ঘরে চলে গেল। ছোটবোন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'নীপার সঙ্গে নিচে যে নেমে গেল সে কে বউদি?'

'মনীষা।'

'আগে তো কখনও দেখিনি।'

'মেজদাকে দেখতে এসেছিল।' গৌরী বললেন।

বড়বোন বলল, 'মেয়েটাকে তো ম্যারেড বলে মনে হল।'

গৌরী বললেন, 'ওরা স্বামী-স্ত্রী মেজদার বন্ধু।'

'ও। স্বামীকে ছাড়াই স্ত্রী এল বন্ধুকে দেখতে। পারি না বাবা।' বড়বোন মুখ বেঁকালেন। ছোটবোন পা বাড়াল।

মেজবোন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মেজদাকে দেখতে।' যেতে যেতে বলল ছোটবোন।

'দাঁড়া। একসঙ্গে যাব।' ওরা উঠল।

গৌরী শাশুড়ির দিকে তাকালেন। পাথরের মতো বসে আছেন। এসব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না।

সন্ধেবেলায় সৌমিত্র গেলেন অনুপম চ্যাটার্জির বাড়ি। কলকাতায় ক্রিমিন্যাল কেসে ওঁর চেয়ে দক্ষ আইনজ্ঞ আর কেউ নেই। সৌমিত্রর চেয়ে বছর আটেকের বড় ভদ্রলোক। হেসে বললেন, 'দুপুরে যখন ফোন করে বললে দেখা করতে আসবে তখনও আমি জানতাম না আগামীকাল তোমার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে জুনিয়র পাঠাতে হবে।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেলেন সৌমিত্র।

'সুবোধ সেনগুপ্তকে চেন?' উকিল! সে একজনকে সঙ্গে নিয়ে এল। তার ছেলেকে পুলিশ ইভটিজিং-এর দায়ে ধরেছে। আমাকে কেস নিতে হবে। তা এইসব ফালতু কেস আমি নিই না। সময়ও নেই বলায় লোকটা কাকুতি মিনতি করতে লাগল। বলল, আমি যদি কোর্টে নাও যাই তবু নামটা থাকলেই হবে। একজন জুনিয়রকে সেনগুপ্তের সঙ্গে দিলেই চলবে। রাজি হতে হল। তারপর শুনলাম যাকে টিজ করেছিল সে তোমার মেয়ে। কাগজেও পড়েছি।' অনুপম চ্যাটার্জি বললেন।

'আপনি এই কেস নিলেন!' হতাশ গলায় বললেন সৌমিত্র।

'আমি ভাবতেই পারিনি তোমার মেয়ের ব্যাপার এটা। ওরা প্রথমে নাম ধরে বলেওনি। এইরকম পেটি কেস আমি নিই না বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু লোকটা এমন করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল এক শর্তে, আমার জুনিয়র যাবে, আমি যাব না।'

'হঠাৎ লোকটা আপনার কাছে কেন এল?'

'সেনগুপ্ত নিয়ে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। আপনি এধরনের কেস করেন না জেনেও ওরা চেয়েছে আপনাকে ব্লক করতে যাতে আপনি আমার হয়ে দাঁড়াতে না পারেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই অ্যাপ্রোচ করতে পারতাম। আজ দুপুরে ওরা কি করে জানতে পারল আমি সন্ধেবেলায় আসব? অদ্ভুত ব্যাপার।' সৌমিত্র অন্যমনস্ক হল।

'ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমরা কি চাইছ?'

'ছেলেগুলোর শাস্তি হোক।'

'প্রমাণ করতে পারবে?'

'সেটাই সমস্যা। নির্জন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছিল। আর একটা গাড়ির ড্রাইভারকে সাক্ষী হিসেবে পাওয়া যেত কিন্তু তারও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র নীপা এবং ওর বন্ধুদের কথার ওপর মামলাটাকে দাঁড় করাতে হবে।'

'ভেরি ডিফিক্যাল্ট। তোমার মেয়ের অন্য বন্ধুরা যদি সাক্ষী দিতে না আসে তাহলে তো কথাই নেই। তবে সেই মামলা কবে উঠবে কেউ বলতে পারবে না। আপাতত ওরা জামিন চাইছে, সেটা আগামীকাল পেয়েও যাবে।' অনুপম চ্যাটার্জি বললেন।

'ওরা চাইছে আমরা জামিনের বিরোধিতা যেন না করি?'

'আইনের কিছুই বোঝে না বোধহয়। কেউ আহত হয়নি, মারধর করেছে বলে অভিযোগ করা হয়নি। শুধু টিজিং-এর চার্জে এতদিন আটকে রাখা যায় না। কাল কেস উঠতেই ছাড়া পেয়ে যাবে। কোনো আপত্তি ধোপে টিকবে না।'

'সেটা আমি বুঝেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল নীপা এ ব্যাপারে মরিয়া। সে নৈতিকতার প্রশ্নে আপস করতে চাইছে না। অন্যায় করে ছেলেটাকে পার পেয়ে যেতে দেবে না সে। ফলে জামিনের বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় নেই।' সৌমিত্র বললেন।

'নৈতিকতা? আরে তার জন্যে বোধবুদ্ধি বিসর্জন দেবে নাকি? ওকে বেলো, 'কখনও কখনও দুপা এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক পা পিছিয়ে আসতে হয়।'

সৌমিত্র বাড়িতে এসে জানিয়ে দিলেন যেহেতু কোনো লাভ হবে না তাই কাল সকালে জামিনের বিরোধিতা করার জন্যে তিনি কোর্টে যাচ্ছেন না।

নীপা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালল, 'ওরা বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাই তুমি চাও?'

সৌমিত্র বললেন, 'আমি তোর মতো ওদের শাস্তি চাই। কিন্তু ওরা কাউকে খুন করেনি, টাকা পয়সা তছরুপ করেনি, বেরিয়ে এসে প্রমাণ লোপ করার কোনো সুযোগ নেই, কোর্টে গিয়ে যত বিরোধিতাই করি কোন কাজে আসবে না, উল্টে লোকজন হাসাহাসি করবে। ঠিক আছে, মূল কেস যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। তবে তার আগে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।'

দুপুরেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন ওদের জামিন হয়ে গেছে। নিজের কাজ শেষ করে বিকেলে বাড়ি ফিরেছিলেন। গতকাল বোনেরা এসেছিল, ছোট ছাড়া বাকিরা ফিরে গেছে বিকেলে। আজ সকাল পর্যন্ত গৌরী গম্ভীর ছিলেন, স্বামীকে বিরক্ত করতে চাননি। বিকেলে জামিন হয়ে যাওয়ায় খবরটা শুনে বললেন, 'আর ওরা ঝামেলা করবে না তো? সব সময় ভয়ে ভয়ে আছি।'

সৌমিত্র বললেন, 'বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম গেট থেকে পুলিশ তুলে নিয়েছে থানা। তার মানে ওরা জেনে গেছে ভয়ের কিছু নেই।'

'নীপা তো কাল থেকে কথাই বলছে না।'

'কি করব? আমার হাতে তো জামিন আটকানোর উপায় ছিল না।'

'না। সে ব্যাপারে নয়। ওর পিসিরা এসে যা তা বলে গেছে, তাই।'

'কি বলেছে? কেন ওখানে গেলি? কি দরকার ছিল থানায় গিয়ে মুখ খোলার। টিভি কাগজকে ফলাও করে বলে নিজের বারোটা কেন বাজালি? এই তো?'

'ওইরকম।'

'গায়ে মাখতে মানা করো।'

'বলেছি। কিন্তু এরকম গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়ার কোনো মানে হয় না।'

'সেটা বুঝলে ওরা বলত না।'

'ছোট থেকে গেছে।'

'কেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার কাছে এখনও ভাঙেনি।'

'চেম্বার থেকে এলে দেখা করতে বোলো।'

সন্ধেবেলায় চেম্বারে বসতেই প্রথম যে ভিজিটার্স কার্ড চোখে পড়ল তা কখনই আশা করেননি সৌমিত্র। গোপালকে বললেন, 'ওঁকে ভেতরে আসতে বলো।'

বিল্টু দত্ত ঘরে ঢুকলেন একটা বড় মিষ্টির বাক্স নিয়ে, 'আপনার সময় নষ্ট করছি বলে দুঃখিত। আপনি আমার অনুরোধ রেখেছেন, আমার ছেলে জামিন পেয়েছে বলে এইটুকু কৃতজ্ঞতা বাবদ দিতে এলাম।'

বাক্সটা টেবিলে রাখলেন বিল্টু দত্ত।

সৌমিত্র বললেন, 'মিস্টার দত্ত, আপনি কিরকম মানুষ আমি জানি না, কিন্তু আপনার পুত্রটির জন্যে সারাজীবন আপসোস করতে হবে আপনাকে।'

'সারাজীবন? এত দূরের কথা কেন বলছেন? এখনই তো আমার লাইফ হেল করে দিচ্ছে। মামাদের রক্ত তো ওর শরীরে। ভাগ্নে তো মামাদের মতোই হবে। তবু, আমার কাজ ওকে সংশোধন করার চেষ্টা করা, করে যাচ্ছি। আপনি যে উপকার করলেন তা যদি হারামজাদা মনে রাখে তাহলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না।' বিল্টু ঘন ঘন মাথা নাড়লেন।

'ঠিক আছে।' সৌমিত্র বুঝিয়ে দিলেন তিনি এবার চলে যেতে বলছেন ওঁকে।

'আর একটু—।' বিল্টু দত্ত দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'আয়।'

পাজামাপাঞ্জাবি পরা একটি যুবক যেন বাধ্য হয়েই এঘরে ঢুকল।

বিল্টু দত্ত বললেন, 'প্রণাম কর হতভাগা। যে অন্যায় তুই করেছিস তার তো কোনো ক্ষমা নেই। তবু উনি যদি করেন—।'

ছেলেটি এগিয়ে আসছিল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সৌমিত্র বলল, 'আরে। না না। ওকে নিয়ে এলেন কেন?'

ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল। বিল্টু দত্ত বললেন, 'না নিয়ে এলে অমানুষ থেকে যেত সৌমিত্রবাবু। ওকে প্রণাম করতে দিন।'

নিজেকে স্থির রাখতে আর পারলেন না সৌমিত্র, 'আপনাদের স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওরকম জঘন্য অন্যায় করা ছেলেকে নিয়ে এসেছেন আমার বাড়িতে কোন্ সাহসে? প্লিজ ওকে নিয়ে চলে যান।'

বিল্টু দত্ত মাথা নাড়লেন। 'আপনি যা বলছেন তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাবা হিসেবে আমি চেয়েছিলাম ছেলেটা সংশোধিত হোক। আর সেটা সম্ভব আপনার

আশীর্বাদ পেলে। ভেবেছিলাম, আপনার মেয়ের কাছে ও ক্ষমা চাক। তার জন্যে নীপা মা যে শাস্তি দেবে তা ওকে মাথা পেতে নিতে হবে। এই কয়েকদিন পুলিশ হাজতে থেকে ওর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার কথার কোনো প্রতিবাদ করছে না। ঠিক আছে আপনি যখন চাইছেন না, চল খোকা—।'

'মিস্টির প্যাকেটটা নিয়ে যান।' সৌমিত্র বললেন।

'না। সেটা অনুচিত হবে। আপনি ফেলে দিন প্যাকেটটা, কিন্তু আপনাদের উদ্দেশে কেনা মিষ্টির প্যাকেট আমি ফেরত নিয়ে যেতে পারব না।'

এই সময় ইন্টারকামে শব্দ বাজল। রিসিভার তুললেন সৌমিত্র। গৌরীর গলা ভেসে এল। 'তুমি এত চ্যাঁচামেচি করছ কেন? কি হয়েছে?'

'কিছু একটা হয়েছে!'

'সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'বিল্টু দত্ত সপুত্র এসেছেন। তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়ে নীপার কাছে ক্ষমা চাওয়াতে চান যাতে সে শোধরায়। এরপর মাথা ঠিক রাখা যায়?'

'সেকি! অদ্ভুত ব্যাপার!' গৌরী অবাক হয়ে গেলেন, 'ওদের দাঁড়াতে বলো।'

'কেন? তোমার কি দরকার?' প্রশ্ন করার সময়েই সৌমিত্র বুঝতে পারল ওপাশের রিসিভার রেখে দেওয়া হয়েছে।

বিল্টু দত্ত তাকিয়েছিলেন। সৌমিত্রর মুখের অভিব্যক্তি দেখে জিজ্ঞাসা করতেন, আমরা কি একটু দাঁড়িয়ে যাব?

'আপনি তো যা ইচ্ছে তাই করছেন, এখনও তাই করুন।'

'ওহো, দেখুন কি অন্যায় কথা। এসব ব্যাপারে ভুলে থেকে জিজ্ঞাসাই করিনি আপনার ভাই এখন আছেন?' বিল্টু দত্ত বেশ সিরিয়াস।

'বাড়িতে যখন চলে এসেছে তখন নিশ্চয়ই ভালো আছে।'

'বাঃ। কিন্তু নির্দোষ লোকটাকে অযথা কি ভুগতে হল বলুন?'

'হ্যাঁ। এ ব্যাপারে কোনো অপরাধীও ধরা পড়ল না।'

'সত্যি। পুলিশের আর আগের মতো দক্ষতা নেই।'

'আপনারা টাকা ছড়ালে কি করে আর থাকবে।'

'একি বলছেন। না, মানতে পারছি না। গ্যাংটক শহরে যান, গায়ে গায়ে মদের দোকান। তা বলে শহরের সব মানুষ মাতাল হয়ে আছে? হামবুর্গ শহরে শুনেছি বারবনিতাদের ভিড় লেগেই আছে তাই বলে কি সবাই তাদের কাছে যায়? যায় না। তাই টাকা ছড়ালেই তা লুফে নিয়ে অসৎ হবে এমন নির্দেশ তো পুলিশকে কেউ দেয়নি। সৎ পুলিশ তো আর কাঁঠালের আমসত্ত্ব নয়। প্রচুর সৎ মানুষ পুলিশের চাকরি করেন।'

'না করলে দেশটা উচ্ছন্নে যেত। তবে সৌগতর ক্ষেত্রে তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। আপনিই তাদের অকেজো করেছেন।' সৌমিত্র বললেন।

'ছি ছি। আবার তিরটা আমার দিকে ছুঁড়লেন? প্রমাণ করা যাবে না এমন অভিযোগ করা কি ঠিক?' বিল্টু দত্তের কথা শেষ হতে না হতেই গৌরী দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত মাথায় তুলে বিল্টু দত্ত বললেন, 'এই আমার অকালকুষ্মান্ড পুত্র। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে আমার। ওকে বলেছি শেষবার তোমাকে সংশোধনের চেষ্টা করব তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে দূর করে দেব সামনে থেকে। তা ছেলে মেনে নিয়েছে কথাটা তাই নিয়ে এলাম আপনাদের কাছে। এখন যা শাস্তি দেওয়ার আপনারাই দিন। ও মাথা পেতে নেবে।'

গৌরী ছেলেটিকে দেখলেন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে ওকে অপরাধী বলে মনেই হয় না। তিনি বললেন, 'এই সেই ছেলে—!'

'হ্যাঁ। আমার একমাত্র পুত্র। সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? প্রণাম করো।'

ছেলেটি এগোচ্ছিল, গৌরী কড়া গলায় বললেন 'থাক।'

ছেলেটি থেমে গেল। গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'এমন কাজ কেন করলে?'

ছেলেটি চুপ করে রইল। বিল্টু দত্ত ধমকালেন, 'কি হল? জবাব দাও।'

'অন্যায় হয়েছে।' ছেলেটি বলল।

'আমার মেয়ে যদি প্রতিবাদ না করত তাহলে তোমরা তো নরপিশাচের মতো আচরণ করতে। তোমার বাবা-মা কি এই শিক্ষা তোমাকে দিয়েছেন?'

'না। হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'ঠিক আছে। যেতে পারো।'

বিল্টু দত্ত সঙ্গে সঙ্গে হাত তুললেন, 'ব্যস। এটুকুই যথেষ্ট। খোকা, এই যে আশীর্বাদ তুমি পেলে বাকি জীবন এর মূল্য দিয়ে যাবে। এসো। চলি—।' ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিল্টু দত্ত।

'কিছু বুঝলে?' সৌমিত্র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়লেন গৌরী।

'লোকটা তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল আর কোনো অভিযোগ নেই, ওর ছেলে সংশোধিত হচ্ছে তোমার আশীর্বাদ পেয়ে।'

'একথা আমি একবারও বলিনি।' গৌরী প্রতিবাদ করলেন।

'তুমি মুখে না বললেও ভঙ্গিটা সেরকমই ছিল।'

'তাই যদি মনে করো তাহলে বলব ঠিকই করেছি।'

'তার মানে?'

'এরপর থেকে নীপার ব্যাপারে আমাকে আর উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হবে না। ওই ছেলে বদলা নেবে এই ভয়ে মেয়েকে বাড়িতে আটকে রাখতে হবে না। তাছাড়া এমনও হতে পারে এই ছেলেটা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছে। মুখ দেখে তো মনে হয় না অপরাধী।' গৌরী ভেতরে চলে গেলেন।

সৌমিত্র হতভম্ব। এখন কি করণীয় তা তাঁর মাথায় আসছিল না।

সন্ধেবেলায় মায়ের ঘরে ঢুকেছিল ছোটবোন। এ বাড়ির ছোটমেয়ে। ঢুকে দেখল রমা বিছানায় বসে দেওয়ালে টাঙানো ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছেন। ওখানে যে বাবার ছবি তা এ বাড়ির সবাই জানে।

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ সরালেন রমা, 'গেলি না?'

'না।'

'বলে এসেছিস তো?'

'এখানে আসব জানে, থেকে যাব জানে না। না ফিরলেই বুঝে নেবে।'

'না না। যেতে না চাইলে ফোন করে জানিয়ে দে।' রমা চিন্তিত হলেন।

'কোনও দরকার নেই।' মায়ের পাশে বসল ছোটমেয়ে।

বড়মেয়ে বা মেজোমেয়ের একটা ডাক নাম ছিল। কিন্তু খুকী বলতেন এই ছোটমেয়েকে। একটু বেশি প্রশ্রয় দিতেন। তাই অন্য মেয়েরা রাগ করে বলত, 'ওকে তোমরা চিরকাল খুকী করেই রাখবে।'

'কি নিয়ে ঝগড়া হল?' হেসে জিজ্ঞাসা করলেন খুকীকে।

'ঝগড়া? কার সাথে?'

রাগ হয়ে গেল রমার। ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছ মেয়েটা। রাগ হলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না তাঁর।

মিনিট খানেক পরে খুকী নিজেই কথা বলল, 'ভাবছি কিছুদিন এখানে থাকব।'

'বউমাকে বল।'

'আশ্চর্য! এটা আমার বাপের বাড়ি, এখানে থাকতে বলে আমাকে বউদির মতোমতো নিতে হবে? বউদি যদি বলে না, থাকা চলবে না তাহলে চলে যেতে হবে আমাকে?' খুকী খেপে গেল, 'তুমি বেঁচে থাকতে?'

'তুই অযথা কথার ঘোঁট পাকাচ্ছিস। বউমা সংসারের সব দেখাশোনা করে। তাই তাকে বলতে বলেছি।'

'তোমার জামাই আমার সঙ্গে খুব অসভ্যতা করছে।'

'ও।'

'আমি তোমাদের কখনও একথা বলিনি।'

'মানিয়ে নে, ও যা বলে তা যদি মেনে নিস তাহলে আর কি নিয়ে ঝগড়া করবে? একহাতে তো তালি বাজে না। এই দ্যাখ, তোর বাবা, এখন ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছে, একসময় কি আমার ওপর কম অত্যাচার করেছে? আমার মন কি চায় তার খবর কখনও রেখেছে? কিন্তু আমি মাথা গরম করিনি কখনও। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পালটে গেল মানুষটা,' রমা বললেন।

মাথা ঝাঁকালো খুকী। মায়ের সঙ্গে কথা বলে যে কোনো লাভ হবে না তা জানা

ছিল। তবু—। সে উঠে দাঁড়াল, 'আসছি।'

'আয়।'

অদ্ভুত! মনে মনে বলল খুকী, আবাহন নেই, বিসর্জনও নেই।

ছোটভাই-এর ঘরে টিভি চলছে। পর্দা সরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল ছোটভাই জানলায় পাশের চেয়ারে বসে হাত নাড়ছে।

'কে রে?' খুকী জিজ্ঞাসা করল।

চমকে ফিরে তাকাল ছোটখোকা, বোনকে দেখে কোনোমতে বলল, 'কে আবার?'

'বাঃ, দেখলাম তুই কাউকে হাত নাড়ছিলি?' এগিয়ে এল খুকী।

'তোর মাথার ঠিক আছে? এই রাত্রের অন্ধকারে আমি কেন হাত নাড়ব?' বলতে বলতে আর একবার বাইরেটা দেখে নিয়ে হাসল ছোটখোকা, 'এখানে আয়, নিজেই দ্যাখ না কাউকে দেখতে পাচ্ছিস কি না।'

'তুই এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন?'

'নেব না কেন? সারা দিনরাত এইঘরে একা পড়ে থাকি। আমার কোনো কাজ নেই। নীপা ছাড়া কেউ আমার খবর নেয় না। এই যে দিদিরা এল, কেউ একবারও আমার ঘরে এসেছে? খেয়ালই নেই আমি বেঁচে আছি!'

'আমি তো তিনবার এলাম।'

'তোর কথা কে বলছে?'

খুকী খাটের একপাশে বসল, 'ভাবছি, এখানে কিছুদিন থাকব।'

'সত্যি?' খুশি হল ছোটভাই।

'হুঁ।'

'তোর স্বামী?'

'ও ওর মতো থাকবে?'

'আচ্ছা, একটা প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিবি?'

'কি প্রশ্ন?'

'আগে বল ঠিকঠাক বলবি!'

'বেশ, বলব।'

'বিয়ের পর কতদিন প্রেম থাকে রে? এক বছর, দুবছর—।'

'হঠাৎ একথা?'

'বিয়ের ছয়মাস পরে তোকে থাকতে বললে তুই থাকতে চাইতিস না। বলতিস ওর অসুবিধে হবে। অথচ আজ বলতে পারলি ও ওর মতো থাকবে। তার মানে তখন তোর মনে যত প্রেম ছিল এখন তা নেই।' ছোটখোকা বলল।

'তা হবে।' উদাসীন-গলায় বলল খুকী।

'এবার উত্তরটা দে।'
'সত্যি বলব?'
'হ্যাঁ।'
'ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই প্রেম কমতে থাকে।' খুকী বলল।
'যা।'
'বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। একটা অজানা মানুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে যখন বোঝা যায় কিছু কিছু ব্যবহার ভালো লাগতেও অনেকগুলো অপছন্দর সঙ্গে সাজিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। দুতিনবছর পরে যাদের সন্তান এসে যায় তার রক্ষে পায় কারণ সন্তানেই ভুলে থাকতে পারে। যাদের সন্তান হয় না তারা দুর্ভাগা। একসময় মানাতে না পেয়ে তারা ঠান্ডা হয়ে যায়।'
'তুই বললি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয়। তাহলে কিছু ক্ষেত্র আছে যাদের ক্ষেত্রে ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় না। তাদের প্রেম কি চিরকাল থাকে?' ছোটখোকা জিজ্ঞাসা করল।
'আমি কি করে জানব? আমার ভাগ্যে তো ওরকম হয়নি।'
'তাহলে তোরা স্বামী-স্ত্রী কিন্তু প্রেম নেই। দিদিদের?'
'ওরা প্রেম নিয়ে মাথা ঘামায় না। স্বার্থ ঠিক থাকলেই হল।'
'বউদির?'
'আশ্চর্য! বউদিকেই জিজ্ঞাসা কর, আমাকে কেন?' খুকী হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বলে, 'কাকে হাত নাড়ছিলি? কোনো বান্ধবী?'
'বান্ধবী? আমার মতো হ্যান্ডিক্যাপের সঙ্গে কে বন্ধুত্ব করবে?'
'কি জানি। তুই হঠাৎ প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করছিলি—। সাবধান!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল খুকী। এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলার পর এবার বাইরে তাকাল ছোটখোকা। না কেউ নেই। জানলা অন্ধকার। খুব রাগ হল তার, খুকী আর এঘরে আসার সময় পেল না!
সৌগতর ঘরে ঢুকল খুকী। দেখল নীপা বসে আছে বিছানার পাশে। সৌগত ডাকল, 'আয়, এখানে এসে বোস।'
'কেমন আছিস মেজদা?'
'অনেক ভালো।'
নীপা তাকাল, 'তুমি কেমন আছ ছোটপিসি?'
'আমি? আছি!' শ্বাস ফেলল খুকী।
'ওভাবে বলছ কেন?'
ম্লান হাসল খুকী। সেটা লক্ষ্য করে বালিশে মাথা ঘোরাল সৌগত, 'কি হয়েছে তোর? অনিলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?'
'আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করি না।'

'ও। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'না । চলি।'

'চলি মানে?' নীপা বলল, মা বলল তুমি তো এখানে থাকবে।'

'নিচে যাওয়ার কথা বলছি।'

এইসময় সৌমিত্র দরজায় এলেন, 'কিরে কেমন আছিস?'

'ঠিক আছি?'

'শুনেছিস?'

'হ্যাঁ' নীপা বলল।

'মানুষ যে কত নির্লজ্জ হতে পারে। কিন্তু আমি ছাড়ব না। কেস চলবেই। প্রমাণ না করতে পারি কিন্তু ওকে আমি কাঠগড়ায় তুলবই।' সৌমিত্র বললেন।

নীগা বলল, 'যখন প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার তখন কেস করে কি লাভ বাবা! তাছাড়া বিল্টু দত্ত ছেলেকে নিয়ে এসেছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। এ থেকেই বোঝা যায় ওর ক্ষমতা কতখানি!'

'সেকি রে। তুইও একথা বলছিস?' একটু অবাক হলেন সৌমিত্র।

'বাবা, আমি যা করেছিলাম তা না করলে আত্মসম্মান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতাম না। কিন্তু পিসিমা এসে বলে গেল আমি অন্যায় করেছি। প্রথমত ওই জায়গায় যাওয়াই উচিত হয়নি। ওখানে গেলে ওরকম ঘটনা ঘটতে পারে, জেনেও কেন আমরা গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, মেয়ে হয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করা, থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানো নাকি অনুচিত কাজ হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যা করেছি তা করাই উচিত ছিল। ভবিষ্যতে যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে আবার করব। ওই ছেলেটার যে ভয়ঙ্কর চেহারা আমি দেখেছি তার সঙ্গে কিছুতেই ক্ষমা চাইতে আসা ছেলেটাকে মেলাতে পারছি না। এমন হতে পারে অন্য কাউকে ছেলে সাজিয়ে এনেছিল বিল্টু দত্ত।

সৌগত বলল, 'দাদা, নীপা একদম ঠিক কথা বলছে।'

সৌমিত্র একটা চেয়ার টেনে বসলেন, 'একথা আমার মাথায় আসেনি।'

'কি কথা?' সৌগত জিজ্ঞাসা করল।'

'বিল্টু দত্ত অন্য কাউকে নিজের ছেলে সাজিয়ে আনতে পারে। কিন্তু সেরকম হলে ওকে তুই দেখলে বুঝতে পারতিস?'

'না' নীপা মাথা নাড়ল, 'ওদের কারও মুখ এখন আর আমার মনে নেই। কিরকম ঝাপসা হয়ে গেছে।'

'ও।' সৌমিত্রর মুখ থেকে ছোট্ট শব্দটা বের হল।

সৌগত প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে একটু হালকা গলায় বলল, 'এদিকে আমাদের খুকুরানীর কেস খুব খারাপ। অনিলের ওপর অভিমান করে বলে এসেছে। তাতে আমাদের ভালো হয়েছে, অনেকক্ষণ ওর সঙ্গ পাব।'

সৌমিত্র তাকালেন বোনের দিকে, 'কি হয়েছে রে? তোর বউদি বলছিল কি একটা সমস্যা নিয়ে তুই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাস?'

খুকী তাকাল। তারপর নীপাকে দেখে মাথা নাড়ল, 'থাক।'

সেটা লক্ষ্য করে সৌগত বলল, 'নীপা থাকায় তোর অসুবিধে হচ্ছে?'

নীপা বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

খুকী মাথা নাড়ল, 'না না। যেতে হবে না। আমি পরে বলব।'

সৌগত বলল, 'পরে কেন? আরে নীপা এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। দেখছিস তো নিজের সম্মান ও নিজেই রাখতে পারে। ও শুনলে কোন ক্ষতি হবে না তোর?'

নীপা উঠে দাঁড়িয়েছিল, খুকী বলল, 'আমি ডিভোর্স চাই।'

নীপা অবাক হয়ে বলল ফেলল, 'সেকি! কেন?'

হাউ হাউ শব্দে কেঁদে দুহাতে মুখ ঢাকল খুকী। তার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নীপা জড়িয়ে ধরল তাকে, 'ছোটপিসি, ছোটপিসি।'

প্রায় মিনিটখানেক লাগল নিজেকে সামলাতে। আগে চোখমুখ মুছতে মুছতে খুকী বলল, 'সরি।'

সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করেছে অনিল?'

'ও আমাকে সহ্য করতে পারে না।' খুকী করুণ গলায় বলল।

'কেন?'

'আমি, আমি নাকি ঠান্ডা, ন্যাতানো, আমার গায়ের চামড়া নাকি রোজ কালো হয়ে যাচ্ছে। ফরসা মেয়েরাই ওর পছন্দের।' খুকী বলল।

'বাড়িতে ফরসা কাজের মেয়ে ওই জোগাড় করে আনে। সে শুধু ওর কাজ করবে, সংসারের নয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব কাজ আমাকে একা করতে হয়। মেয়েটাকে পাঁচ-ছয়মাস রেখে বিদায় করে আর একজন নিয়ে আসে। আমি সহ্য করতে পারছি না আর।'

'কবে থেকে এসব শুরু করেছে অনিল?' সৌগত চ্যাঁচাল।

সৌমিত্র ভাইকে বললেন, 'থাম। তোর এখন এক্সাইটেড হওয়া একদম উচিত নয়।' বলে বোনের দিকে তাকালেন।

'বছর খ্যানেক।' খুকী জবাব দিল।

'এতদিন আমাদের জানাসনি কেন?' সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'ভেবেছিলাম ও শুধরে যাবে। দ্বিতীয় মেয়েটাকে যখন নিয়ে এল তখন আর পারলাম না। মেয়েটা আমাকে কয়েকটা ছবি দেওয়ার পর আর থাকতে পারছি না।'

'ছবি?' সৌমিত্র অবাক।

'প্রথম মেয়েটাকে ও ছয়মাস পরে ছাড়িয়ে দেওয়ার সময় ওদের ঝগড়া হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ও বিদায় হলে বাড়িতে শান্তি ফিরে আসবে। কয়েকদিন আগে দুপুরবেলা ও যখন বাড়িতে নেই আর দ্বিতীয় মেয়েটা ঘুমোচ্ছে তখন প্রথম মেয়েটা

এসে আমাকে একটা খাম দিয়ে বলল, 'ছবিগুলো আমার কাছে ছিল। তোমাকে দিয়ে গেলাম। তোমার স্বামী তো আর একজনকে ঘরে তুলেছে। এটা দেখিয়ে তুমি বদলা নিতে পারবে।' মেয়েটা চলে যাওয়ার পর খাম খুলে দেখলাম মেয়েটার সঙ্গে ওর জঘন্য ধরনের ছবি। আমি আর পারছি না দাদা!' খুকী বলল।

'ছবিগুলো কোথায়?'

'আমার কাছে।'

'অনিল জানে ছবির কথা?'

'না।'

'এখন ওই দ্বিতীয় মেয়েটা তোর বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ'

'আশ্চর্য!' নীপার মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে এল!

খুকী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। নীপা বলল, 'তুমি কি? এতদিন ধরে এসব সহ্য করছিলে?'

'বাঙালি মেয়ের মাথায় চট করে বিয়ে ভাঙার কথা আসে না রে! তাছাড়া এতো আমার লজ্জা। আজ মা বলল সব অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে একসময় বাড়িতে শান্তি আসে। কিন্তু—।' থেমে গেল খুকী।

'ঠাকুমাদের আমলে যা ঘটত এখনও তাই ঘটবে? তখন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে আজকের মতো প্রতিযোগিতা নামতো? আর তুমি এসব ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ? ছি ছি।' নীপার গলা ঝড়ছিল।

সৌমিত্র ধমকালেন, 'নীপা!'

'না বাবা। বিল্টু দত্তের ছেলে আমাদের সঙ্গে যা করেছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি অন্যায় করেছে ওই লোকটা।' নীপা বলল।'

'ওই লোকটা?' থতোমতো হয়ে গেলেন সৌমিত্র।

'ছোটপিসির স্বামীকে আমি আর পিসেমশাই বলতে রাজি নই।' নীপা বলল, 'তুমি এতদিন এইসব সহ্য করে ওবাড়িতে থাকলে কি করে ছোটপিসি?'

'কি করব? আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। একটা টাকাও তো রোজগার করি না। ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাই মনে জোর ছিল না।' খুকী বলল।

সৌগত বলল, 'আজ কি করে বলতে পারলি?'

একটু চুপ করে থাকল খুকী। তারপর বলল, 'সকালে এসেছি। দিদিদেরও বলিনি। সারাটা দিন কেটে গেল, মুখ বুজে থেকেছি। কাল ফিরে যাব।'

'কাল ফিরে যাবে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' নীপা রেগে গেল।

সৌমিত্র উঠে দাঁড়ালেন, 'তুই তৈরি হয়ে নে। মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরুব।'

'আমি এই রাত্রে ও বাড়িতে যাব না দাদা।' কাতর গলায় বলল খুকী।

'ওঃ। আমরা ওই বাড়িতে যাচ্ছি না। নীপা, তুই ছোটপিসির সঙ্গে চল।'

'কোথায় যেতে চাইছ?' বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করল সৌগত।

'তুই উঠছিস কেন? শুয়ে থাক। আমরা থানায় যাব। খুকীর উচিত অনিলের বিরুদ্ধে ডায়েরি করা।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সৌমিত্র।

থানায় ঢোকার আগে শেষবার প্রশ্ন করলেন সৌমিত্র, 'আমরা সবাই তোর সঙ্গে থাকব। কিন্তু তুই শেষপর্যন্ত অপমান হজম করে ওই বাড়িতে ফিরে যাবি না তো?'

খুকী মাথা নাড়ল। বোঝাল, সে ফিরে যাবে না।

বড়বাবুর টেবিলের উলটোদিকে বসে নিজের কার্ড এগিয়ে দিলেন সৌমিত্র। সেটা পড়ে ভদ্রলোক বলল, 'আরে! আপনি? আপনার মেয়ে—!'

'নীপা। এইতো।'

'ওহো, তুমি তো দারুণ কাজ করেছ ভাই। আমি তো বলি, প্রত্যেক বাঙালি মেয়েকে চৌদ্দো বছর থেকেই ক্যারাটে শেখানো উচিত। স্কুলেই এটা করলে নিজের ওপর আস্থা দৃঢ় হবে।' বড়বাবু বললেন।

'কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাধী জামিন পেয়ে যায়!' নীপা বলল।

মাথা নাড়লেন বড়বাবু, 'আইন তার নিজের পথে চলবেই। কিন্তু তাই বলে তোমার প্রতিবাদ তো মিথ্যে হতে পারে না। হ্যাঁ, বলুন।' সৌমিত্রর দিকে তাকালেন বড়বাবু। 'কি সমস্যা হয়েছে?'

সৌমিত্র বললেন, 'এ আমার ছোটবোন। সমস্যা এর।'

খুকী নড়েচড়ে বলল। বড়বাবু বললেন, 'বলুন।'

সৌমিত্রই পুরো ব্যাপারটা বড়বাবুকে জানালেন। সব শোনার পর বড়বাবু বললেন, 'ছবিগুলো কি আপনাদের সঙ্গে আছে?'

খুকী ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে টেবিলের রাখলে বড়বাবু সেটা তুলে মুখ খুলে একটা ছবি দেখেই ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর খামটা সৌমিত্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওর কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত।'

'কীভাবে?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'আপনি মনঃস্থির করেছেন যে ওর সঙ্গে থাকবেন না?'

মাথা নাড়ল খুকী।

'এই ছবি আর অন্যান্য এভিডেন্স থাকলে যে সহজেই ডিভোর্স পাওয়া যাবে তা আপনি জানেন। আদালত নিশ্চয়ই ওকে খোরপোশ দিতে বাধ্য করবে। ঠিক আছে।' বেল টিপলেন বড়বাবু। সেপাই এলে তাকে ডায়ারি বুক আনতে বললেন। সেটা এলে নিজের হাতে অভিযোগ লিখে খুকীকে সই করতে বললেন। ডায়ারির একটা প্রমাণপত্র সৌমিত্রকে দিয়ে বললেন, 'এখন রাত সাড়ে নটা। আমি একবার ওই বাড়িতে যাব। আপনারা কি থানায় অপেক্ষা করবেন?'

সৌমিত্র মেয়েদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমি থাকছি। ওরা বাড়ি ফিরে যাক।'

খুকী কথা বলল, 'আমিও থাকব।'

'না। তোরা চলে যা। বাড়ি ফিরে গাড়িটা পাঠিয়ে দিস। আর নীপা, ড্রাইভারকে বলিস আজ ওকে এক্সট্রা টাইম ডিউটি করতে হবে।' সৌমিত্র বললেন।

অনিচ্ছা নিয়ে মেয়েরা ফিরে গেলে ওসি একটা ভ্যানে কয়েকজন সেপাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। সৌমিত্র চোখ বন্ধ করলেন চেয়ারে বসে।

রাত দশটায় কোলকাতার মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে না। কিন্তু যে বাড়ির সামনে তার ভ্যান এসে দাঁড়াল তার কোনো আলো জ্বলছে না। ওপাশের রকে তিনজন বয়স্ক মানুষ আড্ডা মারছিলেন। ভ্যান থেকে নেমে ওসি তাঁদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই এই পাড়ার থাকেন।'

তিনজনেই মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'অনিলবাবু ওই বাড়িতে থাকেন?'

একজন বললেন, 'অনিল? হ্যাঁ অনিলই বোধহয়। পাড়ার কারও সঙ্গে মেশে না। বাচ্চাকাচ্চাও নেই। কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে আমি ওই বাড়িতে যাব। আপনারা কি দয়া করে আমার সঙ্গী হবেন?' বড়বাবু বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনজনেই পরস্পরের মুখ থেকে মাথা নাড়লেন রাজি হয়ে।

বেল টিপলেন বড়বাবু। তৃতীয়বারে সাড়া পাওয়া গেল। একজন পুরুষ জানতে চাইছেন কে বেল বাজাচ্ছে।'

বড়বাবু জবাব দিলেন, 'আমি।'

দরজা খুললেন যিনি তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কোমর থেকে লুঙ্গি ঝুলছে। 'কি চাই?'

'আপনিই অনিল রায়?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'আমি লোকাল থানার ওসি। এঁরা আপনার পাড়ার লোক।'

'এত রাত্রে কি ব্যাপার?' অনিলকে খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিতে দেখা গেল।

অনিলকে সরিয়ে বড়বাবু ভেতরে ঢুকলেন, 'এই বাড়ির বাসিন্দা কজন?'

'দুজন।'

'আপনি আর আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'স্ত্রী কোথায়? তাকে ডাকুন।'

'ও এখানে নেই। বাপের বাড়িতে গিয়েছে।'

'কবে?'

'আজকেই।'

'তাহলে এখন আপনি এ বাড়িতে একা আছেন?'

'হ্যাঁ একাই।' শ্বাস নিল অনিল, 'কাজের মেয়ে আছে।'

'কাজের মেয়ে?'

'বাড়ির কাজ করে। রান্না ঘর মোছা। কিন্তু এসব জানতে চাইছেন কেন?'

'কটা ঘর?'

'তিনটে।'

'চলুন, দেখি ঘরগুলো, 'আসুন আপনারা।'

'আপনি কি চাইছেন বুঝতে পারছি না। মাঝরাত্রে কারও বাড়ির শান্তি নষ্ট কোনো অধিকারে করছেন আপনি?' অনিল বলল।

বড়বাবু ততক্ষণে পাশের ঘরে ঢুকে গেছেন। ঘর খালি। বেরিয়ে এসে বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে একজন থানায় অভিযোগ করেছে।'

'আমার বিরুদ্ধে। অসম্ভব। আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না।'

'ওটা আপনাদের বেডরুম?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওখানে আপনি ঢুকবেন না।'

'আপত্তি করছেন কেন? অভিযোগটা মিথ্যে কিনা তাই দেখতে এসেছি?' পর্দা সরালেন বড়বাবু। ঘরে হালকা নীল আলো জ্বলছে। খাটের ওপর একটি নারী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার পরনে শুধু শায়া ছাড়া কিছু নেই। বিছানার একপাশে মদের বোতল এবং দুটো গ্লাস যার একটা খালি।'

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে?'

মুখ নামাল অনিল।

'আপনার স্ত্রী বাপের বাড়িতে গিয়েছেন অথচ বিছানার একজন অর্ধনগ্ন মহিলা এবং মদের বোতল—বাঃ। চমৎকার। আপনারা একটু এগিয়ে আসুন।' তিন ভদ্রলোককে ডাকলেন বড়বাবু, 'হ্যাঁ। দেখে রাখুন স্ত্রীকে কেয়ার না করে এই লোকটি কিভাবে বিছানায় মেড সারভেন্টকে তুলে ফূর্তি করছেন।

তিনজন অবাক চোখে শরীর পিঠ দর্শন করলেন।

বড়বাবু বললেন, 'এবার ওকে তুলুন।'

'ও উঠতে পারবে না।' মিনমিন করল অনিল।

'কেন? মাল খেয়ে আউট হয়ে গেছে? অন্তত পোশাক পরিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি চলুন, আমরা বাইরে যাই।' বড়বাবু ওদের বাইরে নিয়ে এলেন। ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়ানো দুজন বয়স্ক সেপাইকে ডেকে নির্দেশ দিলেন বড়বাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার আপনাদের নাম-ঠিকানা বলুন।'

ওঁরা সেসব দেওয়ার পর একজন বললেন, 'এসব আমরা টেরই পাইনি। ছি ছি।'

খানিক বাদে দুজন সেপাই নারীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ভ্যানে তুলল। অনিলের বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে তাকে নিয়ে ভ্যান থানায় রওনা হল।

সৌমিত্রকে দেখে চমকে উঠল অনিল। মুখ নামাল।

তাকে হাজতে ঢোকানো হল। নারীর জ্ঞান ফিরছিল। তাকে শুইয়ে রাখা হল বেঞ্চির উপর।

বড়বাবু বললেন, 'আপনার বোনকে বলবেন আইন যতটা শাস্তি দিতে পারে ততটা যাতে ও পায় আমি চেষ্টা করব।'

'অনেক ধন্যবাদ।' ভাঙা গলায় বললেন সৌমিত্র।

বাড়ির কেউ এই রাত্রে ঘুমায়নি। এমনকি ছোট খোকাও হুইলচেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছিল হলঘরে। 'সৌগতর বিছানার পাশে পাথরের মতো বসে ছিলেন খুকী। গৌরী বলেছিলেন, 'এবার ওকে ঘুমোতে দাও, রাত জাগা উচিত নয়।'

সৌগত হাত নেড়েছিল। শুয়ে শুয়েই বলেছিল, 'না থাক। তাছাড়া তোমরা সবাই এই ঘর থেকে চলে গেলেই কি ঘুমোতে পারব?'

গৌরী আর কথা বাড়ায়নি।

সৌমিত্র ফিরলেন। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে নীপা বলল, 'বাবা, আমরা এখানে।'

সৌমিত্র ওপরে উঠে এলেন, 'একি! এত রাত পর্যন্ত তোমরা জেগে আছ?'

গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'কট রেডহ্যান্ডেড। সাক্ষী রেখে পুলিশ ধরেছে ওদের। ডিভোর্স তো হবেই, জেল অনিবার্য।' সৌমিত্র জানালেন।

'আবার আইনের কোনো ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে না তো?' গৌরী স্বামীর দিকে তাকালেন।

সৌমিত্র হাসলেন, 'পুলিশ যদি পুলিশের মতো কাজ করে তাহলে কোনো অপরাধী শাস্তি এড়াতে পারে না। এই ওসি ভদ্রলোকের ব্যবহার এবং কাজে আমি মুগ্ধ। উনি কোনো ফাঁক রাখতে দেবেন না।'

'চলো, খেয়ে নেবে সবাই।' গৌরী এগোলেন।

সৌমিত্র বললেন, 'সবাই মানে? তোমরা খাওনি?'

'না। মেজদাকে জোর করে খাইয়েছি।'

সৌমিত্র দেখলেন খুকী মাথা নিচু করে মায়ের ঘরে ঢুকছেন।

ডাকতে যাচ্ছিলেন, গৌরী বাধা দিলেন, 'ওকে ডেকো না। এরকম ঘটনার পর ওর গলা দিয়ে খাবার নামতে পারে না।'

নীপা বলল, 'মা, এত রাত্রে আমিও খাব না। অ্যাসিড হয়ে যাবে।'

সৌমিত্র মাথা নাড়ল।

এই রাত্রে কেউ খাবার টেবিলে বসল না।

স্বামীদের অত্যাচার এবং লাম্পট্যের কাহিনি কাগজে ছাপলে ভালো বিক্রি হয়।

কিন্তু তাদের থেকেও বেশি উন্মাদনায় মাতে টি ভি চ্যানেলগুলো। এ বাড়িতে সেই ঢেউ আছড়ে পড়ল। সবাই খুকীকে চেয়ারের সামনে পেতে চায়। সৌমিত্র জানেন ওরা কি জানতে চাইবে। ঠিক কি কি অত্যাচার করত অনিল? মেডসারভেন্টের সঙ্গে অনিলের লাম্পট্যের বর্ণনা চাইবে। তারপর সহানুভূতি জানাবে খুকীকে।

সৌমিত্র জানিয়ে দিলেন তাঁর বোন এতটা মানসিক বিপর্যস্ত যে ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছেন। অতএব কোনোমতে তাকে ডাকা চলবে না। টিভির লোকজন খুব হতাশ হল। কিন্তু কাগজ পুলিশের রিপোর্ট বেরিয়ে গেল।

সকাল হওয়ার কিছুটা সময় বাদেই ফোন এল। বড় এবং মেজ বোনের।

গৌরী ফোন ধরেছিলেন।

বড়বোন বলল, 'এসব কি পড়ছি কাগজে? খুকী তো সেদিন একটা কথাও বলেনি আমাকে! হাজার হোক স্বামী, অন্যায় করেছে, তাই বলে তাকে জেলে পাঠাবে?'

'ও আর সহ্য করতে পারছিল না।'

'সহ্য করতে পারছিল না! তাহলে মেয়ে হয়ে জন্মেছিল কেন? ডিভোর্সের পর কি করবে? খাবে কি? থাকবে কোথায়? তখন তো আমাদেরই গলগ্রহ হবে!'

'তা কেন? তার তো একটা বাড়ি আছে। মা, দাদা আছে।'

'ও। তাহলে তোমরাই মদত দিয়েছ। মেয়ের মতো ননদকেও সর্বনাশের পথ দেখাচ্ছ।' এটুকু বলে ফোন ছেড়েছিল বড়বোন।

মেজবোন যোগ করেছিল এর সাথে, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বউদি। নীপা ওইসব কাণ্ড করল তারপর খুকীকে দিয়ে থানা পুলিশ করালে! শ্বশুরবাড়িতে ছি ছি পড়ে গেছে। শ্বাশুড়ি বললেন, দ্যাখো বউমা, তুমি আবার থানায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ডায়েরি কোরো না। ওই বাড়ির মেয়ে বলে আমাকে তো ভয় পেতেই পারে। নাঃ। এরপরে ভুলে যেতে হবে আবার একটা বাপের বাড়ি আছে। মা আছে বলে যাই, ফোন করি। তা তাকে তো শালগ্রামশিলা করে রেখে দিয়েছ।'

গৌরী এই দুটো ফোনের কথা কাউকে বললেন না। বলে সবার মন খারাপ করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

বিকেলে টোটা এল দেখা করতে। দুদিন বাবার কথায় বাধ্য হয়ে বাড়িতে বন্দি ছিল সে। তারপর বেরিয়েছে, আগের মতো ঘুরেছে। কেউ তাকে কিছু বলেনি। নীপাকে ফোন করার কথা ভেবেছিল কিন্তু বিরক্ত করা হবে বলে করেনি। নীপা রেখে রেগে গেল, 'তোর বুদ্ধি কোনোদিন ম্যাচিয়োর করবে না। তুই ফোন করলে আমি বিরক্ত হব? আমি তোকে ফোন করতে পারছি না তোর বাবার জন্যে।'

বিল্টু দত্তের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে জামিন পেয়ে গেছে এই তথ্য টোটার জানা ছিল না। কাগজ বের হয়নি। তারপর যখন শুনল ছেলেটা এই বাড়িতে ক্ষমা চাইতে এসেছিল

তখন অবাক হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে বলল, 'সেকি রে! ওই ভয়ঙ্কর ছেলেটা তোদের এখানে ক্ষমা চাইতে এসেছিল? কি কাণ্ড।'

সেই ঘটনাটাও অনেকদিন হয়ে গেল এবং তারপর থেকে আর ওদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না যখন তখন আর ওরা এসব নিয়ে মাথায় ঘামাবে বলে মনে হল না টোটার। হলে তো কিছু না হোক, তাকেই শাসাতে পারত।'

নীপা বলল, 'মা, অনেকদিন বাইরে বের হইনি। আজ টোটার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।'

গৌরী মাথা নাড়লেন, 'একটু বাদেই সন্ধে হবে, এখন না যাওয়াই ভালো।'

'দূর। বেশিদূর যাব না, কফি কাফে-তে আধঘণ্টা থেকে চলে আসব।'

'তোর বাবাকে না জানিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে নীপা।'

টোটা বলল, 'কিছু হবে না। আপনি ওকে না ছাড়েন তাহলে ও সহজ হবে কি করে?'

এইসময় মনীষা এল। গৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ?'

'আমি তো ভালো আছি। তিনি কেমন আছেন?'

'নিজের চোখে দ্যাখো গিয়ে। সারাদিন এঘর ওঘর করছেন। আর কদিনের মধ্যে বাইরে পা বাড়াবেন,' গৌরী বললেন।

টোটা নীপার সঙ্গে বাইরে এল। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে কথা দেওয়ায় গৌরী ছাড়পত্র দিলেন। রাস্তায় নেমে নীপা বলল, 'উঃ, কতদিন পরে রাস্তায় হাঁটছি।'

'এখন যদি ওরা তোকে আক্রমণ করে?'

'এই পাড়ার মধ্যে? দ্যাখ না, কত লোক আমাদের দেখছে।'

'তাইতো!' টোটা বলল, 'তুই নায়িকা হয়ে গেছিস।'

'হ্যাঁ। মিস হান্টারওয়ালি।'

টোটা দেখল একটা মারুতি গাড়ির চালক ওদের দেখে মোবাইলে কথা বলতে শুরু করল। তারপরেই মনে হল লোকটা এমনিতেই কথা বলছিল, সে অযথা সন্দেহ করছে। গল্প করতে করতে মিনিট দশেক হাঁটার পর ওরা কফি কাফেতে চলে এল। ভেতরে ঢোকার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে টোটা সেই মারুতিটাকে দেখতে পেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আবার চলে গেল চোখের আড়ালে।

খচ খচ করতে লাগল ব্যাপারটা। নীপা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে ইশারায় তাকে ঢুকতে বলছে, দরজা কাচের, বন্ধ হয়ে যায় আপনা আপনি। তখন কথা কেন কোনো শব্দই কানে আসে না। আলো ঝলমল, নতুন ও আধুনিক মানে সাজানো কাফে এখন সরগরম। বেশির ভাগই নীপাদের বয়সি। ইংরেজি গান বাজছে। এক কাপ কফির দাম তিরিশ টাকা। কিন্তু স্বাদ অনবদ্য আর পরিবেশে বার্ধক্য নেই।

কফিতে চুমুক দিয়ে টোটা বলল, 'আর বাড়িতে বসে থাকিস না। ভয় করলেই

ভয়, নইলে কিছুই নয়।'

'জ্ঞান দিস না।'

'হাই!' ওপাশ থেকে মিনি পোশাক পরা একটি মেয়ে এগিয়ে এল হাত বাড়িয়ে, 'কনগ্রাটস। তুমি তো নীপা! কামাল করে দিয়েছ।'

হাত হাত মিলিয়ে নীপা বলল, 'এমন কিছু না—!'

'সে দ্যাট।' বলে মেয়েটা ফিরে গেল দলে। টোটা রেগে গেল, 'তাহলে ন্যাকামি করে অভিনন্দন জানাতে আসা হল কেন?'

ওরা যখন কফি শেষ করে ফেলেছে তখন একটি ছেলে ভেতরে ঢুকল। জিনস আর সাদা গেঞ্জি পরনে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সোজা চলে এল ওদের টেবিলে। এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে একটু বসতে পারি?'

টোটা কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর বিল চাইল।

ছেলেটি চেয়ার টেনে বসে বলল, 'নীপা, আমার নাম আবির দত্ত।'

নীপা চমকে তাকাল। এবং তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল। হ্যাঁ, এই সেই ছেলে। কিন্তু এখনকার এই মুখের সঙ্গে সেদিনকার মুখের কোনো মিল নেই। এ যখন এসে দাঁড়িয়েছিল তখন সে চিনতেই পারেনি। আচমকা নীপার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। সে টোটার দিকে তাকাল।'

আবির দত্ত বলল, 'আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম ক্ষমা চাইতে। তোমার কাছে না-চাওয়া পর্যন্ত আমি পাচ্ছি না। আজ যখন তুমি এখানে এসেছ তখন সুযোগটা মিস করতে চাইলাম না। ওয়েল, আই অ্যাম সরি।'

নীপা ঠোঁট কামড়াল। টোটা কথা বলল, 'আপনি কি করে খবর পেলেন?'

'আমার এক বন্ধু দেখতে পায় তোমরা এখানে ঢুকেছ। সেই খবর দেয়।'

'মারুতি গাড়ি, স্টিল কালার?'

'হ্যাঁ।' হাসল আবির, 'তুমি লক্ষ্য করেছিলে?'

'তার মানে এখনও আপনারা আমাদের ওপর নজর রাখছেন?' টোটা রেগে গেল।

'নট অ্যাট অল।' তোমাকে রাস্তায় আচমকা দেখে ফেলে বন্ধুটি। দেখে ফলো করে। তুমি নীপাদের বাড়িতে যাও। আমাকে জানায়। আমি ভাবলাম নীপা তোমার সঙ্গে বেরুলেও বেরুতে পারে। তাই ওকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। ওয়েল, নীপা, সেদিন রাজারহাটে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটার জন্যে আমি লজ্জিত। সিনেমার অনুকরণ করে মজা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক দাম দিতে হল। বাই দ্য বাই, আমি সামনের সোমবারে কানাডায় চলে যাচ্ছি এম বি এ পড়তে। প্লিজ, ফরগেট দ্যাট ইনসিডেন্ট।' আবির উঠল। তারপর কাফে থেকে বেরিয়ে গেল।

'কি বুঝলি?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যা বলল তা যদি ঠিক হয়—!'

'ওর বাবা নাকি বলেছিল বাইরে পাঠিয়ে দেবে ওকে—!'

বিল মিটিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। টোটা দেখল মারুতি গাড়ির কোনো অস্তিত্ব নেই। অনেকটা পথ চুপচাপ হাঁটার পর হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল নীপা।

'হাসছিস যে?'

'সাহস দেখিয়ে কি ভয়ঙ্কর ভয়ে কুঁকড়ে ছিলাম এতদিন।' নীপা বলল।

'হ্যাঁরে। এখন জীবনটা কি স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কিসের?'

'বেল নিয়ে কেউ বিদেশে যেতে পারে?'

'বিল্টু দত্ত সব পারে। আর ওই নিয়ে মাথা ঘামতে চাই না।'

'ছেলেটা কিন্তু খুব ভদ্র ব্যবহার করে গেল।' টোটা বলল।

ওরা বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই দেখল দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি তো নীপা?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনাদের বাড়ির পেছনদিকের দোতলার ঘরে কে থাকেন? বেশির ভাগ সময় জানলার পাশের চেয়ারে বসে থাকেন যিনি!'

'আমার ছোটকাকা। কেন?'

'ওঁকে বলবেন আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন না হাসেন। আমরা পেছনের ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকি। ওঁর হাসির জন্যে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে!' মেয়েটি হাসল।

নীপা টোটার দিকে তাকাল। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের ফ্ল্যাটগুলো পাশাপাশি। তিন বন্ধু তিনটে ফ্ল্যাটে থাকি। প্রত্যেকেই ভাবি উনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ওই হাসির জন্যে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হোক এটা কি ঠিক?'

'নিশ্চয়ই ঠিক না। তবে শুধু হাসির জন্যে যে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় তার আয়ু কি খুব বেশি? আমি নিশ্চয়ই বলে দেব ওঁকে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'একটি কথা—।'

মেয়েটা ফিরে তাকাল।

'যার কথা আপনারা বললেন তিনি হাঁটতে পারেন না। ছেলেবেলায় পোলিয়ো হয়েছিল। হুইল চেয়ার ছাড়া মুভ করতে পারেন না।'

'সেকি?' দুজনেই চমক উঠে একসঙ্গে বলল শব্দটা।

'আপনারা তিনবন্ধু একসঙ্গে আসুন না, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। টিভি দেখা

ছাড়া ওঁর আনন্দ পাওয়ার কোনো উপকরণ ছিল না। এখন বোধহয় আপনাদের দিকে তাকিয়ে হেসে খুশি হন। তবে মানুষটির খুব ভালো। আসবেন?'

'না—না। থাক। আচ্ছা, চলি।' ওরা পা বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলেই ঘুরে দাঁড়াল, 'শুনুন।'

নীপা তাকাল।

'প্লিজ এসব কথা, মানে আপনাদের কাছে যে কমপ্লেন করেছি, ওঁকে বলবেন না। ওঁকে ওর মতো থাকতে দিন।' দ্রুত চলে গেল মেয়ে দুটো।

নীপা টোটার দিকে তাকাল। টোটা বলল, 'যেই শুনল তোর কাকা হ্যান্ডিক্যাপড অমনি ওরা বদলে গেল।'

'নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করল। করে সহানুভূতি দেখাল। আবিরের মতো।'

'তার মানে?'

'আমাদের ক্ষমতা নেই ওদের সঙ্গে লড়বার, শাস্তি দেওয়া অসম্ভব, এটা বুঝে যাওয়ার পর উদারতা দেখিয়ে ক্ষমা চেয়ে মহৎ হতে চাই। ছোটকা শারীরিক প্রতিবন্ধী আর আমরা নাগরিক প্রতিবন্ধী। আয়।'

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল নীপা।

একটি ডলফিনশিশু এবং বলরামের বউ

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আকাশে মেঘ দেখে তথাগত ঠিক করলেন একটি লাইনও লিখবেন না। প্রত্যেক দিন লেখার টেবিলে তার সাত-আট ঘণ্টা কেটে যায়। লিখতে বসলেই লেখা হুড়মুড়িয়ে আসে না তাঁর কলমে। ভাবতে হয়, কাটাকুটি, পাতা ছিঁড়ে ফেলা এসব তো আছেই। কলকাতা থেকে প্রকাশক ফোন করেছিলেন, বইমেলার এক মাস আগে বই বাজারে ছাড়বেন। অতএব যত তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পাণ্ডুলিপি পৌঁছোবে তত কাজটা সহজ হবে। বলেছেন, দু-চারদিনের মধ্যে উপন্যাসটার নাম যদি বলে দেন তা হলে এখনই আর্টিস্টকে প্রচ্ছদ আঁকতে দিয়ে দিতে পারি। এরা এত দেরি করে আঁকে যে সমস্যায় পড়তে হয়।

প্রকাশক জানেন যে তথাগত উপন্যাস শেষ করে দু'তিনদিন ভাবেন নাম নিয়ে। সঞ্চয়িতা হাতড়ান। শব্দ খোঁজেন। জীবনানন্দও বাদ দেন না। কোনও একটা শব্দ মনে লেগে গেলে সেই শব্দ ভেঙে আচমকা একটা নতুন শব্দ তৈরি হয়ে যায়। তখন আর নামকরণ করতে কোনোও অসুবিধে নেই। লেখা শেষ হওয়ার আগেই এমন অনুরোধ করলে তিনি যে অস্বস্তিতে পড়বেন জেনেও কেন করা?

ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে নিজে চা বানিয়েছেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে হালকা মনে টেবিলে বসার আগে জানলার সামনে যেমন রোজ দাঁড়ান তেমনি দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল আজ। সমুদ্রের রং কালচে। মাথার ওপরের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। সে-কারণেই সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন একটু বেশি নাচানাচি করছে। এসব দেখার পর আর লিখতে ইচ্ছে হল না তার। বেরিয়ে এসে বারান্দার ডেক-চেয়ারে বসলেন তিনি।

সমুদ্রের চেহারাটা দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল তথাগতর। টিলার গায়ে এই বাংলো-বাড়িতে এসেছেন মাস দশেক হল। প্রায় সবকটা ঋতুকেই এই চেয়ারে বসে দেখে গেছেন তিনি। কিন্তু রাগি বাইসনের মতো মনে হয়নি কখনও ঢেউগুলোকে। আধ-মাইল দূরে যে জেলেদের গ্রাম, যেখানকার যুবকরা সারারাত মাছ ধরে সকালে ফিরে এসে তুলে দেয় পাইকারদের হাতে, তারা কি সমুদ্রে গিয়েছিল? ঘরের ভেতর থেকে দূরবিনটা নিয়ে এসে চোখের ওপর তুললেন। অন্য দিন, রোদ বা ছায়া থাকলেও, সমুদ্রের অনেকটাই এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। আজ মনে হল আকাশ খুব কাছাকাছি সমুদ্রে মিশে গেছে।

কটকের বিশ্বনাথ ঢড়ের বাংলো এটা। বিশ্বনাথবাবু বড় ব্যবসায়ী নন, অত্যন্ত অভিজাত ব্যক্তি। ইংরেজি, ওড়িয়া এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠকও। বছর পাঁচেক

আগে কটকে প্রজাপতি পত্রিকার বিষুব মেলা উৎসবে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যোগাযোগ রাখতেন ভদ্রলোক। এই বাংলোর কথা জানতে পেরে ভাড়া নিয়ে থাকতে চাইলে এককথায় রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ভাড়াটা তাঁকে টাকায় না দিয়ে এই বাংলো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করতে হবে ওই শর্ত দিলেন। দশ মাস তাই করে আসছেন তথাগত। জল, বিদ্যুৎ, পরিষ্কার করার লোকের পেছনে যা খরচ হয় তা নামমাত্র। কিন্তু বাংলোটি অসাধারণ। উঁচু টিলার গায়ে বাংলো। ও পাশে বালি-পাথরের আড়াল, এ পাশে সমুদ্র। পেছন দিক দিয়ে রাস্তা নেমে মিশেছে পিচের পথে। সমুদ্র অন্তত চল্লিশ ফুট পায়ের নীচে।

হঠাৎ হাওয়া বইল। বাড়তে বাড়তে রেগুলেটার ফুল স্পিডে নিয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি শোঁ শোঁ আওয়াজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূখণ্ডে। মজবুত বাংলোটা একটু নড়ে উঠল বলে মনে হল তথাগতের। এবং তারপরেই তিনি দৃশ্যটি দেখলেন। এতক্ষণ যে ঢেউগুলো রাগে ফুঁসছিল সেগুলো আচমকা গুটিয়ে গিয়ে বড় হতে হতে যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। তারপর তীব্র গতিতে ছুটে এল এক পাড়ের দিকে। নড়ে উঠল বাংলো থরথরিয়ে। ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পারলেন তথাগত।

ভয়ঙ্কর শব্দে সেই ঢেউ ভেঙে পড়েছে বাংলোর দুপাশের জমিতে। সেটাকে টপকে ঢুকে পড়েছে ওপাশে। একটা নয়, বারবার ধেয়ে আসতে লাগল ওরা। চল্লিশ ফুট উঁচুতে ছুড়ে মারতে লাগল জল প্রবল আক্রোশে। শেষ পর্যন্ত একটা ঢেউ এত ওপরেও উঠে এল তীব্র গতিতে। বাংলোর পিলারগুলো থর থর করছে এবার। তথাগত এইবার ভয় পেলেন। মনে হল মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ সমুদ্র গ্রাস করবে পৃথিবীকে। কোনও মানুষকে নোয়ার মতো পৃথিবীর সব প্রাণীদের নিয়ে জাহাজ ভাসানোর অবকাশ দিল না। দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই বারান্দা পেরিয়ে জল ধাক্কা মারল দরজায়। গলে এল ঘরে। তথাগত দৌড়ে পেছন দরজায় এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। নীচের রাস্তা, ওপারের চালাঘরগুলো এখন জলের তলায়। এই বাংলো থেকে নেমে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। শোঁ শোঁ শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। সাঁতার জানলেও কোনও মানুষের পক্ষে ওই জলে নামা সম্ভব নয়। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। নড়বড়িয়ে উঠল বাংলো, তারপর একপাশে কাত হয়ে গেল। কোনও মতে দরজা ধরে নিজেকে সামলে নিতে পারলেন তথাগত। আবার ফিরে গিয়ে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াবার সাহস তাঁর হল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন আর একটা বড় ধাক্কা পেলেই বাংলোটা চল্লিশ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়বে। দরজার এপাশের দেওয়ালে একটা রাবারের টিউব ঝুলছিল। বাংলো কাত হয়ে গেলে সেটা মেঝের ওপর পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল ঢালুর দিকে। হাওয়া ভর্তি বড় টিউবটাকে তুলে নিলেন তথাগত। এরকম টিউব চড়ে অনেকেই সমুদ্রে স্নান করে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে টিউবটাকে শরীরের মধ্যভাগে নিয়ে এসে তৈরি থাকলেন তিনি। বাংলো জলে পড়লেই তিনি বাঁচার জন্যে চেষ্টা করবেন এর

সাহায্যে। এই মুহূর্তে তাঁর মনে টাকাপয়সা, জামাকাপড় তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপির কথাও মনে এল না।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন তথাগত। চরাচর ভাসিয়ে যে জল ফুঁসছিল তারা ফণা গোটাল। তার পর হু হু করে ফিরে যেতে লাগল সমুদ্রের দিকে। তার টানে ভাঙাচোরা গাছপালা থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস ধেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হতে। একসময় জল চলে গেলে আঁতকে উঠলেন তথাগত। পিচের পথটায় বিশাল বিশাল গর্ত, মনে হচ্ছে কেউ যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কোনও গাছপালা কখনও যেন এখানে ছিল না। বালির ভেতর বড় বড় গর্ত এবং সেখানে সমুদ্রের জল জমে আছে।

কোনও মতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন তথাগত। যত দূর চোখ যাচ্ছে শুধু সমুদ্রের তাণ্ডবলীলার স্মৃতি। এবং তখনই তাঁর চোখে পড়ল, টিলার ওপরের অংশ যা বাংলোর গায়ে ছিল তা ভেঙে পড়েছে বাংলোর ওপরে। পড়ার ফলে বাংলোটা আটকে গেছে শক্তভাবে।

ওপরে উঠলেন তিনি। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে গিয়ে দেখলেন বিদ্যুৎ নেই। থাকাটাই যে অস্বাভাবিক হত তা তিনি বুঝে গেছেন। ঘরে যে জল ঢুকেছিল তা এর মধ্যে বেরিয়ে গেলেও মেঝে ভিজে চপচপ করছে। তাঁর জুতো জোড়াকে দেখতে পেলেন না। বাইরের ঘরে, যেখানে বসে তিনি লেখেন, সেখানে পৌঁছে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লেখার টেবিলটা উলটে পড়েছে মেঝেতে। যাবতীয় কাগজ, এমনকী লেখা হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলপির ফাইলও সেখানে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত দিতেই বুঝলেন, সব শেষ হয়ে গেছে। জলের তলায় কিছুক্ষণ থাকায় কাগজগুলো প্রায় কাদার পর্যায়ে চলে এসেছে।

যেভাবে অসুস্থ শিশুকে মায়েরা কোলে তুলে নেন, ঠিক সেইভাবে পাণ্ডুলিপির ফাইলটা তুললেন তথাগত। সেটাকে চেয়ারের ওপর রেখে টেবিলটাকে সোজা করে ফাইল খুললেন। ওপরের মোটা কাগজই ভিজে এত নরম হয়ে গেছে যে খুলতেই খসে গেল। আশিটি ফুলস্কেপ পাতা এখন জড়িয়ে আছে গায়ে গায়ে। ওপরের পাতার কালি জলে ভিজে ঝাপসা করে দিয়েছে লেখাগুলো।

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলেন প্যাকেটটাকে। সযত্নে একটা একটা পাতা তুলে খাটের ওপর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। জলে ঝাপসা হয়ে গেলেও চেষ্টা করলে পড়া যাবে অক্ষরগুলো। শুকিয়ে যাওয়ার পরে কী অবস্থা হয় তাই দেখার। এত দিনের পরিশ্রম, ভাবনা সব এক নিমেষেই খেয়ে ফেলল সমুদ্র। যে ছিল চল্লিশ ফুট নীচে সে এমন সর্বনাশ করবে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পরেননি তথাগত। আশিটি পাতাকে খাট জুড়ে আলাদাভাবে রাখা সম্ভব নয়। কোনও কোনওটা একটু ওপর ওপর রইল। করুণ চোখে নিজের সৃষ্টির প্রায় ধ্বংসাবশেষ দেখতে লাগলেন তথাগত।

সহ্য হল না তাঁর। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। এসেই অবাক হয়ে

গেলেন। মেঘ এখনও রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা উধাও। জল নেমে গেছে যেখানে রোজ থাকে। একেবারে শান্ত ভঙ্গিতে ঢেউগুলো নড়াচড়া করছে এখন। মাঝেমাঝে গড়িয়ে এসে চল্লিশ ফুট নীচে বালিতে আছড়ে পড়েই নিস্তেজ ভঙ্গিতে ফিরে যাচ্ছে আবার। কে বলবে এই সমুদ্রই কিছুক্ষণ আগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল এবার। হঠাৎ তথাগত দেখতে পেলেন বারান্দার সামনে বালিতে মাঝারি আকারের গর্তে যে জল জমে গেছে সেখানে কিছু একটা ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে চোখ বড় হয়ে গেল তাঁর। ওটা যে ডলফিনের বাচ্চা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাচ্চাটার বয়স দিন সাতেকের বেশি নয়। এখনও ভালো দৃষ্টিশক্তি হয়নি। ওই অল্প জলে সে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাংলোয় ঢুকে কোদাল খুঁজতে লাগলেন তথাগত। ছোট্ট স্টোররুমে ওধরনের জিনিস দেখেছিলেন আগে। আজ পেয়ে গেলেন। বারান্দার নীচে বালিতে একটা বেশ বড় গর্ত খুঁড়লেন তিনি। কলে জল আছে এখনও। অর্থাৎ ওপরের ট্যাঙ্কের জল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জল পাবেন খাওয়ার জন্যে। কিন্তু এই শিশুটিকে বাঁচাতে সমুদ্র থেকে যদি জল বয়ে আনতে হয় তা হলে যে সময় যাবে ততক্ষণ কি ডলফিনটা বাঁচবে? তারপরেই খেয়াল হল, বেচারা জন্মেছে লোনা জলে। ট্যাঙ্কের মিষ্টি জল ওর পছন্দ হবে তো? সেই জলে সামুদ্রিক প্রাণী বাঁচবে কি না সেটাও জানা নেই।

তবু ট্যাঙ্কের জল কল থেকে বের করে সদ্য খোঁড়া গর্তে ঢাললেন তথাগত। তারপর সন্তর্পণে তুললেন ডলফিন শিশুকে। স্পর্শ পাওয়ামাত্র বেচারা স্থির হয়ে গেল। দেখা বা দেখার মধ্যে না গিয়ে মুখ নামাল। দ্রুত ওকে বড় গর্তে নামিয়ে দিলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল প্রাণীটি। তারপর হঠাৎই যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। ওর শরীরের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা আছে এই গর্তে। তথাগত লক্ষ করলেন, ডলফিনশিশুর শরীরের বাঁ দিকে একটু থেঁতলে যাওয়ার দাগ আছে। ওই দিকটা বেচারা নাড়তে পারছে না। সমুদ্রের ঢেউ এতটা ওপরে ওকে তুলে দেওয়ার সময় নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছিল।

এর চিকিৎসা কীভাবে করা যায় ঠাওর করতে পারলেন না তিনি। তারপর উঠে গেলেন ঘরে। একজন ডাক্তার, যদিও মানুষের ডাক্তার, মাইল দশেক দূরে থাকেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যেতে পরে। রিসিভার কানে চেপে ডায়াল করতে যেতেই থেমে গেলেন তিনি, ডায়াল টোন নেই। টেলিফোন একেবারে মৃত।

অর্থাৎ আলো নেই, টেলিফোন নেই। জল যা ওপরের ট্যাঙ্কে আছে তা বেশি ব্যবহার না করলে দিন দুইতিন চলবে।

আহত ডলফিনশিশুর সুস্থতা প্রকৃতির ওপর ছেড়ে না দিয়ে কোনও উপায় নেই। ভাগ্যিস মাথায় চোট পায়নি, তা হলে আর এমন ফুর্তিতে সাঁতার কাটতে হত না। কিন্তু ডলফিনরা খায় কী? ফ্রিজ থেকে দুধ বের করলেন তথাগত। কাজের লোকটি সাতসকালে আসে না। আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। বেঁচে আছে কি না

সন্দেহ। গতকালের এনে দেওয়া দুধ পেয়ালায় ঢেলে চামচ দিয়ে তথাগত চলে এলেন ডলফিনশিশুর কাছে। ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে ছিল সে। তাকে দেখামাত্র এই দিকে মুখ ঘোরাল। বালির ওপর বসে দুধের কাপ রেখে ডান হাত বাড়াতেই সরে গেল ডলফিনশিশু। তথাগত কথা বললেন, 'আয়, কাছে আয়, তোকে দুধ খাওয়াব। আয়।' ডলফিনশিশু দূরে সরে গিয়ে পাক খেতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে ওকে হাতের নাগালে পেলেন তথাগত। ধীরে ধীরে জলের ধারে নিয়ে এসে মুখটাকে উঁচু করে ধরতেই হাঁ করল। সঙ্গে সঙ্গে এক চামচ দুধ ওর মুখে ঢেলে দিয়ে অপেক্ষা করলেন একটু, দুধটা গিলে ফেলল ও। ছেড়ে দিতেই দূরে সরে গেল কিন্তু ফিরে এল আরও দ্রুত। এসে হাঁ করল। এবার না ধরে দু চামচ দুধ ঢেলে দিলেন ওর মুখে। তথাগত হাসলেনও, মানবশিশুর সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু যেমন মুখে খাবারের গ্রাস নিয়ে টলেমলে পায়ে দৌড়ে পালাতে চায় এও তেমনি করছে। ধীরে ধীরে পেয়ালার দুধ শেষ হয়ে গেল। ওর পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট কিনা বুঝতে পারলেন না তথাগত। এখানে ডলফিনদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কিনা খোঁজ নিতে হবে। ওদিকে ফিশারিজ বিভাগের দপ্তর আছে, ওরা নিশ্চয়ই কিছু খবর দিতে পারবে।

খোলা আকাশের নীচে ডলফিনশিশুকে রেখে দেওয়া কি ঠিক হবে যদিও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু যে কোনও মুহূর্তেই জোর বর্ষণ হতে পারে। তা ছাড়া বড় বড় পাখিও জুটে যেতে পারে। বাংলোর ওপাশে খসে পড়া একটা বড় টিনে টেনে এনে এমন ভাবে গর্তের ওপর চাপা দিলেন যাতে ভেতরে বাতাস স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে।

একটা ছাতি নিয়ে কোনওমতে রাস্তায় নামলেন তথাগত। কিন্তু রাস্তা কোথায়? যেদিকে তাকান শুধু দুমড়ে যাওয়া প্রকৃতি। সমুদ্রের ঢেউ স্থলভূমির ছালচামড়া ভয়ঙ্কর শক্তিতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। সেই চালাঘরগুলো নেই। গর্ত বাঁচিয়ে কোনওমতে সিকি মাইল হেঁটে আসার পরে একটা বিশাল বটগাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় গোটা চারেক মানুষকে দেখেতে পেলেন তিনি।

কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকির পরেও ওদের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে তাঁর শরীর কেঁপে উঠল। ওদের কেউ জীবিত নেই। জল ওদের ওই ওপরে ছুড়ে দিয়েছিল। প্রাণহীন শরীরগুলো আটকে আছে গাছের ডালে। গাছটাও হেলে পড়েছে একদিকে। গুঁড়ির ওপরে কিছুটা জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে।

তথাগতর মনে হল তিনি এখন মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে আছেন। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা গর্জন ছাড়া কোথাও কোনও প্রাণের ইঙ্গিত নেই।

ধীরে ধীরে ফিরে এলেন বাড়িতে। আসার পথে কিছু মাছ চোখে পড়ল। ছোট ছোট পারশে, তপসে। ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে এসেছিল, ফিরে যেতে পারেনি। এখনও টাটকা রয়েছে। ফিরে এসে বাংলো থেকে ব্যাগ নিয়ে মাছগুলোকে সংগ্রহ করলেন

তথাগত। ছুরি দিয়ে পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফ্রিজে ঢোকাতে গিয়ে খেয়াল হল, বিদ্যুৎ নেই, আর কিছুক্ষণ বাদেই ফ্রিজের ভেতরটা গরম হয়ে যাবে। তখন ওই মাছগুলোকে আর খাওয়া যাবে না।

অতএব এক প্লেট মাছ ভেজে নিয়ে লাঞ্চ সারলেন তিনি। দুটো সিলিন্ডার ভর্তি গ্যাস আছে কিচেনে। আগুন জ্বেলে রান্না করার সমস্যা নেই। আছে চাল আর আলু পেঁয়াজ। ডালও কিছু থাকা উচিত। অর্থাৎ তাঁর নিজের খাওয়া নিয়ে কোনও চিন্তা আপাতত নেই।

সমস্যা হবে এই ডলফিনশিশুর। টিনের আড়াল সরাতেই শিশুটি চলে এল তাঁর কাছে। এখন ওর মায়ের পেটের সঙ্গে সেঁটে থাকার কথা! মা যা করবে তাই নকল করবে এখন থেকে। ওই বিশাল সমুদ্রে মা কোথায় আছে, আদৌ আছে কি কে জানে! তিনি ফিশফিশ করে ডাকলেন, 'ফিন, ফিন।' সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি পাক খেয়ে চলে গেল ওপাশে।

তথাগত লক্ষ করলেন গর্তের জল অনেকটা কমে গেছে। বালি শুষে নিচ্ছে। আগে জল ভরে দেওয়া দরকার। তিনি উঠতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। বড় বড় ফোঁটা থেকে বাঁচতে দৌড়ে কাত হয়ে থাকা বারান্দার ছাদের নীচে চলে এলেন। বৃষ্টি আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র চলে গেল সাদা পর্দার আড়ালে। বারান্দায় ছাদের একপাশ দিয়ে জল ঢুকছে ভেতরে। তাঁর পক্ষে এখনই সারানো সম্ভব নয়। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা এল। বাংলোয় ছোট বড় যত পাত্র ছিল, এমন কী একটা বড় ড্রামও, বৃষ্টির জল ভরার কাজে লাগালেন। ড্রামের ভেতরটা পরিষ্কার করার মতো জল জমতে মিনিট পাঁচেক লাগল। খুশি হলেন তথাগত। ওপরের ট্যাঙ্কের জল শেষ হয়ে গেলেও এই জল কিছুদিন তাঁকে সাহায্য করবে। বৃষ্টির জল ফুটিয়ে নিলে খেতে তো অসুবিধে নেই।

এই তুমুল বৃষ্টি বেশিক্ষণ দেখতে ভালো লাগল না। ঘরে ঢুকে দেখলেন এখনও ছাদ থেকে জল পড়েনি। তাঁর লেখাগুলো নেতিয়ে পড়ে আছে খাটের ওপরে। শুতে গেলে ওগুলো সরাতে হবে। সেই পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করল না। বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিতে মনে হল এর চেয়ে আরাম আর কিছুতেই নেই। বড্ড বেশি পরিশ্রম করেছেন আজ, অনেকদিন বাদে। কিন্তু আজ এরকম হল কেন? সমুদ্র এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ধ্বংস করে গেছে সব এমন ঘটনার কথা কি আগে শুনেছেন? মনে পড়ছে না তার। এই তল্লাটে একমাত্র টিলার ওপর বাংলো এইটে। আর সবাই থাকেন সমুদ্রের লেভেলে। জোয়ারের সময় জল যত দূর ওঠে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু আজ যদি চল্লিশ ফুট উঁচুতে ঢেউ ডলফিনশিশুকে ছুঁড়ে দিতে পারে তা হলে মাইলের পর মাইল জনপদ এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই স্বাভাবিক। ওই যে জেলে বস্তি, বাসস্ট্যান্ডের পাশের দোকানপাট, মাছের আড়তগুলো, ও পাশের গ্রাম—ভাবতে পারছিলেন না তথাগত। ওই গ্রাম থেকে হেঁটে আসত বলরাম। তাঁর

সংসারের প্রায় সব কাজ শেষ করে দুপুরের খাবার নিয়ে গ্রামে ফিরে যেত। লোকটার ব্যবহার দেখে খুশি হয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন তিনি, খুব খুশি হয়েছিল বলরাম। কিশোর বয়সে বিয়ে করেছিল সে বাড়ির চাপে। ভগবানের আশীর্বাদে বাচ্চা হয়নি। একথা ও নিজেই বলে। 'ভাগ্যিস হয়নি নইলে কী খাওয়াতাম তাকে!'

তথাগতর মনে হল তিনি আর বলরামকে দেখতে পাবেন না। ওর গ্রাম এখন নিশ্চিহ্ন। বলরাম বলেছিল, 'বাবু, আপনি যখন কলকাতায় ফিরে যাবেন আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'আমি তো আর কখনও কলকাতায় ফিরব না বলরাম।'

'সত্যি! তা হলে আর আমার কোনও চিন্তা নেই।'

মানুষ কেন চিন্তা করে ভবিষ্যৎ ভেবে? কোনও মানে হয়? অনেক কিছু ভেবে যদি কেউ সিদ্ধান্ত নেয় এইভাবে বাকি জীবন কাটাবে সেভাবে কি কাটাতে পারে? এক লহমায় মৃত্যু তাকে তুলে নিয়ে সেই চিন্তার আর কি মূল্য থাকছে!

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার আগেই একটা স্যাঁতসেতে সন্ধ্যা হুড়মুড়িয়ে এসে যেতেই ঘরদোর অন্ধকার হয়ে এল। আলো জ্বালতে গিয়েই হাত নামালেন তথাগত। সেই সাতসকালেই কারেন্ট গিয়েছে। খুঁজে খুঁজে কয়েকটা মোমবাতি পেয়ে গেলেন। এগুলো বলরামই বাসস্ট্যান্ডের পাশের দোকান থেকে এনেছিল। মোমবাতি জ্বালালেন তিনি। আলো হল, সেই সঙ্গে ছায়াও কাঁপতে লাগল।

রান্নাঘরে মোমবাতি নিয়ে গিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে প্যাকেট থেকে তৈরি রাখা নুডল বের করে জলে ফুটিয়ে নিতেই খাবার হয়ে গেল। মশলা ছড়িয়ে চামচ দিয়ে খেতে খেতে মনে পড়ল ফিন-এর কথা। বেচারা সেই কখন এক কাপ দুধ খেয়েছে। খিদের জ্বালায় নিশ্চয়ই ছটফট করছে এখন। কয়েকটা নুডল প্লেট থেকে সরিয়ে জলে ধুয়ে নিলেন তিনি। তারপর ছাতি মাথায় এক প্লেট নুডল আর চামচ নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে নীচে পা রাখলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেলেও একটা আলোর মায়া বাইরের প্রকৃতিতে তখনও রয়েছে। গর্তের কাছে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বৃষ্টির জল গর্তে পড়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ফিন গর্তে নেই। আশেপাশে লক্ষ করতেই দেখতে পেলেন ওকে। ভেজা বালির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দ্রুত ওর পাশে গিয়ে বসতে না বসতেই ভিজে গেলেন তথাগত। হাত দিয়ে বুঝলেন ফিন এখনও মরেনি। ক্রমাগত জল গায়ে পড়ায় শুকিয়ে যায়নি শরীর। ওকে তুলে নিয়ে আবার গর্তে ছেড়ে দিলে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তথাগত ডাকলেন, 'ফিন, ফিন।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। আলোর মায়া চলে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলল ডলফিনশিশু। জলের ভেতর হাত দিয়ে ওকে আদর করলেন তথাগত। তারপর প্লেট থেকে এক চামচ নুডল নিয়ে ওর মুখের সামনে ধরলেন। হাঁ করল ফিন। নুডল মুখে দিতেই গিলে ফেলল আনায়াসে। একটু একটু করে প্লেট খালি হয়ে গেল। তথাগত

বুঝলেন ওর খেতে খারাপ লাগছে না এবং পরিমাণ আর একটু বেশি হলে ভালো হত। পেটে খাবার যাওয়ামাত্র চাঙ্গা হয়ে গেল ফিন। ঝট্ করে একটা পাক ঘুরে এল সে। মুখ তুলে হাঁ করল।

ছাতি ছাড়াই চলে এলেন তথাগত। ফ্রিজ থেকে দুধের বোতল বের করতেই নজরে পড়ল রবারের গ্লাভস দুটোর দিকে। ফ্রিজের ওপর পড়ে আছে। এখনও ব্যবহার করেনি। ওটার ভেতর জল ঢুকিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আঙুলগুলোয় দুধ ভরলেন। তারপর একটা আলপিন দিয়ে আঙুলের ডগা ফুটো করতেই এক ফোঁটা দুধ বেরিয়ে এল।

প্রায়ান্ধকারে গ্লাভসের পাঁচ আঙুলে দুধ চুষে খেয়ে ফেলল ডলফিনশিশু। এই সময় বৃষ্টি থামল। মুখ তুলে তথাগত দেখলেন কেউ যেন ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেঘগুলোকে। গর্ত থেকে খানিকটা জল বের করে টিন দিয়ে চাপা দিলেন তিনি। বাতাস ঢুকবে কিন্তু ফিন চেষ্টা করলেও বেরুতে পারবে না।

একটু হাওয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলেন তথাগত। বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস তাঁর নেই। নির্ঘাত সর্দিজ্বর আসবে। তাড়াতাড়ি মোমবাতি নিয়ে বাথরুমে চলে এসে ভালো করে স্নান সেরে পাজামা পাঞ্জাবি পরলেন তিনি। গায়ে একটা চাদর জড়াতে আরাম হল। তারপর বোতল থেকে হুইস্কি বের করে গ্লাসে ঢাললেন। মনে মনে বললেন, 'এই বস্তুটি পেটে গেলে সর্দিজ্বর পালাবেই।'

গোটা তিনেক হুইস্কি খাওয়ার পর অভ্যেসমতো বারান্দার দরজা বন্ধ করতে এসে থমকে গেলেন তিনি। সামনের আকাশে এখন ময়ূরের গলার রং। কি দারুণ! দূরে সমুদ্রের বুকে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। আর নীচের সমুদ্র পোষা বেড়ালের মতো সেই আকাশে মুখ ঘষছে। সকালের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটির কথা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবে না এখন এই ছবির সামনে দাঁড়ালে। প্রকৃতির কি খেয়ালি খেলা। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলেন তিনি। কিছুক্ষণ দেখার পর বুকের ভেতরটা কিরকম মোলায়েম হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন ওটা আর আগের জায়গায় নেই। ছাদ নেমে আসায় বেঁকে গেছে দরজা। তারপর মনে হল, কেন বন্ধ করছেন? আজ এই রাত্রে এখানে আসার মতো কোনও প্রাণী এই চরাচরে নেই।

ফ্রিজে খাবার ছিল। সেগুলো এখন বিদ্যুতের অভাবে আহারযোগ্য কিনা তা যাচাই করতে ইচ্ছে হল না তথাগতর। কুড়িয়ে এনে রাখা মাছগুলো চটপট ভেজে নিলেন তিনি। তারপর হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে আরামচেয়ারে বসলেন। মোমবাতির শরীর ইতিমধ্যে খাটো হয়েছে কিছুটা।

তথাগত ভাবছিলেন। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিশ্চয়ই মাইলের পর মাইল সমুদ্র তীরে ঘটেছে। মাথার ওপরের ছাদ মোটামুটি ঠিক থাকলেও এখানে আর দু-একদিনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। জল এবং খাবার না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। অতএব কালই রওনা হওয়া দরকার। এখান থেকে প্রতিদিন তিনটি বাস শহর যায় আসে। ঘণ্টা আড়াই লাগে। সেই বাস চলছে কিনা তা স্ট্যান্ডে না গেলে জানা যাবে না।

ট্রেন লাইন মাইল কুড়ি দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি ছিল। সেটা উড়ে গেলে সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যেতে হলে খালি হাতে যেতে হবে। এখানকার জিনিসগুলো নিয়ে তাঁর পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল পাণ্ডুলিপিগুলোর কথা। এতক্ষণে কাগজগুলোর শুকিয়ে যাওয়া উচিত। খুব ইচ্ছে করছিল পাশের ঘরে গিয়ে ওগুলো দেখতে। যতই ঝাপসা হোক, চেষ্টা করে পড়া গেলে পাবলিশার হাতে স্বর্গ পাবে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে সংবরণ করলেন তিনি। ধরা যাক, শুকিয়ে যাওয়ার পর ওগুলো বেশ পড়া যাচ্ছে। এটুকু ভাবলেই আজ রাত্রে স্বস্তি পাচ্ছি। উলটোটা যদি ঘটে থাকে তাহলে খামোখা আজ রাত্রের স্বস্তি নষ্ট করে কি লাভ!

আজ দু-পেগ খেয়েই ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। সারাদিনের টেনশন, পরিশ্রমের ক্লান্তি এবং বৃষ্টিতে ভেজার অনভ্যাস তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। সেই ঘুমের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন, 'বাবু বাবু!'

বলরামের গলা। বেচারা বলরাম! মরে গিয়ে প্রেত হয়েও তাঁর কথা ভুলতে পারেনি। তিনি ঘুমের মধ্যেই বললেন, 'এই যে আমি। কিছু বলবে বলরাম?'

'বাবু! ও বাবু!' এবার গলায় কান্নার আওয়াজ।

প্রেতেরা কি কাঁদে? বলরামের জন্যে খুব কষ্ট নিয়ে নড়ে উঠলেন তথাগত। আরামচেয়ারের দুই হাতলে পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুতেই পায়ে কারও স্পর্শ পেলেন।

'বাবু, আমি বলরাম!'

চোখ খুললেন তিনি। ঘরে মোমবাতির আলো কাঁপছে। তাঁর পায়ের কাছে বলরাম দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে।

'তুমি?'

'হ্যাঁ বাবু!'

'বেঁচে আছ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এখন তো অনেক রাত!'

'জল আসছে দেখে আমি বউকে নিয়ে কাঁঠাল গাছের মগডালে উঠে বসেছিলাম। ঢেউ গাছের নীচের ডালগুলো মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল। অত উঁচুতেও আমাদের গলা পর্যন্ত জল উঠেছিল। তারপর জল নেমে গেলে আর নামতে পারছিলাম না।'

'কেন?'

'নীচে কোনও ডাল ছিল না যে। কাঁঠাল গাছটা যেন নারকোল গাছ হয়ে গিয়েছিল। একটা লোক নেই চারপাশে যে সাহায্য করবে। গাঁকে গাঁ সমুদ্র গিয়ে ফেলেছে বাবু।' ডুকরে কেঁদে উঠল বলরাম।

'তা নামলে কী করে?'

'এই একটু আগে গাছটার মাজা ভেঙে পড়তে আমরা কোনোমতে বালিতে লাফিয়ে পড়লাম। জলের সময় যদি গাছটা ভাঙত তাহলে—!'

'আমরা মানে?'

'আমি আর আমার বউ।'

'ও।'

'বাবু। আপনার কোনও বিপদ হয়নি তো?' বলরামের গলায় উদ্বেগ।

'হলে কি আমাকে দেখতে পেতে।' উঠে দাঁড়ালেন তথাগত। বলরামের পেছনে একটা লম্বা শরীর, মুখ ঘোমটায় ঢাকা। শাড়িটিতে কাদা শুকিয়ে আছে।

'নিশ্চয়ই না খেয়ে আছ?'

'খাবার কোথায় পাব বাবু! চারধার শ্মশান।'

'হুঁ। বাইরে বৃষ্টির জল ধরা আছে। গ্যাস জ্বেলে ভাত আলু ফুটিয়ে নাও। আজ রাত্রে বারান্দায় শোও তোমরা। আমার শোওয়ার ঘরে জায়গা নেই।'

'আয়।' বলে বউকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল বলরাম।

ঘণ্টা বারোর বেশি যারা গাছে ঝুলে ছিল প্রাণভয়ে তারা এত স্বচ্ছন্দে হাঁটে কী করে! তথাগত আবার হুইস্কি নিলেন। প্রত্যেক মাসে শহরে গিয়ে দশটা বোতল কিনে নিয়ে আসেন তিনি। এখনও যেমন খেয়েছেন তেমন খেলে দিন পনেরো চলবে। তারপর? হাসলেন তথাগত। আজকের রাতটায় তুমি বেঁচে আছ, তাই আজকের কথাই ভাবো। সব ঠিকঠাক থাকলে খুশি হও। কালকের ভাবনা কালকে ভাবা যাবে।

ভোর হতে না হতে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন তথাগত। এরকম ভঙ্গিতে শোওয়ার অভ্যেস তাঁর নেই। ফলে পিঠে কোমরে একটু ব্যথা বোধ হল। এখনও আলো তার সঠিক চেহারা নেয়নি। আতপ চালের গুঁড়ো জলে গুলে যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর ওপর। তথাগত বেরুতে গিয়ে থমকে গেলেন। বারান্দার একপাশে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে বলরাম। মুখ হাঁ করা। পা ছড়ানো। ওপাশে ওর বউ কাত হয়ে রয়েছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে গর্ত চাপা-দেওয়া টিনের কাছে এলেন। পায়ের নীচে তো বটেই, আশেপাশের বালি ভিজে রয়েছে।

টিনের আড়াল তুললেন তথাগত। গর্তের জল কমে গেলেও ফিনের শরীর ডুবিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। স্থির হয়ে ছিল সে। তথাগত যেই ডাকলেন, 'ফিন, ফিন' অমনি নেচে উঠল যেন। কিন কিন আওযাজ তুলে গর্তের ধারে এগিয়ে এসে হাঁ করল ফিন। ওর মাথায় হাত বোলালেন তথাগত, 'খিদে পেয়েছে? কিন্তু তোর দুধ তো আর একটুখানি ফ্রিজে পড়ে আছে! নুডল খাবি?'

মাথা ঘষে তথাগতর হাতে আদর করল ফিন।

সমুদ্রের দিকে তাকালেন তথাগত। সমুদ্র এখন স্থির। মৃদু বাতাস আঁচড়ে যাচ্ছে তার জল। এই বিপুল জলরাশির কোথাও নিশ্চয়ই ফিন-এর মা খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্তানকে। কিন্তু ওকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেই যে মায়ের কাছে পৌঁছোতে পারবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওই শিশু অন্য কোনও প্রাণীর আক্রমণের লক্ষ্য হলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

'বাবু! এটা কী?' বলরামের গলা পেছন থেকে ভেসে এল।

'এটা একটা ডলফিনের বাচ্চা। কাল সমুদ্র ওকে তুলে আমার এখানে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। আমি ওর নাম দিয়েছি ফিন।'

'এই এখানেও জল উঠেছিল?' হাঁ হয়ে গেল বলরাম।

'হ্যাঁ। জল না, ঢেউ উঠছিল ছোবল মেরে। ওই দ্যাখো, বারান্দার ছাত কাত হয়ে আছে। কাল তোমরা ভাত খেয়েছিলে?'

হ্যাঁ বাবু।'

'হাঁড়ি পরিষ্কার করে খেয়েছ না কিছু পড়ে আছে?'

'বেশি খেতে পারনি বাবু, অনেকটা থেকে গেছে।'

'বাঃ। এক প্লেট ভাত জল দিয়ে ভিজিয়ে একটা চামচ সমেত নিয়ে এসো তো।' তথাগত উবু হয়ে বসলেন গর্তের পাশে, একটা পাক খেতে খেতে ফিন শব্দ করল, 'কিন।' তথাগতর খেয়াল হল, কোথায় পড়েছিলেন, ডলফিন গান গাইতে পারে ওদের মতো করে। মানুষের ন্যাওটা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

ভাত নিয়ে এল বলরাম। তথাগত ফিনের মুখ ধরতে গেলে সে হাঁ করল। অতএব এক চামচ ভাত সেই হাঁ মুখে ঢেলে দিলেন তিনি, 'আস্তে খাবি।'

গপগপ করে গিলে ফেলল ফিন। আর একবার জলে পাক দিয়ে এসে হাঁ করল। বলরাম মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, 'এ ভাত খায়?'

'সমুদ্রের ভেতর ও ভাত পাবে কোথায়? মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স এখন। আমাদের বোতলের দুধ তো শেষ। কাল রাত্রে নুডল দিয়েছিলাম, খেয়েছিল। তাই এখন ভাত দিচ্ছি। নরম খাবার হলে গিলতে পারবে সহজে।'

প্লেটের ভাত শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে বলরামকে তথাগত বললেন এক বালতি বৃষ্টির জল গর্তে ঢেলে দিতে। এইসময় খসখসে গলা ভেসে এল, 'হয়ে গেছে।'

'নিয়ে আয়। বাবুর কাছে লজ্জা কিসের। এক কাপ চা খেয়ে বাবু বাথরুমে যায়। নিয়ে আয় এখানে।' বলরাম হুকুম করল।

হেসে ফেললেন তথাগত। এক হাতে চায়ের কাপডিশ, অন্য হাতে ঘোমটার প্রান্ত গলার নীচে ধরে বলরামের বউ বারান্দা থেকে নামছে, হোঁচট খেয়ে পড়ল বলে।

'তুমি তো পড়ে যাবে। পথ দেখে হাঁটো।' বললেন তিনি।

'বললাম এত লজ্জার কিছু নেই। দিনভর যখন গাছে ঝুলছিলি তখন তোর মাথায় ঘোমটা ছিল? তখন তো মরতে বসেছিলি।' বলরাম খেঁকিয়ে উঠল।

ঘোমটা চিবুকের কাছে উঠল।

চায়ের কাপ নিয়ে তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বউ-এর নাম কী?'

বলরাম বলল, 'নাম বল।'

'লক্ষ্মী।' ঘোমটার আড়াল থেকে খসখসে গলা ভেসে এল।

চায়ে চুমুক দিলেন তথাগত। ভেবেছিলেন খাওয়া যাবে না কিন্তু ততটা খারাপ

লাগল না। তথাগত বললেন, 'বলরাম, বাড়িতে যা আছে তাতে কটা দিন চলতে পারে। তারপর তো এখানে থাকা যাবে না। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমরা কী করবে ভেবে দ্যাখো। তোমাদের ঘর --!'

'কিছু নেই বাবু। একেবারে মাটি হয়ে গেছে।'

'তাহলে?'

'বাবু আপনি এখান থেকে যাবেন না। আমি যেখান থেকে পারি সব জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসব। দরকার হলে সাইকেলে শহরে চলে যাব। আমি একা থাকলে, দিকবিদিকে চলে যেতাম। কিন্তু গলায় তো কাঁটা বিঁধে আছে। ওকে নিয়ে কোথায় যাব বলুন!' কাতর গলায় বলল বলরাম।

পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটা পাতায় পাতলা কালির আড়ালে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট। অনেকক্ষণ ঠাওর করলে তবে বোঝা যায় কী লেখা হয়েছে। এখন এগুলো নিয়ে বসার কথা ভাবতেই পারছেন না তথাগত। বইটা যদি মেলায় না বের হয় তাহলে তাঁর কিছু করার নেই। কাগজগুলোকে গুছিয়ে রাখলেন তথাগত।

সাড়ে নটায় জলখাবার নিয়ে এল বলরাম। রুটি আর আলুর তরকারি। দেখা মাত্র টের পেলেন তাঁর খিদে পেয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে বলরাম বলল, 'কী পাওয়া যায় গিয়ে দেখি বাবু।'

'কিছুই পাবে না।'

'তবু—। সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি এখন শহরে যাবে নাকি?'

'মোমবাতি দরকার অনেকগুলো। চাল ডাল আছে। আলু পেঁয়াজ আদা লঙ্কা রসুন আর চিনি যদি পাই তাহলে কোনও চিন্তা নেই।' বলরাম বলল।

দু'শো টাকা দিলেন তথাগত। বড় নোট না দিয়ে দশ টাকার নোটে দিলেন। জলখাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে চলে গেল বলরাম হ্যান্ডেলে ব্যাগ ঝুলিয়ে। অনেকটা পথ তাকে সাইকেলকেই বহন করতে হবে।

বেলা এগারোটা নাগাদ ফিনকে দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফিন ওর মতো জলে পাক খাচ্ছে। কাছে যেতেই মুখ তুলে দেখল। তারপর প্রবল আনন্দে ঘুরপাক খেতে লাগল, মুখ হাঁ করল না। বালির প্রান্তে বাঁধানো দেওয়ালের কাছে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকলেন তথাগত। বেশ বাতাস বইছে। দেখতে দেখতে চল্লিশ ফুট নীচের বিচে নজর পড়ল তার। প্রায় কোমর জলে নেমে কিছু করছে একটি স্ত্রীলোক। এ কোত্থেকে এল? কী করছে ওখানে। ঢেউ এসে ওকে নাচিয়ে দিচ্ছে। তারপর চোখ পড়ল, দু'দিকে দুটো খুঁটি পুঁতে লম্বা কাপড় জলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথাগত পেছন দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'লক্ষ্মী!'

ভেতর থেকে সাড়া এল না।

স্ত্রীলোকটি লক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু বুঝতে সময় লাগল তাঁর। লক্ষ্মী মাছ ধরছে সমুদ্রের ছোট ঢেউ-এ কাপড় পেতে। কী মাছ পেতে পারে ও? তীরের এত কাছে কোনও মাছ সচরাচর আসে না। তাছাড়া কালকের ঘটনার পর তীরের কাছাকাছি যত সামুদ্রিক ছোট প্রাণী ছিল সব মারা পড়েছে। মেয়েটা কি পাগল?

ঘণ্টাখানেক বাদে কাপড় তুলে পাড়ে উঠে এল লক্ষ্মী। এখন ওর পরনে কালো রঙের শায়া, যা বুকের ওপর গিঁট দিয়ে বাঁধা। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটি বেশ ফরসা এবং শরীর লম্বা ও আঁটোসাঁটো। উবু হয়ে বসে কাপড় থেকে কিছু তুলে তুলে বালির ওপর রাখছিল লক্ষ্মী। সব তোলা হয়ে গেলে আবার নেমে গেল সমুদ্রে কাপড়টা নিয়ে। ভালো করে জলে ডুবিয়ে ধুয়ে জল নিংড়ে উঠে এল ওপরে। ওটা যে ওর পরনের কাপড় তা বুঝতে পারলেন তথাগত। সংগৃহীত বস্তু একটা থালায় তুলে লক্ষ্মী ওপাশ দিয়ে ওপরে আসার জন্যে পা বাড়াল।

ঘরে ঢুকে গেলেন তথাগত। ওর এই অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তাঁর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কী ধরেছে লক্ষ্মী? তারপর খেয়াল হল, ও তো একবস্ত্রে এসেছে। এখন ভেজা শাড়ি সায়া পরে থাকবে নাকি? তাঁর কাছে কোনও মেয়েদের পোশাক নেই। কী মনে হতে একজোড়া পুরোনো পাজামা পাঞ্জাবি বের করে বারান্দায় রাখলেন।

লক্ষ্মী এসেছে বুঝতে পেরে ঘর থেকেই গলা তুলে বললেন, 'সমুদ্রে গিয়ে ভিজে এলে কেন? কী ধরতে গিয়েছিলে?

'চিংড়ির বাচ্চা।'

'চিংড়ির বাচ্চা? কেন?'

'ওর জন্যে।' লক্ষ্মীর গলায় খুশি।

তথাগত কী বলবেন ভেবে পেলেন না। কাল ওই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে আর আজ বউ নেমে গেছে সমুদ্রে স্বামীর জন্যে চিংড়ির বাচ্চা ধরতে। এদের প্রেমট্রেম বেশ জোরালো বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, 'তোমার তো আর জামাকাপড় নেই। বারান্দায় যেগুলো রেখেছি সেগুলো পরে শাড়ি শুকিয়ে নাও।'

মিনিট আটেক অপেক্ষা করল তথাগত। তারপর বাইরে এসে লক্ষ্মীকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। পাজামা এবং পাঞ্জাবি, দুটোই বড় হয়েছে। হাতা গুটিয়ে নিয়ে ম্যানেজ করেছে কিছুটা। লক্ষ্মী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁকে বালিতে নামতে দেখে লক্ষ্মী তাকাল। না, প্রথাগত সুন্দরী এই মেয়েটা না। ঠোঁট পুরু, চোখ চাপা। কিন্তু কিরকম একটা উগ্র ব্যাপার আছে। ঠিক এই রকম অনুভূতি হয়েছিল তাঁর ফিল্মের এক মহিলাকে দেখে। কাকে? মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। লক্ষ্মী জিজ্ঞসা করল, 'ভাত করব?'

ওর গলার স্বর ও বলার ভঙ্গিতে মনে পড়ে গেল, সোফিয়া লোরেন, হেসে ফেললেন তিনি। কার সঙ্গে কার মিল খুঁজছেন তিনি।

'তাহলে থাক!' লক্ষ্মী বলল।

'মানে?'

'আপনার খাবার ইচ্ছা নাই যখন তখন থাক।'

'আমার যে ইচ্ছে নেই তুমি বুঝলে কী করে?'

'হাসলেন যে!'

'না, সত্যি খিদে নেই। তোমার খেতে ইচ্ছে করলে রাঁধতে পারো।'

মাথা নেড়ে না বলল লক্ষ্মী। তারপর এগিয়ে গিয়ে কানাতোলা থালা সামনে এনে ধরল, 'দ্যাখেন!'

গুঁড়ি গুঁড়ি, মাছের মতো দেখতে নয়, পোকাই বলা চলে, থালার জলে থিকথিক করছে। অবিশ্বাসী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলো চিংড়ির বাচ্চা?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লক্ষ্মী।

'বলরাম এগুলো খায়?'

'না না। ওর জন্যে—।' আঙুল তুলে ফিনকে দেখিয়ে দিল লক্ষ্মী।

অবাক হয়ে গেলেন তথাগত। ডলফিনশিশুর খাবার আনতে ওইভাবে সমুদ্রে নেমেছিল লক্ষ্মী? আর তিনি ভেবেছিলেন স্বামীর জন্যে প্রেম উথলে পড়েছে! বেশ লজ্জিত হলেন তথাগত। বললেন, 'এক চামচ দাও তো, কেমন খায় দেখি!'

দূরে দাঁড়িয়ে তথাগত দেখলেন একটা চামচে করে চিংড়ির বাচ্চা তুলে গর্তের কাছে গেল লক্ষ্মী। ফিন সাঁতার কাটছিল। লক্ষ্মীকে দেখামাত্র ডুব দিয়ে নীচে গিয়ে বসে রইল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করল লক্ষ্মী কিন্তু ফিন-এর প্রতিক্রিয়া হল না।

লক্ষ্মী চামচ জলে ডুবিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ফিন নড়ল না। তথাগত ব্যাপারটা দেখে বললেন, 'ওগুলো বালির ওপর রেখে তুমি সরে যাও তো।'

লক্ষ্মী একটু দূরে চলে গেলে তথাগত গর্তের ধারে উবু হয়ে বসলেন। তৎক্ষণাৎ ফিন উঠে এল ওপরে। ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। মাথায় হাত বোলানোর পর ফিন শান্ত হল। তথাগত এক চামচ চিংড়ির বাচ্চা তুলে জলে ফেলতেই সে ঘাই মেরে গিলে ফেলল ওগুলোকে।

হাততালি দিয়ে হেসে লক্ষ্মী বলল, 'বদমাশ, আমাকে হিংসে করে।'

'তোমাকে হিংসে করবে কেন?'

'আপনার সঙ্গে ও ছিল, এখন আমি এসে গেছি। মেয়েছেলের মন তো!'

'মেয়েছেলে? এটা মেয়ে নাকি?'

'দ্যাখেননি? দ্যাখেন, আপনার হাত কী করে চাটে! আর একটু দিন না।'

ডলফিনের বাচ্চাটাকে দেখার পর থেকে একবারও তথাগতর মনে ওর লিঙ্গ নিয়ে কোনও চিন্তা আসেনি। শোনার পর তাকিয়েও পার্থক্য বুঝতে পারলে না।

'ওকে ছেড়ে দেন।' লক্ষ্মী বলল।

'ছেড়ে দেব মানে? সমুদ্রে গেলে ও বাঁচতে পারবে?'

'নিজের জায়গায় পারবে না কেন? ঠিক পারবে!' লক্ষ্মী জোর দিয়ে বলল।

কথাটা পছন্দ হল না তথাগতর। এত তাড়াতাড়ি ফিনকে ছেড়ে দিতে তিনি মোটেই রাজি নন। মনে হল, লক্ষ্মী বোধহয় ঈর্ষা করছে ফিনকে। তাই বা কী করে হয়। তাহলে ফিন-এর জন্যে চিংড়ির বাচ্চা ধরতে যেত না!

এইসময় দূরের আকাশে শব্দ বাজল, গোঁ গোঁ শব্দটা পাক খেতে খেতে এদিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মী ভয়ে দৌড়ে ঢুকে গেল বারান্দায়। মুখ তুলে তথাগত দেখতে পেলেন একটা হেলিকপ্টার আকাশে পাক খাচ্ছে। এই বাংলোটাকে দেখে অনেকটা নীচে নেমে এল। পাইলট এবং তার পাশে বসা লোকদের দেখতে পেলেন তিনি। ওরা হাত নাড়ছে। হাত নাড়লেন তথাগত। সমুদ্রের ওপর চলে গেল হেলিকপ্টারটা। ওরা নিশ্চয়ই সমীক্ষা করতে এসেছে। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিলে ত্রাণ আসবে। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে এল। ঠিক মাথার ওপর এসে হাত নেড়ে সরে যেতে বলল তাঁকে। ওরা একটা বড় প্যাকেট ফেলে দিল নীচে। শোঁ করে নেমে আসছে সেটা, হঠাৎ খেয়াল হতে দৌড়ে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা টিনটাকে গর্তের ওপর চাপিয়ে দিতেই প্যাকেটটা পড়ল সেখানে সশব্দে। হেলিকপ্টার চলে গেল।

ছুটে বাইরে এল লক্ষ্মী। তথাগতর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। ওই প্যাকেট তাঁর মাথার ওপর পড়লে আর দেখতে হত না। খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মী প্যাকেটটা টেনে নামাল নীচে। পলিথিনের শক্ত প্যাকেটের মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা। গিঁট খুলতেই তা থেকে ছোট ছোট প্যাকেট বেরুতে লাগল। চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, চালে ডাল মেশানো। খুব খুশি হল লক্ষ্মী। অন্তত ছ'সাত কেজির পাকেট ওটা। কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু টিনটা গর্তের ওপর থেকে তুলতে ভয় করছিল তথাগতর। প্যাকেট যখন টিনের ওপর পড়েছিল তখন খানিকটা জায়গা নিচু হয়ে গিয়েছিল চাপে। একে ওই ওজন, তার ওপর অত উঁচু থেকে পড়ার কারণে তা অনেক বেড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে টিনটাকে সরালেন তথাগত, জল ঘোলা। টিনের যাবতীয় জং প্যাকেটের আঘাতে জলে পড়ায় রঙ পাল্টেছে। একেবারে নীচে বালির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে পড়ে আছে ফিন।

'মরে গেছে।' ফিশফিশ করে বলল লক্ষ্মী কাঁধের ওপর থেকে। উবু হয়ে বসা তথাগত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। টিনটা যদি না চাপা দিতেন তাহলে গর্তের মধ্যেই প্যাকেটটা পড়ত। সেক্ষেত্রে —।

ঝুঁকে হাত বাড়ালেন তথাগত। ধীরে ধীরে তুলে আনলেন ফিনকে। মনে হল, লক্ষ্মী ঠিকই বলেছিল, ওকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। বালির ওপর ফিনকে শুইয়ে দিয়ে ওর শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। লক্ষ করলেন যে জায়গায় ও ঢেউ-এর ধাক্কায় ওপরে উঠে এসে আঘাত পেয়েছিল সেই জায়গাটা

রক্তে ভিজে গেছে। মিনিটখানেক বাদে হঠাৎ নড়ে উঠল ফিন। চমকে উঠে কোলে তুলে নিলেন তথাগত। লক্ষ্মী চিৎকার করল, 'বেঁচে আছে।'

এবার চোখ পিটপিট করতে লাগল ফিন, তথাগত বুঝলেন টিনের চাপে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বেচারা। অদ্ভুত শব্দ বের হল ওর গলা থেকে। তারপর ওকে গর্তের একপাশে শুইয়ে দিলেন যাতে ওর শরীরের নীচের দিকটা জলে ডুবে থাকে।

মন খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল হেলিকপ্টারটার প্যাকেট ফেলার! তাদের জন্যে পাঠানো খাবারের চাপে মারা যাবে ফিন?

'বাবু! ভাত করব? লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল।

'নাঃ। আমার খিদে নেই।' ঘরে চলে এলেন তথাগত। তারপর কখনই যা করেন না, দিনের বেলায় গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। বারংবার ফিন-এর কথা মনে আসছিল। একে কি মায়া বলে? সারাজীবন একা থেকেছেন। যত দিন মা ছিলেন সব কর্তব্য করেছেন। প্রেমেও পড়েছেন কয়েকবার। আশ্চর্য ব্যাপার, সবই বিবাহিত মহিলার সঙ্গে। আসলে লেখালেখির জগতে স্থিতু হয়ে বসতেই চল্লিশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার আগের সময়টা ছিল পায়ের তলায় মাটি আনার লড়াই। তখন প্রেম করার কথা ভাবতেই পারতেন না। একটি অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরি হলে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তার সেই সামর্থ না থাকায় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। তারপর যখন সক্ষম হলেন তখন আশেপাশে কেউ আর অবিবাহিতা নেই। থাকলেও তাঁরা আকর্ষণীয়া না। অথচ বিবাহিতা মহিলারা, যাঁরা স্বামী থাকতেও নিজেকে একা ভাবেন তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারতেন না তথাগত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন এইরকম সম্পর্কের পরিণতি কখনই সুখের হতে পারে না। অন্যের সংসার ভেঙে নিজের সংসার তৈরি করলে সেটা সেই বাড়ির মতো দাঁড়াবে যার কোনও ভিত নেই। শেষপর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। এসে বেশ ছিলেন। কিন্তু ফিন তাঁকে দু'দিনেই বুঝিয়ে দিল, শুধু প্রেম নয়, মায়ার শক্তি কম জোরদার নয়।

'বাবু!'

চোখ ফেরালেন তথাগত। পাজামা পাঞ্জাবি ভাঁজ করে নিয়ে শাড়ি পড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকাতেই সে বলল, 'এগুলো কি ধুয়ে দেব?'

'না। রেখে দাও ওখানে।'

লক্ষ্মী একটা টেবিলের ওপর রেখে দিল পাজামা পাঞ্জাবি।

'বলরামকে বললে পারতে তোমার জন্যে একটা শাড়ি পেলে নিয়ে আসতে।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল লক্ষ্মী।

'আজই বলরামকে পাঠানো ঠিক হয়নি। রাস্তা বলে তো কিছু নেই। কোথায় জিনিস পাবে কে জানে! যদি শহরে যাওয়ার চেষ্টা করে তো আজ ফিরতে পারবে না।' গ্লাস শেষ করলেন তথাগত। কী আশ্চর্য! আজ দুপুরেই বেশ মেজাজ হচ্ছে।

'ও বলেছে আজ নাও ফিরতে পারে।'

'আ! এটা ঠিক না। তোমাকে একা রেখে ও বাইরে থাকবে কেন?' দ্বিতীয় পেগ গ্লাসে ঢাললেন তথাগত, জল মেশালেন।

'আপনি আছেন। গেল বছর ও একমাস আমাকে রেখে শহরে কাজের জন্যে গিয়েছিল। এখানে তো আপনার কাছে আছি।'

'যখন গিয়েছিল তখন তোমাদের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই পাশে ছিল।'

লক্ষ্মী শ্বাস ফেলল শব্দ করে, 'সবাই লোভ দেখাত। কেউ কেউ পালাতে বলত। এখানে তো সেসব হবে না।'

'ঠিক আছে, মুড়কি চিড়ে যা ইচ্ছে খেয়ে বিশ্রাম করতে যাও।'

'ওটা কি বিলিতি মদ?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ হবে না?'

'না। বড়জোর ঘুম পাবে। ঘুমিয়ে পড়ব। যাও।'

লক্ষ্মী চলে গেল। তিনটে পেগ পেটে যাওয়ার পর হঠাৎই ঘুম এসে গেল। একে প্রায় খালি পেট, তার ওপর মনটাও বিগড়ে ছিল। খেতেখেতেই ঘুমিয়ে পড়লেন চেয়ারে বসে। মাথাটা কাত হয়ে গেল একপাশে।

হঠাৎ তথাগতর মনে হল তিনি যেন শূন্যে ভাসছেন। কিন্তু সেই ঘোরটা কাটল দ্রুত। তাঁর শরীরটাকে দু'হাতে তুলে বিছানার কাছে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মী। ওর শরীর থেকে জলের গন্ধ বের হচ্ছে। শ্যাওলা জমা জল। টের পেলেন তিনি। ভাবলেন ঝটপটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তাঁর বেশ আরাম হচ্ছে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লক্ষ্মী মুখে হাত বুলিয়ে দিল। তথাগতর শরীর শিরশির করে উঠল। তিনি বাঁ হাত দিয়ে লক্ষ্মীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। ধরতেই লক্ষ্মী নুইয়ে পড়ল তাঁর পাশে। তথাগত আবার ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে পাশবালিশের মতো জড়িয়ে ধরলেন ওকে। কিন্তু কী করছেন তা তাঁর বোধে ছিল না।

ঘুম ভাঙতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তথাগত। কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না লক্ষ্মী তাঁর পাশে কী করে এল। সন্তর্পণে নিজের হাত ওর শরীর থেকে তুলে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। একেবারে শিশুর ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ্মী! মদের ঘোরে তিনি কি ওকে কাছে ডেকেছিলেন! ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাহলে তো তাঁর নেশা করাই উচিত নয়। তিনি বসেছিলেন চেয়ারে, খাটে কী করে চলে এলেন? লক্ষ্মী কি তাঁকে নিয়ে এসেছে। চেয়ারে বসে তাঁকে দেখে ওর খারাপ লেগেছিল?

তথাগত বাইরে বেরিয়ে এলেন। এখন বিকেল। সমুদ্র শান্ত। আকাশ পরিষ্কার। মনে পড়তেই গর্তের দিকে তাকালেন। নড়ছে ফিন। সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে। তিনি পাশে যেতেই অদ্ভুত মুখ করে তাকাল। হাঁটু মুড়ে বসে তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন,

'কষ্ট হচ্ছে?' মাথায় হাত বোলাতেই ফিন অনেকগুলো শব্দ করল। তথাগতর মনে হল বাচ্চাটা আবদার করছে। ওর প্রাণশক্তি এবং ভাগ্য খুব ভালো। নইলে দু-দুবার যে কাণ্ড ও সহ্য করেছে তা করার কথা নয়। লক্ষ্মীর কথা মনে এল। এভাবে যে বেঁচে থাকতে পেরেছে সে সুদ্রে গেলে ঠিক নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

ফিনকে কোলে নিয়ে নামতে লাগলেন তথাগত। টিলার ওপর থেকে বালিতে পা রেখে নামতে গিয়ে হড়কে পড়তে পড়তে সামলালেন কোনওক্রমে। তারপর সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। জোয়ার আসছে। ফিন-এর দিকে তাকালেন পরম মমতায়। তারপর জলে নেমে ফিনকে নিচু করে ধরলেন যাতে ও জলের স্পর্শ পায়। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে নড়াচড়া আরম্ভ করল ফিন। তারপর সাঁতার কেটে তথাগতর হাতের চৌহদ্দি থেকে বের হল। আবার ফিরে এল হাতের কাছে। মুখ তুলে দেখল তথাগতকে। তারপর পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল জলের গভীরে। কষ্ট হল, খুব কষ্ট হল তথাগতর।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি জলের ভেতর। সন্ধের অন্ধকার তির তির করে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সমুদ্রের জলে উচ্ছ্বাস দেখতে পেলেন। তারপরেই এক ঝাঁক ডলফিন এসে তার চারপাশে পাক খেয়ে শব্দ করে কিছু বলে যেতে লাগল। ভয় পেয়েছিলেন প্রথমে, পরে বুঝলেন, আঘাত করতে নয়, খুশিতে ওরা এমন করছে। একবার মনে হল ফিনকে ওদের মধ্যে দেখলেন, বোঝার আগেই ওরা ফিরে গেল সমুদ্রে।

'বাবা, ও চলে গেল?'

চমকে পেছন ফিরলেন তথাগত। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে বালির ওপর। চুল উড়ছে। শব্দগুলো তথাগতর বুক থেকে বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ মা, মেয়েরা তো এভাবেই চলে যায়।'

বন্ধুর মতো

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রঞ্জন বলল, 'এই বাড়ি।' দিশা মুখ তুলে তাকাল। পাঁচতলা ঝকঝকে বাড়ি, সামনে গেট, নিচে কাব-পার্কিং। বেশ সমৃদ্ধ চেহারা। আসার সময় দেখে বুঝেছে পাড়াটাও বেশ সমৃদ্ধ। অতএব ফ্ল্যাটের ভাড়া নিশ্চয়ই কম হবে না। রঞ্জন বলল, 'চলো।'

বাড়িটা পাঁচতলা হলেও লিফট আছে। দারোয়ান জানতে চাইল তারা কার কাছে যাবে। জেনে লিফট দেখিয়ে দিল। স্বয়ংচালিত লিফট বারো তলায় উঠে বাঁ দিকের দরজার বেল টিপল রঞ্জন, যার পাশে লেখা রয়েছে আর সামন্ত। কয়েক মিনিট পরে কি-হোলে চোখের তারা, দবজা ঈষৎ খুলে চেনে আটকে গেল, 'কি ব্যাপার?' এক মহিলার গলা।

'আমি রঞ্জন। আপনাকে ফোন কবেছিলাম।'

চেন খুললেন যিনি তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। পরনে হাউসকোট, কাঁধ-ছোঁয়া চুলে রুপোলি ছোপ। হাত নেড়ে বললেন, 'আসুন।'

সোফায় মুখোমুখি বসার পর মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপু আপনার কথা আমাকে বলেছে। তবু, আপনার প্রফেশন কি?'

'আমার একটা অ্যাড এজেন্সি আছে।' রঞ্জন বলল।

'আপনি আর অপু একসঙ্গে পড়তেন?'

'হ্যাঁ। আমরা প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে পড়েছি।'

'এখন কোথায় আছেন?'

'আমার পৈতৃক বাড়ি গড়পারে। বেশ অসুবিধা হচ্ছে ওখানে।' রঞ্জন বলল।

'আপনি?'

'আমি দিশা। কলেজে পড়াই।'

'কি সাবজেক্ট?'

'ইকনমিক্স।'

'আমি আপনাদের চা অফার করতে পারছি না, কারণ কাজের মেয়েটি এখনও আসেনি। উনি চলে যাওয়ার পর অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম অপুকে, আর পারলাম না। ওর কাছে যেতেই হচ্ছে। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমতাও চেপে ধরছে। যাক গে। অপু যখন আপনাকে রেফার করছে তখন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে সমস্যা হতে পরে।' বৃদ্ধা তাকালেন।

'বলুন।'

'প্রতি বছর, যে ক'বছর বাঁচব, আমার স্বামীর মৃত্যুদিনে আমি এই ফ্ল্যাটে থাকব। সেজন্যে বছরে দিন দশেকের জন্যে কলকাতায় আসব। মুশকিল হল, আমি কারও সঙ্গে শেয়ার করে থাকতে পারি না। অপু ওর লং আইল্যান্ডের বাড়ির আউট হাউস

আমার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছে। তাই আমি এলে—।' বৃদ্ধা আচমকা চুপ করলেন।

'কোনও সমস্যা হবে না। এই ফ্ল্যাট যেমন আছে ঠিক তেমন রেখে আমরা দিন পনেরোর জন্যে বাইরে বেড়াতে যেতে পারি।' রঞ্জন হাসল।

'তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন, পুরো ফ্ল্যাটই সাজানো। বেডরুম চারটে। আপনারা তো দু'জন, এত লাগার কথা নয়। একটি ঘর, যেখানে আমার স্বামী থাকতেন, আমি লক করে যাব। চলুন, ফ্ল্যাটটা দেখে নিন।' বৃদ্ধা উঠলেন। রঞ্জন বলল, 'আপনি আমাদের তুমি বলুন।'

'ওটা আমার জিভে চট করে আসে না।'

'বৃদ্ধার ফ্ল্যাট দেখে দিশা খুব খুশি। অন্তত আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট। সর্বত্র রুচির ছাপ। কিচেনটা বিশাল। তাতে সব আছে। বৃদ্ধা বললেন, 'এখানে থাকলে আপনাদের কিছুই আনতে হবে না। পছন্দ হয়েছে?'

'খুব।' দিশা হাসল।

'আমি একটা অনুমতিপত্র লিখে রাখব। ওটা থাকলে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু আঠারো তারিখে চলে যাচ্ছি।'

'দশদিন বাকি।' রঞ্জন হিসেব করল,' কিন্তু—।'

বৃদ্ধা তাকালেন।

রঞ্জন ইতস্তত করল, 'আসলে অপুর সঙ্গে আমার টাকা-পয়সা নিয়ে কথা হয়নি।'

'টাকা-পয়সা কেন? আমি তো আপনাকে ভাড়া দিচ্ছি না। আপনি আমার ছেলের বন্ধু, তাই আপনাকে কেয়ারটেকার হিসেবে এখানে থাকতে দিচ্ছি। এর মধ্যে টাকা পয়সার কথা উঠছে কেন? উলটে আপনি টেক কেয়ার করবেন বলে আপনাকেই আমার কিছু দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এমন হতে পারে, আমি মন পালটালাম, ছয়মাস পরে ঠিক করলাম কলকাতায় চলে আসব, তাহলে অন্তত একমাস আগে আপনাকে জানাব।' ভদ্রমহিলা জানিয়ে দিলেন।

রঞ্জন দিশার দিকে তাকাল। দিশা কি বলবে ভেবে পেল না। তাই দেখে বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না। একবছরের মধ্যে সেরকম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। আপনি রবিবার বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করুন।'

বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম লাগল?'

'খুব খারাপ।' দিশা হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'কেন?'

'উনি ভাড়া নেবেন না, মনে হবে কারও অনুম্পায় আমরা থাকছি।' দিশা জানাল।

'অনুকম্পা বলছ কেন? ওঁর প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন মিলে যাচ্ছে বলেই থাকছি। অপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে ফোনে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে আমার। ইলেকট্রিক, টেলিফোন তো ব্যবহার করব আমরা, তার বিল আমরাই দেব।' রঞ্জন বোঝাল।

রঞ্জনের বয়স এখন বিয়াল্লিশ। এতদিন ইচ্ছে হয়নি বলে বিয়ে করেনি। ওর দুই ভাই বিবাহিত, একজন মুম্বইতে থাকে, দ্বিতীয়জন একই বাড়িতে। মা মারা গিয়েছেন গত বছর। এবং তারপরেই ওর আলাপ হয় দিশার সঙ্গে। মাথার ওপর কোনও অভিভাবক নেই, আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে বিয়ের প্রসঙ্গ আসবেই। এবং ওখানেসেই সমস্যার শুরু।

ইকনমিক্সে এম এসসি করার পর পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে দিশা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল দমদমের একটা কলেজে। ওর বাবা মা থাকতেন সিউড়িতে। ছাত্রী জীবন কেটেছে হস্টেলে। এখনও সে থাকে ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে। এক ঘরে একা। তার এই আটত্রিশ বছরের জীবনে বার তিনেক রোমান্সের ছোঁয়া লাগতে লাগতে লগেনি স্রেফ নিস্পৃহতার জন্যে। শুরু দিকে যে ভালো লাগা তৈরি হত তা খানিকবাদে ভয়ে রূপান্তরিত হত। ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল কারণ ওই তিনজন পুরুষই ছিল উড়ে আসা নীড়ের পাখির মতো, নীড় বাঁধবার ইচ্ছে কারও ছিল না। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল দিশা। ছাত্রীদের পড়ানো, লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটায় সময়টা কাটিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই রঞ্জনের সঙ্গে আলাপ। একটি ভদ্র মানুষের সঙ্গে ক্রমশ মানসিক-ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে সে। এই একবছরে ওরা কোথাও এক রাতের জন্যে বেড়াতে যায়নি। কোনও রেস্তোরাঁর ঘেরাটোপে সময় কাটায়নি। পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ সামান্য ছোঁয়াছুয়ি আকস্মিকভাবে হওয়া ছাড়া কেউ কারও হাতে হাত রাখেনি। কিন্তু যেই বিয়ের কথা মনে এল অমনি সন্ত্রস্ত হল দিশা। প্রায় অচেনা একটি মানুষের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে, এই বয়সে মানুষটির প্রয়োজনে বিছানায় বিবস্ত্র হতে হবে ভাবতেই কিরকম শীতল হয়ে যাচ্ছিল শরীর। আর এই সময়, মাত্র মাস খানেক আগে বিয়ের কথা উঠল। দিশা মুখ নিচু করেছিল, 'এই তো ভালো, ভালো না?'

'তার মানে?' চোখ কপালে তুলেছিল রঞ্জন! তুমি কি আমার সঙ্গে বাকি জীবন থাকতে চাও না?'

মাথা নেড়েছিল সম্মতিতে, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি দিশা।

রঞ্জন গলা নামিয়েছিল, 'কি ব্যাপার বলো তো?'

'আমায় ভয় করে।'

'ভয়, কেন?'

'যদি বিয়েটা ভেঙে যায়। এই বয়সে বিয়ে করার পর সেটা হলে মুখ দেখাতে পারব না।' মাথা নাড়ল দিশা, যেন ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে সেটা চোখের সামনে দেখতে পেল।

রঞ্জন অবাক। বলল, 'আমার মধ্যে কি এমন কিছু দেখেছ যে মনে হচ্ছে বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'দূর! তা না। আসলে নিজেকে ভয় করে।'

কথাগুলো দিশা বললেও দেখাশোনা বন্ধ হল না। সপ্তাহে অন্তত চারদিন দেখা

না করলে বুকে ভার জমে। যে দিন দেখা হওয়ার কথা সে দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অদ্ভুত ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়ে মনে।

শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তোমার এমন হয়?'

'হুঁ। হয়।' রঞ্জন মাথা নেড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্তে এল, একসঙ্গে থাকবে। দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে থাকতে গেলে বিয়ে করতেই হবে তার কোনও মানে নেই। বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীরা খেয়োখেয়ি করেও একসঙ্গে থাকছে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ নিয়েও বিয়ের বাঁধনটাকে ছিঁড়তে পারছে না, এরকম দৃষ্টান্ত চারপাশে ছড়িয়ে। সে দিন একটা কাগজে সমীক্ষা পড়েছিল, আশি শতাংশ দম্পতির সম্পর্ক সুখের নয়। বিয়ে না করে একসঙ্গে থেকে যদি সেই পরিস্থিতি তৈরি হয় তা হলে বন্ধুত্ব রেখেই আলাদা হওয়া যেতে পারে। এখন তো বিবাহ বহির্ভূত এক সঙ্গে থাকাকে আইন স্বীকৃতি দিয়েছে। বিচ্ছেদের জন্য তো কোর্টে যেতে হচ্ছে না। সেখানে দাঁড়িয়ে দু'জনের কেচ্ছা শোনাতে হবে না।

'কিন্তু আত্মীয়স্বজন?' দিশার মনে তখনও অস্বস্তি।

'কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার কি?'

'প্রশ্নের মুখ কি দিয়ে চাপা দেব?'

'বলবে আমরা ভালোবেসে একসঙ্গে থাকছি।'

'যদি না থাকতে পারি, তা হলে তো হাসাহাসির পাত্র হব।'

'তা হব। হয়তো ওদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাব না।'

'না পাই, ও নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই। আচ্ছা, যদি বলি বিয়ে করেছি, রেজিস্ট্রি করেছি। তা হলে সব মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'মিথ্যে কথা?'

'যুধিষ্ঠিরও বলেছিলেন।' দিশা বলল, 'লোকে জানুক কিন্তু ছাড়াছাড়ি যদি হয় তাহলে তো উকিলের কাছে ছুটতে হবে না। তাই না?'

'কিন্তু তুমি যদি প্রথম থেকেই কু গাও—।'

'কু গাই মানে?'

'ওই যে এখনও একসঙ্গে থাকলাম না, আর তুমি ছাড়াছাড়ির কথা ভাবছ! এত বেশি ভাবলে তো সত্যি হয়ে যেতে পারে।' রঞ্জন বলেছিল।

'না। উলটো। ভাবছি বলেই ওটা যাতে সত্যি না হয় তার জন্যে সতর্ক থাকব আমরা। বিয়ের মন্ত্রের চেয়ে বিয়ে না করে থাকার অঙ্গীকারে অনেক বেশি দায়িত্ব এসে যায়। তাই না?' দিশা সহজ হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত নেওয়ামাত্রই তো কার্যকর করা যায় না। রঞ্জনের পক্ষে ছোট ভাই এবং তার স্ত্রীকে জানাতে সময় লাগল। জানার পর স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এত দিন পরে দাদা বিয়ে করছে, পাত্রীটি তাদের অপরিচিতা, শাস্ত্র মেনে বিয়ে

হবে না, এবং বিয়ের পর দাদা বউদি এ বাড়িতে থাকবে না। তারা যে উপেক্ষিত এতে মনে ক্ষুণ্ণভাব এলেও ওরা যে এই বাড়িতে থাকছে না তাতে এক ধরনের স্বস্তি এল। একটু দূরের আত্মীয়রা আশা করল, একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে এবং সেখানেই তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন। রঞ্জন জানিয়ে দিল, কোনও উৎসব করা হচ্ছে না। সবাই ভাবল বেশি বয়সের বিয়ে বলে রঞ্জন লজ্জা পাচ্ছে।

দিশা অবশ্য তেমন কোনও প্রশ্নের সামনে পড়েনি। দীর্ঘকাল একা থাকার ফলে সিউড়ির বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো শিথিল হয়েই এসেছিল। ভাইরা রোজগার শুরু না করা পর্যন্ত সে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতি মাসে। তখন বাড়ি গেলে যে আদরযত্ন পেত, ওরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর টাকা পাঠানো বন্ধ করলে সেটা দ্রুত কমে গেল। সে বিয়ে করবে না, বাকি জীবন একা থাকবে, এরকমটাই ধরে নিয়েছিল সবাই। অতএব ওরা যখন দিশার চিঠিতে ব্যাপারটা জানতে পারল তখন চুপচাপ মেনে নিল। ছোট ভাই জানত দিশার প্রভিডেন্ড ফান্ডের নমিনি হিসেবে তার নাম আছে। দিদি কি সেটা বদলে দেবে? কৌতূহলটা সে প্রকাশ করতে পারল না।

রবিবারে গিয়েছিল রঞ্জন। বন্ধুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র নিয়েছিল। ওই ফ্ল্যাটের টেলিফোন এবং ইলেকট্রিকের টাকা ওঁর ব্যাঙ্ক থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে রঞ্জনকে সেই অ্যাকাউন্টে বিলের টাকা জমা দিতে হবে। কেয়ারটেকারকে ডেকে তিনি রঞ্জনের পরিচয় দিলেন আত্মীয় বলে। ওঁর অনুপস্থিতিতে রঞ্জন সস্ত্রীক এখানে থাকবে, ফ্ল্যাটে ঢোকার একটি চাবি তিনি রঞ্জনকে দিয়ে বললেন, 'অন্যটা আমার কাছে রইল।'

'আপনার ফ্লাইট কবে; কখন?'

'কেন? তুমি আমাকে দমদমে পৌঁছোতে যাবে নাকি?'

'আপনি যদি আপত্তি না করেন—!'

'না না। ও ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া তুমি তো তোমার বন্ধুর মায়ের খবর কোনওদিন নাওনি, এখন এ সব করলে মনে হবে চক্ষুলজ্জায় করছ।' ভদ্রমহিলা বলেছিলেন।

দিন ঠিক হল। মাসের প্রথম তারিখেই ওরা নতুন জীবন শুরু করবে। তবে দু'জনে আলাদা ভাবে ওই বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। ওরা যে বিবাহিত নয় তা প্রচার করে লাভ কি! অতএব রঞ্জন ট্যাক্সি নিয়ে দুপুরের শেষে দিশার হস্টেলে এল।

এ ক্ষেত্রে হস্টেলের ঘর ছেড়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। দিশাও ভেবেছিল কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়ে দেবে। যে ঘরে দীর্ঘকাল একা কাটাল সেই ঘরে নিশ্চয়ই অন্য মেয়ে আসবে। শেষ মুহূর্তে মত বদলাল সে। এখনই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত না জানিয়ে কিছুদিন পরেও তো জানানো যেতে পারে। বিশেষ কাজে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে বলে টাকা দিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই মেনে নেবেন। তার এতদিন এখানে থাকার কারণে কেউ প্রতিবাদ করব না। শেষ পর্যন্ত তাই করল সে।

দুটো সুটকেশ হস্টেলের দারোয়ান তুলে দিয়ে গেল ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ছাড়তে রঞ্জন বলল, 'তোমার যাবতীয় সম্পদ ওই দুটোয় ভরে গেল?'

না বলতে গিয়ে সামলে নিল দিশা। উত্তরে শুধুই হাসল। ঘর ছেড়ে না দিয়ে আসার কথা শুনলে রঞ্জনের কি প্রতিক্রিয়া হবে তার জানা নেই। পরে ওকে বুঝিয়ে বলা যাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার?'

'সব তো আনা যায় না। যা প্রয়োজনীয় তা নিয়ে এসেছি। ওখানে তো কোনও কিছুর অভাব নেই। শুধু ব্যক্তিগত জিনিস থাকলেই দিব্যি চলে যাবে।' তারপর স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দিশা, এখন এই মুহূর্তে তোমার কেমন লাগছে?'

দিশা বলল, 'যেমন লাগা উচিত!'

রঞ্জন হাসল, আর কথা বাড়াল না।

একটি ঘর তালা বন্ধ কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। দু'জনের জন্যে ফ্ল্যাটটা যত বড় যে প্রথমেই একটি কাজের লোকের কথা মনে এল দিশার। এতদিন সে হস্টেলের একটি ছোট ঘরে থেকেছে। ঘরটাকে পরিষ্কার রাখতে তার মোটেই বেশি পরিশ্রম করতে হত না। কিন্তু এত বড় ফ্ল্যাট পরিষ্কার রাখা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে ওরা হলঘরের সোফায় বসেছিল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বন্ধুর মায়ের নিশ্চয়ই মেইড সার্ভেন্ট ছিল, সে কোথায়?'

রঞ্জনের মনে পড়ে গেল, 'তোমাকে বলাই হয়নি। রবিবারে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছিলাম তখন প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। শুনলাম যে কাজ করত সে নাকি দীর্ঘকাল ওঁর সঙ্গে ছিল। তার বয়স হয়েছে এবং উনি আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন বলে সে তার দেশের বাড়িতে গিয়ে শেষ জীবন কাটাতে চায়। অতএব তাকে পাওয়া যাবে না।'

'বাঃ। তা হলে এখন কি হবে?'

'খুঁজে পেতে হবে। কেয়ারটেকারকে বললে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবে কাউকে।'

'তা হলে যাও, আজই বলে এসো। কাল সকাল থেকে চাই।'

রঞ্জন উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'লোকটাকে এখানে ডাকি।'

ইন্টারকমের বোতাম টিপে অনুরোধ জানিয়ে ফিরে এসে বলল, 'আজকের রাত্রে আর বাড়িতে রান্না করার দরকার নেই, বাইরে খাব!'

'রান্না করতে হলে কি ভাবে হত?'

'কেন? কিচেনে তো গ্যাস সিলিন্ডার আছে।'

'ব্যস? গ্যাস জ্বালালেই রান্না হয়ে যাবে? রান্নার আগে তো বাজার করতে হবে।'

'ওহো। তা বটে। আসলে কোনওদিন সংসারের এ দিকটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি—।'

'আমিও তাই। সতেরো বছর হস্টেলের রান্না খাচ্ছি। রান্নাঘরে ঢোকার দরকারই ছিল না।'

'তা হলে তো তোমার পক্ষে রান্না করা সমস্যা হয়ে যাবে।' চিন্তায় পড়ল রঞ্জন।
হাসল দিশা, 'এ সব নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করিনি, করা উচিত ছিল।'
'কেন?'
'তা হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবনা-চিন্তা করা যেত।' দিশা মুখ তুলল।
'দূর। সম্পর্ক ভালো হলে এটা কোনও পয়েন্টই না। আজকাল হোম ডেলিভারির মাধ্যমে দারুণ খাবার পাওয়া যায়। এ বাড়িতে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, দেখেছি। ওটা দিয়ে আমি রোজ ধুলো পরিষ্কার করে দেব। জামাকাপড় লন্ড্রিতে দেওয়া যাবে।' রঞ্জনের কথা শেষ হতে না হতেই বেল বাজল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই কেয়ারটেকারকে দেখতে পেল, 'ইয়েস স্যার।'
'আসুন।'
মাঝবয়সি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে দিশাকে নমস্কার করলেন।
রঞ্জন বলল, 'কয়েকটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'
'বলুন।'
'কাজের লোক চাই। হোলটাইমার।' রঞ্জন বলল।
'না না। হোলটাইমারের দরকার নেই। শুধু সকালটা হলেই চলবে।' দিশা প্রতিবাদ করল। রঞ্জন বলল, 'কেন? বিকেলে, মানে রাত্রের ব্যাপারটাই।'
কেয়ারটেকার বললেন, 'ম্যাডাম ঠিক বলেছেন স্যার। প্রথমত হোলটাইমার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজ না জেনেও প্রচুর টাকা চাইবে। তার ওপর বিশ্বাস করে বাড়ির দায়িত্ব দেওয়া নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। তুলনায় পার্টটাইমার চেষ্টা করলেই পাওয়া যেতে পারে।'
মেনে নিল রঞ্জন, 'ঠিক আছে, কাল সকাল থেকে কাউকে আসতে বলুন।'
'এত তাড়াতাড়ি হবে কি করে স্যার? এ বাড়িতে যারা কাজে আসে তাদের বলতে হবে। সবাই তো প্রচুর কাজ করে, তার মধ্যে যাদের সময় আছে তাদের কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।' কেয়ারটেকার বললেন।'
'সর্বনাশ! তা হলে আমাদের কি করে চলবে?' রঞ্জন প্রশ্ন করল।
'দাঁড়ান। আমাদের এখানে যে কাজ করতে আসবে সে কি অন্য বাড়িতেও কাজ করবে?'
'পার্টটাইমাররা তো তাই করে। যে কাজের দায়িত্ব শুরুতে দেবেন তা আধঘণ্টার মধ্যে শেষ করে অন্য বাড়িতে চলে যাবে।' কেয়ারটেকার এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করলেন।
'কি আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম যে আসবে সে সমস্ত সকাল এখানে থাকবে।' রঞ্জন বলল।
'আপনাকে পাঁচ গুণ চার্জ দিতে হবে স্যার। আচ্ছা।' কেয়ারটকার চলে গেলেন।
চিন্তিত রঞ্জন বলল, 'কি করা যায় বলো তো?'

দিশা হাসল, 'আপাতত ও সব ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে আরাম করে বোসো।

রঞ্জন কিছু বলতে গিয়ে মন বদলাল, 'আমরা সংসার করব অথচ নির্ভর করতে হবে অজানা-অচেনা একজনের ওপর। অদ্ভুত!'

'বিদেশে কিন্তু এই তৃতীয়জন থাকে না।' দিশা বলল।

'রাইট। ওরা যদি পারে তা হলে আমরা কেন পারব না। এই ফ্ল্যাটে সব আধুনিক ব্যবস্থা আছে। একটা রান্নার বই কিনে নিলেই হবে—।'

রঞ্জনের গলায় উত্তেজনা।

'হোম ডেলিভারি।' নিচু গলায় বলল দিশা।

ফ্ল্যাটটা আর একবার জরিপ করে নিয়ে নিজের সুটকেশ যে বেডরুমে ঢোকাল দিশা সেখানে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে বার্মা টিকের কাঠের খাটে। টেবিল চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, আয়না, দেওয়াল আলমারি, যা যা দরকার সব চার পাশে। এমনকী একটা হেয়ার ড্রায়ারও চোখে পড়ল। খুশি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই দরজায় রঞ্জনকে দেখতে পেল দিশা।

'এই ঘরটাকে পছন্দ হল?' রঞ্জন হাসল।

'হ্যাঁ, বেশ ভালো।'

'তা হলে আমি পাশের ঘরটা নিই?' রঞ্জন দাঁড়াল না।

থমকে গেল দিশা। বিয়ে না করে বিবাহিত জীবন যাপন করতে গেলে কি আলাদা শুতে হয়? অথচ এখন ব্যাপারটা ভাবতেই এক ধরনের আড়ষ্টতা এসে যাচ্ছে। বিয়ের মন্ত্র বা সই কি সেই আড়ষ্টতা দূর করতে সাহায্য করে? আবার, একসঙ্গে এক ঘরে থাকলেই কি সে রঞ্জনকে দেওয়াল ড্রেসিং টেবিল ভাবতে পারবে? ওর সামনে পোশাক পালটাতে পারবে? অসম্ভব। তবু এই ভালো। না হয় রাত্রে দরজাটা ভেজিয়ে রাখবে কিন্তু আলাদা ঘরে একা শোওয়ার স্বস্তিটা তো থাকবে। কোথায় যেন পড়েছিল, বিদেশে স্বামী-স্ত্রীরাও আলাদা ঘরে শোয় তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখতে।

ঘরটা বড়। স্যুটকেশ খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি বের করল রঞ্জন। একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার মনে। দু'জনের ঘর আলাদা হয়ে কতটা ভালো বা মন্দ হল ঠিক বুঝতে পারছিল না রঞ্জন। জীবনে প্রথমবার সে একটি নারীর সঙ্গে একত্রে থাকছে, সেটা অবশ্যই আলাদা ঘরে থাকলে শিহরিত হওয়ার কথা নয়। কয়েকদিন ধরে সে আজকের রাতটার কথা ভাবছিল। এই রাতটাকে অবশ্যই ফুলশয্যার রাত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখানে আসার পর দিশার আচরণে কোনও আবেগ না দেখে সেও সৌজন্যের বাইরে যেতে পারেনি। এখন দিশা যখন তার শোওয়ার ঘর নির্বাচন করে ফেলেছে তখন জোর গলায় বলতে পারেনি, আমিও তোমার ঘরে থাকব। মনে একটু ভার জমলেও পাশাপাশি একটা তিরতিরে স্বস্তি টের পাচ্ছিল রঞ্জন। এতটা বয়স একা একা থেকে এমন একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে যে কারও সঙ্গে রাত্রিবাস করার

কথা ভাবতে পারত না। অন্য কারও জন্যে নিজস্ব অভ্যেসগুলোর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলে মনে হত। আজ অন্য আবেগে আক্রান্ত হয়ে সেটাকে উপেক্ষা করতে যাচ্ছিল সে, না হওয়ায় যেন স্বস্তি এসে গেল চুপিচুপি।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসার ঘরে ঢুকে বুকে প্রথম জানলাগুলো খুলে দিল রঞ্জন। সামনের অনেকটা খোলা। সূর্য ডুবছে। ছায়া ছায়া বিকেল।

'কি দেখছ?'

দিশার গলা শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল রঞ্জন। সালোয়ার কামিজে এখন দিশাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। আকাশি নীল স্থির হয়ে আছে পোশাকে। এতদিন, যখনই দেখা হয়েছে ওকে শাড়িতে দেখেছে। সে দ্রুত এগিয়ে গেল। দুটো হাত দিশার কাঁধে রেখে বলল, 'তোমাকে কী সুন্দর লাগছে।'

দিশার গালে কি লালের ছোঁয়া লাগল, 'যাঃ।'

'আমায় দ্যাখো।'

'এই বয়সে কখনও সুন্দর লাগে?'

'কেন নয়? গায়ত্রী দেবী, ইন্দিরা গান্ধি, সুচিত্রা মিত্র সুন্দরী নন? অপর্ণা সেন, রেখা কি এখনও রূপসী নন? তাছাড়া প্রতিমার বয়স হয় না।' রঞ্জন বলল।

'মানে?'

'দুর্গাঠাকুর দু'শো বছর আগে যেমন সুন্দরী ছিলেন এখনও তাই আছেন।'

'এইবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' দিশার চোখে কপট রাগ।

দু'হাত কাঁধ থেকে সরিয়ে জড়িয়ে ধরল সে দিশাকে। নরম মেয়েলি গন্ধ, অনুভূতি, যেন ক্রমশ বাগিচা রঞ্জনের করায়ত্তে, সে দিশার গালে গাল রেখে বলল, 'তুমি আমার।' তার পরেই তার কপালে ভাঁজ পড়ল। মুখ সরিয়ে সে দিশার মুখ দেখল। থরথর করে কাঁপছে দিশা। সমস্ত শরীর যেন শক্ত হয়ে গেছে। হাত সরিয়ে নিলেই পড়ে যাবে। চোখ বন্ধ।

সে ফিশফিশিয়ে ডাকল, 'দিশা!'

দিশা সাড়া দিল না। যেন শুনতেই পায়নি তার ডাক। ধীরে ধীরে ওকে একটা সোফায় বসিয়ে দিল রঞ্জন বসার। বসার পরেই যেন চেতনা ফিরে এল, দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল দিশা। রঞ্জন হতভম্ব। সে এমন জোরে চেপে ধরেনি যে দিশা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে! আর অসুস্থ হওয়ার পর ওর এই কান্নার মানে কি!

সে বলল, 'দিশা, আমি সরি। আমি নিজেই বুঝিনি কি করছি!'

কাঁদছে কাঁদতে মাথা নাড়াল দিশা। যার মানে সরি বলার দরকার নেই। ঠিক তখনই বেল বাজল ঝমঝমিয়ে।

'তুমি ঘরে যেতে পারবে? কেউ এসেছে?

কান্না গিলল দিশা। তার পর ওড়নায় চোখ মুছল। দ্বিতীয়বার বেল বাজলে রঞ্জন বাধ্য হল দরজা খুলতে। বেশ স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী দাঁড়িয়ে।

'কেয়ারটেকার বাবু বলল আপনারা লোক খুঁজছেন।' মেয়েটি চোখ ফেরাল।
'ও হ্যাঁ। তুমি একটু পরে আসতে পারবে?' রঞ্জন বলল।
'পরে টাইম হবে না।' মেয়েটা সোজাসুজি রঞ্জনকে দেখল।
'ওকে ভেতরে আসতে বলো।' পেছন থেকে দিশার ধরা গলা ভেসে এল।
অগত্যা সরে দাঁড়াল রঞ্জন, মেয়েটি ভেতরে ঢুকল। দিশাকে দেখে বলল, 'আমার নাম মালা। মা মালা সিনহার ফ্যান ছিল তো। আপনি বউদি?'
দিশা চকিতে রঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কাজ করবে?'
'কেয়ারটেকারবাবু বললেন আপনাদের লোক দরকার। যদি তালাচাবি মিলে যায় করব।'
'বুঝতে পারলাম না।' দিশা বলল।
'আপনাদের যা প্রয়োজন তা যদি আমার অসুবিধে না হয় করব।'
'তোমার কি সুবিধে তা আগে বলো।' দিশা একটু একটু করে সহজ হচ্ছিল।
'দেখুন বউদি, আমি সকালে চার বাড়িতে কাজ করি। তখন টাইম নেই। বিকেলে দু'বাড়িতে কাজ করছি। একটা চারটে থেকে ছ'টা। আর একটা ছ'টা থেকে আটটা, ওই দ্বিতীয় কাজটা ছেড়ে দিতে যাই। ওই সময় আপনাদের দিতে পারি।' মেয়েটা একটা চেয়ারের দিকে তাকাল, 'ওখানে বসব?'
মাথা নাড়ল দিশা। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে পা নাচাতে লাগল মালা।
'কিন্তু আমাদের লোক দরকার সকালে। রান্নার জন্যে, ঘর পরিষ্কার করার জন্যে।'
'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমি রাত্রে রান্না করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেব, আপনি সকালে গরম করে নেবেন। আর সকালে ঘর পরিষ্কার করলে রাত্রে যা হবে, রাত্রে করলে সকালে তাই তো হবে।' মালা বলল।
দিশা রঞ্জনের দিকে তাকাল।
রঞ্জন বলল, 'আমরা যদি রোজ ছ'টার মধ্যে না ফিরে আসি?'
'চাবি দিয়ে যাবেন। একটা চাবি।' সহজ গলায় বলল মালা, 'ভেবে বলুন,আপনারা হয়তো সকাল ন'টায় বের হবেন। আমি যদি আটটায় আসি তাহলে কটা পদ খেয়ে বেরুবেন? তার চেয়ে রাত্রে রান্না করা থাকলে অনেকে সুবিধে।'
'বাজার হাট?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।
'ওটা যদি দাদাবাবু করে দেন ভালো। আমি কাঁচ পয়সায় হাত দিতে চাই না।'
দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাজটা ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'
'সত্যি কথা বলব বউদি?'
'আমি মিথ্যে কথা ভালোবাসি না।'
'দেখুন, আমি ওখান থেকে আড়াই হাজার পাই।'
'আড়াই হাজার!' রঞ্জনের গলা শুকিয়ে গেল।
'হ্যাঁ। সাড়ে বারো'শ রান্নাবান্নার জন্যে। দুই বুড়ো বুড়ি। বুড়ি বাতের ব্যথায় অষ্টপ্রহর

বিছানায় শুয়ে থাকে। বুড়োর খুব রস। রোজ তাকে ম্যাসাজ করে দিতে হয় আমাকে। তার জন্যে আরও সাড়ে বারো'শ দেয়।'

'আমরা তো তোমাকে এত দিতে পারব না।' দিশা বলল।

'কে চাইছে?' চোখ ফেরালো মালা, 'ওই বারো'শর জন্যে রোজ রাত্রে আশি বছরের বুড়োর শরীর চটকাতে ভালো লাগে? এখন ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নারকেল গাছ। যে কোনওদিন ভেঙে পড়বে। তবু কোমরের ওপরে আমার হাত উঠতে দেবে না। ঘেন্না ধরে গেছে বউদি। আপনি আমাকে ওই সাড়ে বারো'শ দেবেন। আপনাদের বাড়িতে তো কোনও বুড়োহাবড়া নেই।'

রঞ্জন চটজলদি বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথা শুনলাম। নিজেরা কথা বলে কেয়ারটেকারকে জানিয়ে দেব!'

'কিন্তু তার আগে যদি কাজ পেয়ে যাই তাহলে দোষ দেবেন না। আমরা গরিব মানুষ। হাতখালি করে বসে থাকতে পারি না তো!' উঠে পড়ল মালা।

'ঠিক আছে। তুমি কি আজ থেকে কাজে লাগবে?'

'তার মানে আপনি আমাকে রাখবেন?'

'হ্যাঁ', দিশা মাথা নাড়ল।

মাথা নাড়ল মালা, 'তাহলে কেয়ারটেকারকে ফোন করুন।'

'কেন?' দিশা বুঝতে পারল না।'

'আমি কে, সত্যি সত্যি উনি আমাকে পাঠিয়েছেন কিনা জেনে নিন। আজকাল তো আমাদের ছবি থানায় পাঠাতে হয়। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে কাজে লাগতে বলুন। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।' শেষ কথাগুলো মালা বলল রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে।

অগত্যা রঞ্জন রিসিভার তুলে যাচাই করে নিয়ে দিশার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

এবার খুশি হল মালা, 'আপনাদের রান্নাঘরটা বোধহয় ও দিকে। যাই আগে দেখে আসি।'

সে চোখের আড়ালে যেতেই রঞ্জন চাপা গলায় বলল, 'খুব টকেটিভ।'

দিশা হাসল, 'মনে হচ্ছে ভালো কাজ জানে।'

'একটু এক্সপেন্সিভও' আমাদের বাড়িতে যে রান্না করে সে বারশো পায়।'

'এ ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।' দিশা বলল।

'বউদি,' বলতে বলতে ফিরে এল মালা। সবই আছে দেখলাম। কিন্তু সবজি, মাছ, মাংস নেই। আজ রাত্রের খাবারটাও কালকের সঙ্গে করে দিচ্ছি। কী খাবেন?'

'যা হোক কিছু করে দাও।' দিশা বলল।

'ভাত বা রুটি?'

'আমি রুটি।' দিশা বললো।

'আমি ভাত খাই।' রঞ্জন বললো।

দু'রকমের ঝামেলা করবেন না বাবু।'

'ঠিক আছে, রুটি খাচ্ছি রাত্রে। সকালের জন্যে ভাত করো।'

'এবার আপনি যান। এক কেজি আলু, পাঁচশো পেঁয়াজ, আদা, লংকা, সবজি যা পাবেন আনবেন আর কাটাপোনা পাঁচশো। তাড়াতাড়ি ফিরবেন।' বলেই ভেতরে চলে গেল মালা।

'সর্বনাশ। আজই বাজারে যেতে হবে।' দিশার দিকে তাকাল রঞ্জন।

'খেতে হলে যেতে হবে।'

'আজকে আমরা কোনও রেস্টুরেন্টে খেতে পারতাম।'

'কাল সকালে কী করতে? আমার তো দশটায় ক্লাস।'

'বেস্ট ছিল কোনও হোম ডেলিভারি সংস্থাকে বলে দেওয়া।'

'তাই দাও।'

'কিন্তু একে তো কাজ করতে বলে দিয়েছ।' রঞ্জন বিরক্ত হয়েছে বোঝাল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল মালা, 'বউদি, দাদা তো এখানকার কিছু চেনে না, না? তাহলে তো এখন মুশকিলে পড়বে। ঠিক আছে, আমাকে টাকা দিন, প্রথম দিনটা আমিই বাজার করে দিচ্ছি। দাদা সঙ্গে যাক, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি।'

'তাই ভালো।'

টাকা নিয়ে রঞ্জন প্রস্তাবটা শুনে বলল, 'কোনও অসুবিধে হবে না। খোঁজ করলেই লোকে বলে দেবে। আমি একাই যাচ্ছি।' রঞ্জন বেরিয়ে গেল।

'ওই যাঃ! দাদা বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেল না।'

'কিনে নেবে।'

'কিনবে কেন? রান্নাঘরে চারটে ব্যাগ রয়েছে।'

'থাক।'

'আগে যেখানে থাকতে সেখানে দাদা বাজার করত না?'

'না।'

'তাই মুখ অমন হয়েছে!' হাসল মালা, 'তোমরা রান্নায় ঝাল খাও না মিষ্টি?'

'মাঝামাঝি।'

'তোমাদের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে?'

'কেন?'

'না, দাদা ও ঘর থেকে বের হল, তোমার জিনিস দেখলাম ও পাশের ঘরে। বেশিদিন বিয়ে হয়ে গেলে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীরা দেখেছি আলাদা শোয়।' মালা বলল।

দিশা হাসার চেষ্টা করল।

'অবশ্যি এক সঙ্গে শোওয়া পার্টি দেয় হয়তো দেখেছি। দিনভর ঝগড়া, সন্দেহ, গালমন্দ অথচ রাত্রে এক বিছানায় শোয়? কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। খেয়োখেয়ি করেও একসঙ্গে থাকবে, ছাড়বে না। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল,

সে খেয়োখেয়ি শুরু করতে, এক বছর মানিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। যখন দেখলাম শুধরাল না তখন লাথি মেরে বেরিয়ে এলাম। সবাই বলে, মালা আবার বিয়ে কর। পুরুষগুলো দিনরাত ছোঁক ছোঁক করে। অথচ বলি ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়?' মালা কথা বলে চলেছিল।

'তাহলে এত রোজগার করছ কেন?'

'ভবিষ্যতের জন্যে বউদি। যখন শরীর ভাঙবে, পরিশ্রম করোতে পারব না, কেউ ফিরেও তাকাবে না তখন বাঁচতে হবে না?' বলে হাসল, 'তোমাদের দেখে ভালো লাগল।'

'কেন?'

'এই এত বড় বাড়িতে যত ফ্ল্যাট আছে, তার দশটার মধ্যে ন'টায় স্বামী-স্ত্রী সুখে নেই গো। তিনটে বউদি যে দুপুরে ফুর্তি করতে যায় তা আমি জানি। স্বামী সব জেনেও চুপ করে থাকে। একে কি বিয়ে বলে, বলো বউদি!' মালা বলল, 'যাই চা নিয়ে আসি।'

রাতের খাবার সাড়ে ন'টায় খেয়ে নিল ওরা। ঠিক সওয়া আটটায় মালা চলে গেছে। খেতে খেতে রঞ্জন বলেছিল, 'নাঃ, মেয়েটা ভালো রাঁধে।'

'শুধু বেশি বকা ওর দোষ।' দিশা বলেছিল।

'তা করুক। জানো, জীবনে আজ প্রথমবার বাজার করলাম। বাজারে ঢোকার পর বুঝলাম ব্যাপারটায় বেশ থ্রিল আছে।'

'কোনো কিছু করার আগে বোঝা যায় না সেটা ভালো না খারাপ।'

তারপর বাইরের আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল রঞ্জন। দরজায় শব্দ হতে ফিরে তাকাল। দিশা দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো!'

'না, একটা কথা বলতে এলাম।' দিশার গলার স্বর প্রায় খাদে।

'হ্যাঁ, বসে বলো না।' রঞ্জন চেয়ার ছেড়ে খাটে গিয়ে বসল।

দিশা চেয়ারে বসল। বসে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?'

'না না। দ্যাখো, আজ আমাদের প্রথম দিন, প্রথম রাত। আমাদের আলাদা থাকা উচিত নয়। কিন্তু, ভেতরে ভেতরে কিরকম একটা আড়ষ্টতা, তোমাকে বোঝাতে পারব না! এটা ভাঙা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?' কাঙালের দৃষ্টি দিশার চোখে।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলো, তোমার বা আমার ঘরে নয়, ও পাশের খালি ঘরটায় আমরা একসঙ্গে থাকি। আমাকে একটু সময় দাও—।'

নীল আলো জ্বলল। পাশাপাশি শুয়ে ওরা গল্প করছিল। রঞ্জন দিশার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছিল। একটা জোক শুনে দিশা ছেলেমানুষের মতো হাসল। তারপর রঞ্জন বলল, 'এই, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

দিশা বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ো।'

দু'জনের মাধ্যে তখন মাত্র এক ইঞ্চির ব্যবধান।

ইঁদুরের কল

নিরাপদ একজন বাঙালি প্রৌঢ়ের নাম, যার কোনও উজ্জ্বল অতীত নেই। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে সে মনে করে না। বর্তমানে সে সদাগরী অফিসে চাকরি করে, যা বেতন পায় তাতে তিন বেলা খাওয়া, ইলেকট্রিক বিল মেটানো, ঠিকে ঝি-এর মাইনে, কেবল-এর পাওনা মিটিয়ে মন্দ থাকে না। তবে প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতেই অনেকটা বেরিয়ে যায়।

নিরাপদর অফিসে যাতায়াতের খরচ নেই। তিন কিলোমিটার পথ সে হেঁটেই যায়-আসে। এতে শরীর চাঙ্গা থাকে, পয়সা বাঁচে এবং ধুতি ও শার্ট নষ্ট হয় না। বাসে উঠলে সোমবারে ভাঙা পোশাক মঙ্গলবারে পরা যায় না। নিরাপদ হেঁটে অফিসে গিয়ে টুলে বসে কাজ করে, চেয়ারে বসলেই হেলান দিতে হয় তাতে শার্ট ভাঁজ পড়তে বাধ্য। কোথাও গেলে কখনই বসে পড়ে না। সোমবারে ভাঙা ধুতি-শার্ট শনিবারে দেখলে যে কেউ ভাববে আজই নিরাপদ পরেছে ওগুলো। শুধু শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমাহলের সিটে আরাম করে হেলান দেয় সে। কারণ রবিবার ওগুলো কেচে ফেলবে।

বলা অনাবশ্যক, নিরাপদ অবিবাহিত। গত পঁয়ত্রিশ বছরে হিন্দি চলচ্চিত্রের নায়িকারা ছাড়া কোনো নারী তার জীবনে আসেনি। শনিবারে দেখা সিনেমার নায়িকার সঙ্গে সে দিব্যি সাতদিন থাকতে পারে। বাবা মারা গিয়েছেন ছেলেবেলায়, মা গত হয়েছেন বছর দশেক আগে, দাদার বাসায়। নিরাপদর মনে হয় সে দিব্যি আছে।

নিরাপদ কোনো রাজনীতি করে না, অফিস ইউনিয়নের ঝুট-ঝামেলায় সে নেই। এ কারণে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে পালটা অজুহাত দেখায় না, হাসিমুখে মেনে নেয়। নিরাপদ এতদিনে বুঝেছে, যে কোনো উত্তেজনার আয়ু ক্ষণস্থায়ী। ঠিকে ঝি থাকা সত্ত্বেও সে নিজেই রান্না করে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর আজকাল মনে হয়, এত পরিশ্রম করে যা তৈরি হল তা খেয়ে ফেললেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকে প্রবল খিদে সামান্য খাবার পেলেই উধাও হয়ে যায়। এসব বিষয়ে ভাবতে তার ভালো লাগে।

ইদানিং নিরাপদ তার টিভির নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেসব চ্যানেলে ভূতের গল্প দেখায় তাদের খুঁজে বের করেছে। মানুষ মারা গেলে ভূত হয়। বেঁচে থাকার সময় যাকে কেউ পাত্তা দেয় না ভূত হলে তার ভয়ে কাঁপে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে নিরাপদর কাছে। মুশকিল হল এইসব অনুষ্ঠান হয় রাত দশটার পরে। ফলে এগারোটার

সময় বিছানায় শুয়ে চট করে ঘুম আসে না। ড্রাকুলা, ঘোস্ট, ভূত, পেত্নি, শাকচুন্নিদের মিছিল শুরু হয়ে যায় চোখের সামনে। কয়েকদিন আগে একটু সর্দি হয়েছিল নিরাপদর। কড়া রোদে হেঁটে অফিসে গিয়েছিল, বোধহয় সেই কারণেই বিকেল থেকে শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। সন্ধেবেলায় শুয়ে পড়েছিল, খাওয়ার জন্যেও ওঠেনি। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোলে বেশ আরাম হয় নিরাপদর।

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চাদর সরাল মুখ থেকে। ঘর অন্ধকার। শব্দটা মানুষের গলা থেকে বের হচ্ছে, গোঙানির। তাজ্জব হয়ে গেল নিরাপদ। এই ঘরে মানুষ কি করে গোঙাতে আসবে। ঘোস্ট নয় তো? ড্রাকুরা কখনও গোঙাবে না। একবার ভাবল চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকাই উচিত। টিভিতে যাদের দেখলে শিহরন জাগে, সামনাসামনি দেখা ঠিক নয়। কিন্তু সেই সময় ঘরে নীল আলো জ্বলে উঠল। চোখ খুলতেই চমকে গেল নিরাপদ। একটা রোগা বেঁটে লোক চেয়ারের ওপর পা তুলে ঝুঁকে কিছু দেখছে। এই যদি ভূতের চেহারা হয় তাহলে উঠে বসাই যেতে পারে। চাদর সরিয়ে উঠে বসতেই লোকটা ফিনফিনে নীল আলোয় তাকে দেখতে পেয়েই নাকি গলায় খিঁচিয়ে উঠল, 'অদ্ভুত মানুষ তো! ঘর ভর্তি ইঁদুর পুষে রেখেছেন। উঃ বুড়ো আঙুলে এমন কামড়েছে যে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

'ইঁদুর!' নিরাপদর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'সেকি!'

'ন্যাকামি হচ্ছে? জানেন না? এ ঘরে আপনি ইঁদুর পোষেন না? উঃ!'

'দিনের বেলায় ওরা থাকে না। তাহলে আজ রাত্রে কোনো গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছে।' নিরাপদ বিছানা থেকে নেমে বড় আলোটা জ্বাললো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বলে উঠল, 'এই সেরেছে, কড়া আলো জ্বালার কি দরকার? উঃ।'

নিরাপদ মেঝেতে তাকাল, কোনো ইঁদুরকে দৌড়োতে দেখল না। তারপর লোকটিকে দেখল। এরকম নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। তার ওপর চ্যাপলিনের মতো গোঁফ রেখেছে। নিশ্চয়ই এটা আসল চেহারা নয়। ভূতেরা তো ইচ্ছেমতো চেহারা ধরতে পারে। কড়া আলো তারা সহ্য করতে পরে না।

সে ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?'

লোকটা গোল গোল চোখে তাকাল। নিরাপদর মনে হল এখনই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সুযোগ এসেছে যখন তখন সেটা হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই চটপট বলল, 'আপনি অতিথি, অতিথিকে নারায়ণ বলা হয়।'

'নারায়ণ? না আমার নাম নারায়ণ নয়। উলটোপালটা বলবেন না।'

'আপনি এখানে কেন এসেছেন যদি দয়া করে জানান।'

'মাল হাতাতে। যাকে লোকে চুরি বলে। বুঝলেন? আমি একজন চোর। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢোকার পরে অনেকক্ষণ বাইরের দরজাটা খুলে রেখেছিলেন। তখনই নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিলাম। তারপর দেখলাম চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ধীরে

সুস্থে খাবার খেয়ে মাল যা নেবার নিয়ে সটকে পড়তাম, টেরও পেতেন না। কিন্তু খাওয়ার পর মনে হল অনেক সময় আছে। একটু রেস্ট নিই। ওই চেয়ারে বসে রেস্ট নিতে গিয়ে একটু ইঁদুরের গায়ে পা দিয়ে ফেলতেই ব্যাটা অসভ্যের মতো কামড়ে দিল। উঃ।'

'তার মানে আপনি ভূতপ্রেত নন, একজন চোর।'

'আশ্চর্য! ভূতপ্রেতের কি শরীর থেকে রক্ত বের হয়?'

'তা ঠিক জানি না। তবে রক্ত চুষে খায়। ড্রাকুলা বলে তাদের।'

'দুর। ওরা তো সাহেব মেমসাহেব ভূত। বেঁচে থেকে মানুষের রক্ত চুষে বড়লোক হত, মরে গিয়ে খাঁটি রক্ত চোষে। ওষুধ আছে কিছু?'

'ওষুধ?' নিরাপদর খেয়াল হল। তুলো, ডেটল আর ব্যান্ডেজ বের করে বলল, 'পা চেয়ারে তুলুন ভাই।'

ভালো করে বেঁধে দিতেই চেয়ারে বসে পড়ল লোকটা, 'আমাকে নিতাই বলে ডাকবেন, রাতটা এখানেই থেকে যাই। আপনি মানুষটা খারাপ নন। তাই কথা দিচ্ছি কোনো কিছু চুরি করব না।

'আপনি কোথায় থাকেন নিতাইবাবু?'

'চোরেরা ঠিকানা বলে না। জানেন না? আচ্ছা, একজন চোর দেখেও আপনি চ্যাঁচামেচি করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন না কেন?

'আপনাকে প্রথমে চোর বলে ভাবিনি। রোজ ভূতের ছবি দেখি তো, তাই ভেবেছিলাম।' লজ্জা লজ্জা গলায় বলল নিরাপদ।

'আপনি স্বচক্ষে তাদের দেখেছেন?' নিতাই জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল নিরাপদ, 'না'।

'আপনি কখনও কলকাতার বাইরে যাননি?'

আবার মাথা নেড়ে 'না' বলল নিরাপদ।

'তাহলে আর কি করে বলবেন। বাপের মুখে শুনেছি, এককালে এই কলকাতায় চোরেরা বেশ ভালোভাবেই ছিলেন। ভারত স্বাধীন হতেই তেনারা কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।'

'তার মানে?' নিরাপদ অবাক।

'ওই যে স্বাধীনতার পর দেশ দুটুকরো হল, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে এল পাকিস্তান থেকে, আর এসে জমে গেল এই কলকাতাতেই, বাপের মুখে শুনেছি। তেনারা আর শান্তিতে থাকতে না পেরে চলে গেলেন গ্রামেগঞ্জে। থাকগে, আঙুলটা কনকন করছে।'

'একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন, ইনজেকশন, টিনজেকশন-?'

বিরক্ত হল নিতাই, 'দেখছেন চুরি করে খাই। আজকের রাতটা বেকার গেল। আর খরচা বাড়াতে বলবেন না তো! তার চেয়ে রাত তো বেশি নেই, এখানেই ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়? অবশ্য আলো ফুটলে যদি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে

জানিয়ে রাখি, সঙ্গে ছুরি আছে, ক্যাঁক করে পেটে চালিয়ে দেব।'

'না না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে পুলিশে দিলে আমাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। অফিস কামাই করে যেতে হবে সাক্ষী দিতে। তাছাড়া আপনি কত জানেন। ভারত ভাগের জন্যে যেসব সমস্যা হয়েছে তার এই দিকটার কথা তো জানতামই না। আমি চাদর আর বালিশ দিচ্ছি, আপনি ঘুমোন।' নিতাই বলল।

কিছুক্ষণেই মধ্যেই নিতাই এতজোরে নাক ডাকাতে শুরু করল যে উঠে বসল নিরাপদ। কোনো চোরের এভাবে নাক ডাকা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল সে নিতাইকে জাগাতে, এত জোরে নাক ডাকছে যে আমি ঘুমোতে পারছি না।

'ওই মুশকিল। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পর কিছুতেই আওয়াজটাকে কমাতে পারিনি। একবার এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই শালার নাক ডাকার জন্য ধরা পড়ে রামঠ্যাঙানি খেয়েছি। তবে কি জানেন, যে বাড়িতে কেউ এরকম নাক ডাকে সে বাড়িতে নিশির ডাক শোনা যায় না। নিরাপদে থাকে সবাই।' নিতাই উঠে বসল।

'নিশির ডাক?' নিরাপদ পুলকিত হল।

'জলার ভূত। পরিচিত লোকের গলা নকল করে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে জলে ডুবিয়ে মারে। শুনেছি সঙ্গীর অভাব হলেই এইরকম করে।'

'এসব সত্যি?'

'সত্যি মানে?' আপনি বিশ্বাস করেন না? কাউকে না দেখালে যে মিথ্যে হয়ে যাবে? অদ্ভুত কথা!' খেঁকিয়ে উঠল নিতাই।

'বিজ্ঞান বলছে ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। ওগুলো নাকি কুসংস্কার। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন ওঁরা।'

'তাই? ওঁরা কি ভগবান দেখেছেন? কেউ দেখেছে। যে দেখেছে সে কি আর পাঁচজনকে ডেকে দেখাতে পেরেছে? পারেনি। তাহলে ভগবান বলে কিছু নেই। ওদের বলুন না এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। মেরে পাবলিক বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। ভূতেরা অনগ্রসর বলে তাদের নিয়ে যা খুশি করা যায়, না?' বেশ খেপে গেল নিতাই। তারপর রায় দিল, 'শুনুন মশাই মানুষ মরে গেলে ভূত হয়, মরে যাওয়ার পর কেউ ভগবান হয় না। আপনি দেখতে চান?' একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল নিরাপদ।

নিরাপদর অফিসে পরপর দুদিন ছুটি। নিতাই বলে গিয়েছিল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে শালিমার স্টেশনে চলে আসতে। স্টেশনটা ঠিক কোথায় জানা ছিল না। পৌঁছোতে দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। নিতাই পাজামা আর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝটপট টিকিট কাটুন। দুটো দিঘা। ট্রেন ছাড়ল বলে।'

জনমানুষশূন্য বিশাল প্লাটফর্মের পাশে দাঁড়ানো ট্রেনে পা দিতেই সেটা চলতে শুরু করল। নিতাই শুঁটকি মাছের চেহারা নিয়ে বসামাত্রই ঢুলতে শুরু করল। নিরাপদ

বসল না। এই শার্ট ধুতি আরও দুদিন চালাতে হবে। সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেঁটে দরজার পাশে গেল। খবরের কাগজে পড়েছে এরকম একটা ট্রেনের কথা যা সাততাড়াতাড়ি দিঘায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু তারা এই ট্রেনে ফিরতে পারবে না। নিতাই আশ্বাস দিয়েছে, রাতের বাস ধরে ভোরে ফিরে যাবে কলকাতায়। নাঃ শার্টটা বাঁচানো গেল না। রাতের বাসে তো বসেই যেতে হবে। নষ্ট যখন হবেই তখন আর কষ্ট করে কি লাভ, নিরাপদ একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ল।

ট্রেন থেকে নেমেই নিতাই বলল—'শরীর খাবার চাইছে। কষ্ট না দেওয়াই ভালো, চলুন।' একটা পাইস হোটেলে ঢুকে সে-ই ভাততরকারি মাছের অর্ডার দিল। ওই রকম একটা শুঁটকো লোক যে অত ভাত খেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করত না নিরাপদ। হাত ধোয়ার পর নিতাই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি দাম দেবেন?'

'মানে?'

'না দিতে চাইলে দৌড়োতে হবে। দৌড়োতে পারবেন তো?'

'ভ্যাট।' বলে নিরাপদ দাম মিটিয়ে দিতে দেখল পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে গেল।

একটা ভ্যান রিকশাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে নিরাপদকে নিয়ে উঠে বসল নিতাই। 'ইচ্ছে করলে আধশোয়া হতে পারেন। অনেকটা পথ।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তেনাদের দেখতে।'

নিরাপদ চারপাশে তাকাল। দূরে বালির ঝড় উঠেছে। ঘন্টাখানেক বাদে ভ্যানওয়ালা বলল, 'আর যাবে না।'

নিতাই তর্ক করল কিন্তু লোকটা অনড়। অতএব তিরিশ টাকা লোকটার হাতে গুনে দিতেই নিরাপদ শুনল, 'আপসোস করবেন না। সুদে মূলে উশুল হয়ে যাবে।'

'মানে?' খিঁচিয়ে উঠল নিরাপদ।

'হাঁটুন।' নিতাই হাঁটতে শুরু করল।

বালি, কাঁটাঝোপ, চড়াই-উতরাই বিশাল ঝাউগাছের জঙ্গল। নিতাই বলল, 'এসে গেছি। ওই দেখুন। গাছের ডালে কত ন্যাকড়া বাঁধা রয়েছে, দেখছেন তো, ওগুলো শুধু ন্যাকড়া নয়, তেনাদের আস্তানা। দিনের বেলায় ওখানে থাকেন।'

'সেকি!' গা ছমছম করে উঠল নিরাপদর। কোনো লোক তো চোখে পড়ছে না। একটা ছাগলও নয়। সন্ধের পরে জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনে কখনও কোনো ব্যাপারে সে উৎসাহ দেখায়নি। কি দরকার ছিল এই নিতাইয়ের কথায় নাচার? টিভিতে ভূতের অনুষ্ঠান দেখেই তার কাল হল। পকেটে এখন শ'তিনেক আছে। নিতাই-এর লোকজন যদি সেটা ছিনতাই করে নেয় তাহলে তো কলকাতায় ফেরাই হবে না। এই সময় নিতাই বলল, চলুন, ক্ষেন্তির ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে।'

'ক্ষেন্তি? ক্ষেন্তি কে?' নিরাপদ শুনল ঝাউগাছে হাওয়ায় অদ্ভুত শব্দ তুলছে।

'আমার ওয়াইফ।' ঝাউগাছের জঙ্গলে ঢুকল নিরাপদ।

সামনে কয়েকটা ঝাউগাছের আড়াল, মাঝখানে অনেকটা খোলা বালিতে সে একটি সুন্দর বাঁশ-বাখারির ঘর দেখতে পাবে কল্পনা করেনি নিরাপদ। ঘরটির উলটে দিকে একটা চালার নিচে ভয়ঙ্কর নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে হাঁড়িকাঠ। নিতাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'ইনি মা নরকেশ্বরী। খুব জাগ্রত দেবী, প্রতি শনিবার এবং অমাবস্যায় এইখানে শয়ে শয়ে ভক্ত আসেন। এসে তাঁরা সপ্তাহের ভোগ নিয়ে যান অন্যদিন তাঁদের আসা নিষেধ। কুকুরগুলো কোথায়?' চারপাশে তাকাল সে।

'কুকুর?'

'হ্যাঁ। ছয়টি কুকুর এই জায়গা পাহারা দেয়। আজ কোথায় গেল? নিতাই ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মারতেই নারীকণ্ঠের হুঙ্কার শোনা গেল। 'কে? কে ওখানে? এতবড় সাহস? এখানে আসার দিন যে আজ নয় তা ভুলে গেছিস?' তড়িঘড়ি নিতাই বলে উঠল, 'আমি, আমি গো নিরাপদ, বাবুকে নিয়ে আসতে হল।'

'আবার শঙ্করাকে সঙ্গে এনেছ। সে তোমাকে কোন্ বৈতরণী পার করাবে। অ্যাঁ?' ঘরের দরজায় যিনি আবির্ভূত হলেন তাঁকে দর্শন করে হাঁ হয়ে গেল নিরাপদ। নিতাই-এর থেকে অন্তত এক ফুট বেশি লম্বা, চূড়া করে বাঁধা চুল, স্থূলাঙ্গি হলেও শরীরে বাঁধুনি আছে, গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো, আর চোখ যে কারও অত বড় হয়, টানা হয় জানো ছিল না। সেই চোখ ঘুরিয়ে তিনি নিরাপদকে দেখলেন। তারপর অদ্ভুত হেসে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত আসা হল।'

নিরাপদ বলল, 'অ্যাঁ।'

'জন্মের মধ্যে কর্ম এই একবারই করলে। পুরুষমানুষ মানেই লোচ্চা, লম্পট, মনে শরীরে কীট কিলবিল করছে। কিন্তু এতো দেখছি অনাঘ্রাত ফুল। আহা! প্রকৃত আধার।' একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'বসা হোক।'

'তবে? মাঝরাতে আলাপ হয়েছে, তবু ঠিক চিনেছি। কুকুরগুলো কোথায়?'

'ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। সন্ধের মুখে জাগবে। তা নামখানা কি?'

নিরাপদ দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন, তাই সে মুখ খুলল, নিরাপদ মিত্র।'

'কুটিল কায়েত। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না। আগমনের কারণ?'

'তেনাদের দেখতে চায়।' নিতাই টুক করে বলল।

'চুপ! নিশ্চয়ই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে। ঠিক কিনা?'

মাথা নাড়ল নিতাই, 'তুমি মাইরি কি করে যে সব ঠিকঠাক বলে দাও। ওই আর কি!'

'এবার দূর হও।'

'তা কি করে সম্ভব? ওঁকে নিয়ে এসেছি, ফেরত নিয়ে যেতে হবে। আসলে ওঁর বাসনা তেনাদের দেখবেন। সন্ধের পরে যদি দেখিয়ে দাও তাহলে রাতে বাস ধরব আমরা। কথা দিচ্ছি, একটাও কথা বলব না, মুখে কুলুপ মেরে পড়ে থাকব।'

'তুমি এই চৌহদ্দিতে থাকবে না। যাও, দিঘার বাস গুমটিতে গিয়ে বসে থাকো। আপদ।' দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন তখনই, 'এই নাও, পঞ্চাশ টাকা। যা গিলবার সেখানে গিয়ে গেলো।'

খপ করে টাকাটা নিয়ে নিতাই নিরাপদ দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'তাহলে আমি চলি। সাধ মিটে গেলেই চলে আসবেন দিঘার বাসগুমটিতে।'

'কিন্তু—।'

'আচ্ছা, আমরা যেখানে ভ্যান রিকশা থেকে নেমেছিলাম সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব।' হনহনিয়ে চলে গেল নিতাই।

'এই যে গামছা আর ধুতি। পাশেই পুকুর আছে, ডুব দিয়ে আসা হোক। পথের ময়লা ধুয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা করি।'

গামছা আর কাপড় হাতে নিয়ে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'এসব না করলেই নয়?'

'দুষ্টু। জলে নামতে এত ভয় কেন? এদিকে যে বেলা পড়ে যাচ্ছে।'

স্নান শেষে ধুতি পরে গা মুছে নিজের ধুতি গেঞ্জি শার্ট পরিপাটি ভাঁজ করে ফিরে আসতেই কোথাও শিয়াল ডেকে উঠল ভর বিকেলে।

'আয় আয় চলে আয়। খাবারের গন্ধ পেয়েছে। আয় রে।' আধ থালা ভাত নিয়ে ঘরের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো শিয়ালটা। মাটিতে ঢেলে দেওয়া ভাত গোগ্রাসে খেয়ে চুপচাপ বসে রইল।

এক থালা ছাড়ানো ফল ঘরের দাওয়ায় রেখে তিনি বললেন, 'খাওয়া হোক।'

নিরাপদর ফল খাওয়া অভ্যেস নেই। বারান্দার এক কোণে শার্ট ধুতি রেখে সে মাথা নাড়ল, 'আমার খিদে পায়নি।'

'অ। যখন পাবে খেয়ে নিলে খুশি হব। যাই পুজোয় গিয়ে বসি।'

মহিলা গিয়ে বাবু হয়ে বসলেন—মা নরকেশ্বরীর সামনে। প্রদীপ জ্বাললেন। তারপর হাত জোড় করে যা গাইতে লাগলেন তার মাথা বুঝল না নিরাপদ। অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আকাশে একটু মেঘ। হাওয়া নেই।

মহিলা মন্ত্রপাঠ করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা বসে থাকা নিরাপদর সামনে এসে তার বুকে হাত রাখলেন, 'তেনাদের দেখতে চেয়েছিলি?'

হকচকিয়ে গেল নিরাপদ, 'না, মানে—।'

'কাকে দেখবি? ব্রহ্মদত্যি? মামদো ভূত, মেছো ভূত, জলার ভূত, ঝাউ ভূত, না শাঁখচুন্নি কাকে দেখার ইচ্ছে তোর?' এতক্ষণ ভাববাচ্যে কথা হয়েছে, এবার সরাসরি তুই।

কেঁপে উঠল নিরাপদ, 'কাউকে না।'

'তাহলে এসেছিস কেন?'

'বিশ্বাস হয়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তেনারা আছেন।'

'না দেখলে ফিরতে পারবি না। ঠিক করে বল, কাকে দেখবি?' ভয় নেই তোর,

আমি তো আছি।' হাত সরাল না নারী।

'ডা-ডা-ড্রাকুলা!'

'সেটা আবার কে? কোনো হিন্দু ভূতের ওই নাম হয় না। ঠিক আছে, তুই বাড়ি যা, তবে তোর সঙ্গে একজন শাঁখচুন্নিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও এখানে থাকতে চাইছিল না। ও তোকে পাহারা দেবে বাকি জীবন, তোকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। অন্য ভূতেরা টের পাওয়ার আগেই ওকে নিয়ে চলে যা। যাঃ।'

সেই ফিনফিনে অন্ধকারে হাঁটা শুরু করে শেষপর্যন্ত দৌড়োতে লাগল নিরাপদ। পেছনে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখতে সাহস পাচ্ছিল না কোনো শাঁখচুন্নি পেছন পেছন আসছে কিনা। বাসগুমটিতে যখন পৌঁছোল তখন নিরাপদর শরীরে শক্তি নেই। লোকজন ভিড় করল। নিতাই উদয় হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি! আপনি। ধুতি-শার্ট কোথায়? রেখে এসেছেন ওখানে? চলুন ফেরত নিয়ে আসি।'

নিরাপদ কোনোমতে না বলল। নিতাই একটা ট্রাক ড্রাইভারকে ধরে নিরাপদকে নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। তারপর থেকে সে আর ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে তার ঘরে কেউ আছে। উঠতে বসতে পাশ ফিরতে মনে হচ্ছে সে এখন আর একা নেই। নিরাপদ এখন ধুতি জামা পরে খাটে চেয়ারে স্বচ্ছন্দে বসে। এখন আর নিজেকে একা মনে হয় না।

শুধু তার ঘরে ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে।

কুসুম আমি জানি তুমি ভাল নেই

এক চৈত্রের দুপুরে জনমানবহীন ছোটনাগপুরের মালভূমিতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। মাথার ওপর আগুন, পায়ের তলা পুড়ছে। যেদিকে তাকাই খাঁখাঁ শূন্যতা। সবুজের চিহ্ন নেই। প্রকৃতি যে কত রুক্ষ হতে পারে তার একটা ধারণা হয়েছিল তখন। তোমায় দেখে আজ সেই ছবিটাই মনে এল। কুসুম, তুমি এত নিরাসক্ত হয়ে গেলে কি করে? বর্ষার মেঘে তা থইথই আকাশে যৌবনের যে আনন্দ তা কি করে হারিয়ে যায় চৈত্রের শুষ্কতায়? আজ এতকাল পরে তোমাকে দেখেই বুঝলাম, কুসুম, তুমি ভালো নেই। পাহাড়ি স্টেশনে নেমে চারধারে তাকানোর পর নিজেকেই আগন্তুক বলে মনে হয়েছিল আমার! অথচ সেই বাল্যকালে, আমাদের চোখের সামনে রেললাইন পাতা হয়েছিল, ট্রেন এসেছিল মালা পরে। দিনে দুবার তার যাওয়া-আসা। স্টেশনের বাইরে চালাঘরে হরিপদকাকা চায়ের দোকান খুলেছিল। দুবারের ট্রেনে কি আর বিক্রি হত তার। প্রথম স্টেশন মাস্টারের নাম ছিল ঘনশ্যাম ধাড়া। তাঁকে নিয়ে কত হাসাহাসি। চেহারার সঙ্গে নামের এমন রাজযোটক মিল বড় একটা চোখে পড়ে না। লাগোয়া রেল আবাসে ঘনশ্যাম ধাড়া একাই থাকতেন। টিকিট বিক্রি থেকে ট্রেনকে পতাকা দেখাতে কি আর সময় ব্যয় হত। সারাটা দুপুর আমগাছের নিচে বসে তিনি হরিপদকাকার সঙ্গে ফিস খেলতেন। তারপর আরও একজন বাড়লে, টোয়েন্টি নাইন।

আজ আমার মনে ছবিগুলো এল। কিন্তু হরিপদকাকার দোকানটা বেশ বড় হয়ে গেছে। তার জায়গায় আরও দশটা দোকান। রিকশার ভেঁপু, কুলিদের হইচই। শুনলাম দিনে দশবার ট্রেন দাঁড়ায় স্টেশনে। এখনকার স্টেশন মাস্টার ছিপছিপে সুদর্শন। কথা বলে শুনলাম, ইংরেজি শব্দ বেশি ব্যবহার করেন।

কুসুম, তুমি আর আমি প্রথম দিনের ট্রেন দেখতে এসেছিলাম এখানে। অবশ্য তখন স্টেশনটা তখনকার আমাদের মতো ছিল। এখনকার সব শহরের মতো, তখন আমাদের অনেকের বাড়িতে রেডিয়ো ছিল না। টিভির কথা কেউ শোনেনি। কিন্তু তখন আমাদের আনন্দের অভাব ছিল না।

কুসুম, তখন তোমার বয়স আট, আমি এগারো। প্রথম যেদিন ট্রেন আসবে, আমাদের স্টেশনে সেদিন মফস্‌সল শহরটা প্রায় খাঁ খাঁ করছিল। সবাই এসে ভিড় করেছে স্টেশনে দুপাশে। দুটো লাইন সমান্তরাল ওই দিগন্ত থেকে ছুটে এসে অন্য দিগন্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। নতুন কোট প্যান্ট, মাথায় টুপি, হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘনশ্যামবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করছেন। বড়রা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বলছেন, সময় নেই, মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছেন, ট্রেন লাইনে যেন কেউ এসে না দাঁড়ায়। হরিপদকাকা চা বিক্রি করে কূল পাচ্ছে না। এইসময় ঝমঝম করে ট্রেন এল। ইঞ্জিনের গায়ে আগের স্টেশনগুলোয় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। এখানকার বড়রাও পরালেন।

ঘনশ্যামবাবু গার্ডের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ট্রেন ছাড়ল। ঠিক তখনই কুসুম, তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে?'

'কি জানি?'

'অনেক অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ। লন্ডন দিল্লি—।' আমার যা মনে পড়েছিল তাই বলেছিলাম।

'যাবে? যাবে একদিন?' তুমি বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলে।

'ধেত। বাড়ি থেকে ছাড়বে না। টাকা লাগবে, কোথায় পাবি।'

তুমি আর কোনো কথা বলোনি!

রিকশায় উঠলাম। বিহারি রিকশাওয়ালা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম লোকটা কাজের ধান্দায় এখানে এসেছিল দশ বছর আগে। এসেই রিকশা চালাচ্ছে। লোকটা জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাব? সেটা আমিও ভাবছিলাম। আমাদের বাল্যকালে এই মফস্সল শহরে কোনো হোটেল ছিল না। রামলাল আগরওয়ালা একটা ধর্মশালা বানিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে অবাঙালি ব্যবসায়ীরাই উঠত। ভেবেছিলাম সেখানেই যেতে হবে। কিন্তু স্টেশন চত্বরের এত পরিবর্তন দেখে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে ভালো হোটেল হয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবু। চারটে ভালো হোটেল, একটা খুব ভালো হোটেল।'

'খুব ভালোটায় নিয়ে চল।'

একটু বাদেই যে শহরটাকে আমি দেখতে পেলাম তা আমার অচেনা, দারুণ দারুণ দোকান, নতুন বাড়ি, বিউটি পার্লার থেকে এ টি এম, টিভির শোরুম থেকে পিজার দোকান,যা আছে সব আধুনিক শহরে এখানে তা পাশাপাশি সাজানো, রাস্তাগুলো অনেক চওড়া হয়েছে। যেন আলাদিনের দৈত্য এসে বদলে দিয়ে গেছে সব। আর তখনই আমার ভয় করতে লাগল, কুসুম, তুমি আছ তো, এই শহরে?

খুব ভালো হোটেলের সামনে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ইন এবং আউট লেখা দুটো গেট, মাঝখানে অনেকটা সুন্দর লন, ওপাশে ঝকঝকে পাঁচতলা বাড়িটার ওপর লেখা আছে ডে অ্যান্ড নাইট। এত বড় বাড়ি তখন কেউ এখানে চোখে দেখেনি। রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে সুটকেস নিয়ে কাচের দরজা ঠেলে পা বাড়াতেই ঠান্ডা লাগল বেশ। বুঝলাম ঠান্ডা মেশিন চলছে। রিসেপশনিস্ট মিষ্টি হেসে বলল, 'ইয়েস!'

প্রতিদিন থাকার জন্যে আড়াই হাজার দিতে হবে। সেসময় কোনো কোনো বাড়ির কর্তা ওই মাইনের চাকরি করতেন। লিফটে উঠলাম তিনতলায়। প্ল্যাস্টিকের কার্ড ঢুকিয়ে দরজা খুললাম। যে কোনো ফোর স্টার হোটেলে এরকম ঘর দেখতে পেতাম। মনে পড়ল ছেলেবেলায় আমরা একটা হ্যারিকেনকে ঘিরে তিনভাই বোন পড়তে বসতাম। এই শহরেই। না। আমি ঠিক করলাম, আর অবাক হব না।

দারুণ বিছানায় জুতো সুদ্ধ শুয়ে পড়লাম। কতদিন? কতদিন পরে আমি এই শহরে এলাম? চল্লিশ। হ্যাঁ ঠিক চল্লিশ বছর পরে। এই বছরগুলোয় আমি অনেক লড়াই করেছি কলকাতায়, তারপর লন্ডন, নিউইয়র্ক ঘুরেছি নিয়মিত। এখন যাকে বলে সচ্ছল, আমি

তাই। এখানে আমার কথা ছিল না আসার। মনেই ছিল না।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণে কানাডার টরেন্টো শহরে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে ভিড় হয়েছিল বেশ। বক্তৃতা ছাড়াও আমাকে অণুগল্প পড়তে হয়েছিল কয়েকটা। সবাই খুশি হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম তুমি। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। চল্লিশ বছর আগের সব স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে। একটি বাইশ বছরের মেয়ের মধ্যে তুমি আসো কি করে? সেই নাক, চিবুক এবং চোখ। কিন্তু কোথায় শেষবার দেখেছিলাম যখন তুমি বারো। বারো বছরের মুখটাই যেন একটু পরিণত হয়েছে বাইশে।

আমাকে অবাক হতে দেখে সেই মেয়ে হাসল;

'কি হল?'

'তোমার নাম কি?'

'ফুল।'

'বাঃ। চমৎকার। কি করো এখানে?'

'মাস্টার্স করেছি। সামনের সপ্তাহে চাকরি শুরু করব। আপনার অনেক গল্প আমার পড়া। খুব ভালো লাগে।' ফুল হাসতেই আবার তোমাকে দেখলাম আমি,

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? আমি কত ছোট। তাছাড়া, আমি আপনি যে শহরে ছিলেন সেখানে জন্মেছি।' ফুল বলল।

'কোন্ শহরে?'

'বাঃ। আপনার মনে নেই? আপনার অনেক বইতে বারবার যে শহরটার কথা লিখেছেন, ভুলে গেছেন?'

'ও। তাই বুঝি? কোথায়, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ি।'

'আমার পিসির নাম কুসুম। কুসুমকুমারী।' আচমকা হৃৎপিণ্ড উপড়ে এল গলায়, কথা আটকে গেল।

'জানেন, এই যে আমি এখানে পড়তে এসেছি তা শুধু পিসির জন্যে। আমরা তিন ভাইবোন। বাবার ক্ষমতা ছিল না আমাকে এতদূরে পড়তে পাঠাবার। পিসি আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার দায়িত্ব ছেলেবেলা থেকে পিসি নিয়ে নিয়েছিল।'

'ও।'

'আপনার অনেক লেখায় পিসি আছে, না?'

'হয়তো।'

'আপনি কি রকম এড়িয়ে যাচ্ছেন। পিসিকে জিজ্ঞাসা করলেও এড়িয়ে যেত।'

'তোমার পিসি এখন কোথায়?'

'পিসি তো বাড়িতেই আছে। স্কুলে পড়ায়।'

'তোমাদের বাড়িতে? মানে আগের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। পিসি বিয়ে করেনি। দাদু মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল

তো। আমি ভাবছি, এবার পিসিকে আমার কাছে নিয়ে আসব।'

সেদিন ফুল আমাকে লাঞ্চ খাইয়ে দিল। তোমার কথা আর ও বলেনি, এমনকী এই শহরটা যে এখন বদলে গিয়েছে সেই কথাও না। ও শুধু বলেছে, ওখানে ওর আজকাল খুব একা লাগে। জিজ্ঞাসা করাতে মাথা নেড়ে বলেছে, কোনো ছেলের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার হয়নি। অনেকেই অ্যাপ্রোচ করেছে কিন্তু ওর খুব ভয় করে। ছেলেদের ও বিশ্বাস করতে পারে না। শুনতে ভালো না লাগলেও আমি চুপচাপ ছিলাম।

তারপর থেকেই আমি কোনো কাজে মন দিতে পারছি না। বারংবার মনে পড়ছে কুসুম তোমার কথা। আচ্ছা, আমি যখন পনেরো বছর বয়সে ওই শহর ছেড়ে এসেছিলাম তখন তুমি বারো। আমি কি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলেছিলাম তখন? তুমি যখন কিছু বলতে আমি মানে বুঝতাম না। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট তুমি তবু কি রকম রহস্যময় ছিল তোমার কথা। আমাদের শহরের প্রান্তে রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে নিয়ে তুমি বলেছিলে, 'দ্যাখো, দিঘির জল দ্যাখো।' আমি দেখেছিলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'বল তো দিঘি কার বন্ধু?'

'ধ্যাত।' আমি বলেছিলাম, 'দিঘি কি মানুষ যে কারও বন্ধু হবেই।'

তুমি হেসেছিলে, 'না দিঘি আকাশের বন্ধু। তাকিয়ে দ্যাখো, দিঘিতে আকাশের ছায়া পড়েছে। আকাশের সব রং দিঘিতে।'

কুসুম, এগুলো কি ভালোবাসার কথা? তখন বুঝিনি। আজ আমি বুঝতে এলাম। কলকাতায় ফিরে এসেই স্থির করলাম, তোমার মুখোমুখি হব। এই দেখা না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার শান্তি নেই।

বিকেল চারটে বাজল।

তৈরি হয়ে নিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই দিনের আলোয়। রাত নামলে নয়।

হোটেলের রিসেপশনে যারা সদাজাগ্রত তাদের কারও আমাকে চেনার কথা নয়। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যদি দূরে কোথাও যান তাহলে হোটেলের গাড়ি নিতে পারেন।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'দূরে যাব না।' তারপর কৌতূহল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি নিশ্চয়ই এই শহরের মানুষ নন? চাকরির সুবাদে এসেছেন?'

—না, আমার বাড়ি এখানেই।

'আচ্ছা! কোন্ পাড়ায়?' এরকম বলিয়ে কইয়ে এরকম নব্য চেহারার মহিলা আমাদের সময়ে এই শহরে ছিল না।

মহিলা বললেন, টেম্পল রোডে আমার বাবা থাকতেন। এখন আমরা থাকি নবাব পাড়ায়।

টেম্পল রোড। খালের পাশের সেই সরু পথটা। যেখানে কালীবাড়ি ছিল বলে ওই নামের রাস্তা হয়েছে। ওখানকার অনেককেই চিনতাম বলে ওঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, একটা টেলিফোন অ্যাটেন্ড করে আবার সময় দিলেন মহিলা 'নিখিলচন্দ্র মিত্র।'

'অ্যাঁ? নিখিলের মেয়ে?'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন?'

'চিনতাম। খুব ভালো লাগল। ওকে আমার কথা বললে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।' বাইরে বেরিয়ে এসেও ঘোর কাটছিল না। নিখিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে শান্ত এবং সুদর্শন ছিল ছিল। কিন্তু ওর সৌন্দর্যে মেয়েলি ভাবটার বাড়াবাড়ি ছিল। কথাও বলত একটু মেয়েলি ঢঙে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ যারা পেত না তারা ওর সঙ্গে ভাব করে বেশ মজা পেত। জনার্দন তো ঘোষণাই করেছিল সে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে না। নিখিলই ওর প্রেমিকা। ওর সঙ্গেই সারাজীবন থাকবে।

সেই নিখিলের এত স্মার্ট মেয়ে—ভাবতেই পারছি না। নিখিল কি তার স্বভাব এখন বদলে ফেলেছে? জনার্দনের সঙ্গে কি ওর সম্পর্ক এখনও আছে? এসব প্রশ্ন যখন মাথায় পাক খাচ্ছে তখন একটা রিকশাওয়ালা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হর্ন বাজাল। রিকশায় উঠলাম। তোমার বাড়িতে যেতে হলে শহরের অনেকটা ডিঙিয়ে যেতে হবে।

তখন ছিল সরু রাস্তা, এখন সেটা বেশ চওড়া হয়েছে। বাঁ দিকে গুপ্তদের পুকুরটা চোখে পড়তেই জায়গাটাকে চিনতে পারলাম। পুকুরটা এখনও আগের মতো রয়েছে। অল্প জল। হয়ত সরকারের আইন পুকুরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রোমোটারদের হাত থেকে। কিন্তু এই রাস্তার দুধারে অনেক ছোট ছোট দোকান ছিল, তারা কোথায় গেল। এখন সাইবার কাফে, বিউটি পার্লার, আধুনিক ফাস্ট ফুডের দোকান পরপর দারুণভাবে সাজানো, মোড়ের মাথায় এসে মনে পড়ল যতীনকাকার কথা। ওর ভাইপো বুলু আমাদের সঙ্গে পড়ত, তখন শহরের একমাত্র বই-পত্রিকার দোকানটা ছিল যতীনকাকার। দোকানটা ভেঙে রাস্তা হলেও পাশের দোতলা বাড়ির একতলায় সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম, 'বইটই'।

হ্যাঁ, ওই নামটাই ছিল তখন কিন্তু আমরা বলতাম যতীনকাকার দোকান। রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে নিচে নামলাম। বাইরে থেকে বুঝিনি, ভেতরে বেশ ভিড়। আর দোকানটাও ঢের বড়। আগে যা ছিল তাঁর তিনগুণ। চারটি যুবক খদ্দের সামলাচ্ছে। ভেতরের ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছেন যে বৃদ্ধ তার ভুরুর চুল সাদা, চুলের কোথাও কালো নেই। আমার মনে যতীনকাকার যে চেহারাটা ভাসছে তার সঙ্গে অনেক তফাত, মনের ছবির মুখে কিছু বলিরেখা, চুল ভুরু সাদা করে দিতেই এই মুখটি তৈরি হল।

'কি বই দেব?'

'বই চাই না, ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' চোখের ইশারায় যতীনকাকাকে দেখলাম।

যুবক যতীনকাকাকে জানাতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করেও না পেরে উঠলেন। এখনও পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন দেখছি।

কাউন্টারের ধারে এসে বললেন, 'বলুন।'

'আপনি তো যতীনকাকা?'

সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল, 'এখন আমাকে সবাই দাদু বলে। আপনি কি আমার ভাইপোর বন্ধুদের কেউ? দাঁড়াও, চোখ বন্ধ করলেন যতীনকাকা, 'শম্ভু? শম্ভুনাথ?'

'না।' নিজের নাম বললাম।

'ওহে। হ্যাঁ, তাইতো, তোমার ছবি তো বই-এর পেছনে প্রায়ই দেখি। তাছাড়া তোমার মুখাবয়বের তেমন পরিবর্তন হয়নি, এসো, ভেতরে এসো।' ভেতরে ঢুকলাম। আদর করে বসতে বললেন। বললাম, 'আপনার দোকানও বেশ বড় হয়েছে।

'তা হয়েছে। তবে সেটা স্কুলবই-এর কল্যাণে। তুমি এখন বিখ্যাত লেখক হয়েছ, এই আমার দোকানেই তোমার প্রচুর বই। স্কুলের প্রাইজ হিসেবে তোমার বই-এর চাহিদা আছে। এই তো দ্যাখো, সামনের সপ্তাহে গার্লস' স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, লিস্টে তোমার অনেক বই আছে।' কথা শেষ করে একজনকে ডাকলেন, 'গার্লস' স্কুলের কুসুমদিদিমণি যে লিস্টটা দিয়ে গেছেন ওটা আনো তো।'

লিস্ট এল, এটা কি তোমার হাতের লেখা। তোমার হাতের লেখাতে কি তখন এমন মুক্তো ঝরত? যতীনকাকা দেখালেন, আমার আঠারোটা বই ওই তালিকায় রয়েছে।

কিছুক্ষণ কথা বলার মধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেল আমি কে! একজন ক্রেতা আমার বই কিনে এগিয়ে দিলেন অটোগ্রাফের জন্য।

অটোগ্রাফটা দেওয়ার পর যতীনকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদিন আছ?'

'ঠিক নেই কিছু।'

'তুমি এই শহরের ছেলে, এখানে ফিরে এসেছ এটা সবার জানো দরকার। একটু প্রচার করলেই দেখবে লোকজন চলে আসবে। তাহলে কাল বিকেলে আমার দোকানে তুমি থাকছ এটাই বলার ব্যবস্থা করি। বুলুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'না। ও কোথায়?'

'অস্ট্রেলিয়ায়। যোগাযোগ দূরের কথা, একটা চিঠিও লেখে না।'

আমি উঠলাম। যতীনকাকু বারংবার বললেন কাল ওখানে যাওয়ার জন্য, রিকশায় বসে ভাবলাম, হয়তো লোকজন আসবে, আমার বই কিনে অটোগ্রাফ নেবে। অর্থাৎ আমাকে দেখিয়ে কাল কিছু লাভ করতে চান যতীনকাকু। এখন তাঁর ব্যবসা এমনিতেই ভালো। তবুও। আমি সেই ছোট্ট দোকানটায় বসে উনি যখন সারাদিনে তিনচার জনের বেশি খদ্দের পেতেন না তখনও ওঁকে অন্যরকম লাগত আমাদের। দোকানে গেলেই বললেন, 'সুকুমার রায় আর অবনীন্দ্রনাথ পড়ো। না পড়লে জীবনটাকে দেখার চোখ তৈরি হবে না।'

কুসুম। ভাবতে পারো এই শহরের যে কেউ ছিল না, বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তুমি যা বলতে তা বুঝতে যার অনেক সময় লাগত তাকে অটোগ্রাফ দিতে হবে এখানেই। আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করেই রিকশাওয়ালাকে বললাম টেম্পল রোড হয়ে যেতে। দেখলাম, ক্যানাল বেশ চওড়া, নৌকো ভাসছে। দু'তিনটে ভাসমান রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল। টেম্পল রোড চওড়া হয়ে গেছে। নিখিলদের বাড়িটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। একদিকে ক্যানাল অন্যদিকে সারি সারি নতুন দোতলা বাড়ি। একটু বেশি আস্থা

রেখেছিলাম নিজের ওপর। নিখিলের মেয়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আসা উচিত ছিল।

খোঁজাখুঁজি করলে হয়ত পাওয়া যেত নিখিলকে কিন্তু তাতে দিনের আলো নিভে যেত। রিকশাওয়ালাকে বললাম তোমার পাড়ায় নিয়ে যেতে।

নদীর ধারে তোমাদের বাড়ি। আমার ফুলমাসি থাকতেন ঠিক তোমাদের পাশের বাড়িতে। আমরা তখন খুব ছোট। ফুলমাসির বাড়িতে গেলেই তুমি চলে আসতে। তোমার যখন ছয় বছর বয়স তখন দারুণ ক্যারাম খেলতে। পরপর পাঁচটা গুটি গর্তে ফেলতে অনায়াসে।

দেখলাম অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে ওই পাড়ায়। তারপর বাঁধটার কাছে এলাম। বাঁধের গায়ে রাস্তা। রিকশাওয়ালা জানাল নদীকে বাঁধা হয়েছে যাতে পাড়া ভাসিয়ে দিতে না পারে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাড়ি। না টিনের চালটা নেই, একতলা সিমেন্টের সুন্দর ছিমছাম বাড়ি, বাইরে বারান্দা। পাশের ফুলমাসিদেরটা দোতলা হয়েছে। মেসো মারা যাওয়ার পর ফুলমাসি বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন কলকাতায়, ছেলের কাছে।

ভাড়া না মিটিয়ে রিকশাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। একটি কিশোর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল; 'কাকে চাইছেন?'

একটু অস্বস্তি হল। তোমার নাম বললে কি প্রতিক্রিয়া হবে? ছেলেবেলায় এই শহরে কোনো অবিবাহিতা মহিলার কাছে কোনো পুরুষ আসত না। নাম করা দূরের কথা।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

'অনুপম।'

'বাঃ। খুব সুন্দর নাম। কে দিয়েছে?'

'পিসিমণি।'

'তাই বলো, তিনি আছেন?'

'আছেন। আপনি কি পিসিমণিকে চাইছেন?'

থম ধরল বুকে। কুসুম; আমরা কি কেউ কাউকে কখনও দেখেছি?

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'এখন তো দেখা পাবেন না।'

'কেন?'

'বিকেল হলেই পিসিমণির মন খারাপ হয়ে যায়। কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিছানায় শুয়ে গীতবিতান পড়ে চুপচাপ।'

কিশোরের কথার মধ্যেই একজন মধ্যবয়সি মহিলা দরজায় এলেন, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

আমি নাম বললাম।

'আপনি কি লেখক?'

'হ্যাঁ। ওই আর কি!'

'ওহো। বসুন প্লিজ।' বারান্দায় সাজিয়ে রাখা চেয়ার দেখিয়ে এগিয়ে এলেন মহিলা,

'আমরা আপনার লেখার খুব ভক্ত। আমার মেয়ে—!'

'ফুল?'

'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমেরিকায়।'

'আচ্ছা! দেখুন তো গতকাল ফোন করেছিলাম অথচ একবারও বলেনি। ও আপনার প্রায় সব লেখাই পড়েছে। বসুন।' মহিলা আন্তরিক।

বসলাম।

'আপনার মতো একজন মানুষ আমাদের বাড়িতে এসেছেন ভাবতেই ভালো লাগছে। আপনার বাড়িও তো এই শহরে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। এখানেই আমি জন্মেছি।'

'এই নিয়ে খুব গর্ব আমাদের। যখনই এই শহরের কথা লেখেন তখন সবাই খোঁজে, পরিচিত কে আপনার লেখায় এল। আপনি বসুন, দিদিকে ডেকে দিচ্ছি।'

'যদিও ব্যস্ত থাকে তাহলে বিরক্ত করার দরকার নেই।'

মহিলা হাসলেন, 'দিদি স্কুল থেকে ফিরে একটু আরাম করে বলেই ওদের বোঝানো হয়েছে মন খারাপ তাই কথা বলবে না, নইলে এ তো বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়। আপনি চায়ে চিনি দুধ-খান?'

'ওই। হ্যাঁ আমি নর্মাল চা খাই।'

মহিলা ভেতরে চলে গেলে অনুপম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি দিদিকে কি রকম দেখলেন?

মোটা না রোগা?'

'কোনোটাই নয়। খুব সুন্দর।'

এইসময় ভেতর থেকে তার মায়ের গলা ভেসে আসতেই সে বলল, 'চলি।'

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে দেখলাম বাঁধের ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। এখানে বসলে আর নদী দেখা যায় না।

এইসময় তুমি এলে। এসে দরজায় দাঁড়ালে। পরনে অফ-হোয়াইট শাড়ি। চুল হাত খোঁপায় জড়ানো। চোখে চশমা। না। একটুও ভারী হয়নি শরীর, তেমন রোগাও নয়। ঈষৎ হাসলে, এগিয়ে এলে কাছে, 'হঠাৎ?'

এই ঠ-এর উচ্চারণ তুমি ঠিক ঠ-এর মতই করতে। সুচিত্রা মিত্র যেমন গান গাইবার সময় করেন। কখনই ঠ ট হয় না।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, 'চলে এলাম।'

'বোসো।' এমন গলায় সে বলল যেন কাল বিকেলেও আমাদের দেখা হয়েছিল।

বসলাম। তুমি বললে, 'শুনলাম, আমেরিকায় গিয়ে ফুলের দেখা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ অনেক ফুল, তবে টিউলিপটা ওইসময় ফোটেনি।'

'তাই?' তুমি তাকালে,

'হ্যাঁ। ও নিজেই আলাপ করল। আমি ওকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। একেবারে

পিসির মুখ বসানো। খুব সপ্রতিভ কথাবার্তা। বলল তুমিই ওর সবকিছু।'

'তাই এলে?'

'মানে?'

'ফুলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কথা মনে এল?'

'মনে এল নয়। মনে ছিল। ফুল সেটাকে নাড়িয়ে দিল বলতে পারো। ফুল বলল, আপনার সব লেখায় পিসি আছে, না?'

'বলল?'

'হ্যাঁ, তা থেকে প্রমাণিত হয় মনে ছিলই।'

'প্রমাণ তো কেউ চায়নি। তবে হ্যাঁ, তুমি এই কয় বছরে আমাকে কেবলই অস্বস্তিতে ফেলে গেছ। আমি কি তেমন অন্যায় করেছি?'

'অস্বস্তিতে ফেলেছি? কি রকম?'

'এই শহরের যে কোনো নারী চরিত্র তোমার গল্প-উপন্যাসে এলেই সবাই মনে করে সেটা নাকি আমি? আমার কথা বলার ধরন নাকি তাদের মধ্যেও। স্কুলের অন্য শিক্ষিকারা রঙ্গ করে বলেন, 'তোমার উচিত ভদ্রলোকের কাছে লেখার অর্ধেক টাকা ডিম্যান্ড করা। মেয়ে চরিত্র হলেই তার মধ্যে তোমাকে মিশিয়ে দিচ্ছেন?' গম্ভীর হয়ে গেল কুসুম, 'আমি, যত সামান্যই হই, আমিই। আমি কারও মধ্যে যেতে চাই না। আমাকে কেন আমার মতো একা থাকতে দেওয়া হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না।'

আমি তোমার মুখের দিকে তাকাতেই তুমি মুখ ফেরালে। যেন যা বলার বলা হয়ে গেছে আর এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাও না।

এইসময় সেই মহিলা চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে কিছু খাবার।

কুসুম বলল, 'ওর নাম দীপা, দীপাবলী। আমার ভাই-এর বউ।'

মহিলা বললেন, 'আমি কিন্তু আপনার দীপাবলীর নামের যোগ্য নই।'

কুসুম বলল, 'ওই এক কথা! দীপাবলী একটা বানানো চরিত্র, তুমি বানানো হবে কেন? তুমি তোমার মতো।'

'বানানো বললেই হল, তাহলে সবাই দীপাবলীর প্রশংসা করে কেন?' মহিলা বললেন—

'ওটাই লেখকের কৃতিত্ব। যারা প্রশংসা করে তাদের জীবনটা ওই রকম হলে বুঝতে পারত।' কাজের অছিলায় মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। এবং তখনই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুসুম, তুমি কেমন আছ?'

সে চোখ ঘোরাল। চশমা খুলে আঁচলে মুছল,

'কেমন দেখছ?'

বললাম, 'তুমি ভালো নেই।'

চশমা পরল কুসুম, 'কিসে মনে হল আমি ভালো নেই।'

'এই ভঙ্গিতে তুমি কথা বলতে না।'

'তুমি যখন আমায় কথা বলতে শুনেছ তারপর চল্লিশটা বছর চলে গিয়েছে। একমাত্র আকাশ ছাড়া এত বছরে সবকিছু বদলে যেতে পারে। আমি আকাশ নই। পরিবর্তন তাই

স্বাভাবিক, পরিবর্তিত হওয়া মানে খারাপ থাকা নয়।' কুসুম বলল। কথাগুলো সে বলছিল বটে কিন্তু মনে মনে জানলাম সে ভালো নেই।

কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করব না।'

'কেন?'

'ভালো না থাকলে কেউ এত লেখা লিখতে পরে না।'

'এটা তো একটা অভ্যেস। লোকে যে অভ্যেসে চাকরি করে।'

'হয়তো। কি জানি।' তারপর তাকাল সে আবার দিকে, 'কেন এলে?'

'কোথায়? এই শহরে?'

'হ্যাঁ। এখানে তো তোমার কোনো কাজ নেই।'

'আমি কোনো প্রয়োজনে আসিনি। এসেছি টানে। এসে দেখলাম শহরটা একদম বদলে গিয়েছে। যে হোটেলে উঠেছি সেসময় এমন হোটেল এখানে কল্পনাও করতে পারতাম না। যতীনকাকার বই-এর দোকানটাও বদলে গেছে। ফিরে গিয়ে যে লেখাই লিখব আমার ছেলেবেলার শহরটার ছবি আর আসবে না।'

'কোন হোটেলে উঠেছ?'

বললাম। সে বলল, 'বাব্বাঃ। খুব দামি হোটেল।'

এই শহরে এসে কোনো হোটেলে উঠব তাই ভাবতে পারিনি আগে। ওঠার পর মনে হয়েছে ঠিক করেছি। হাজার হোক, হোটেলের ঘরগুলো পৃথিবীর সবদেশেই মোটামুটি একই চেহারার। অনাত্মীয় বলে মনে হয় না।

চা শেষ করলাম। মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার ভাই?'

'ও বড় ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে।'

'তাহলে আজ উঠি?'

'কদিন থাকছ?'

'থাকার তো আর কারণ নেই। কালই ফিরে যাব।'

'ফিরে যাবে।' হাসল সে, 'যাও।'

উঠে দাঁড়াতেই মহিলা এবং কিশোর চলে এলেন। মহিলা বললেন, 'কাল ছুটির দিন। দুপুরে এখানেই খাবেন।'

কুসুম বলল 'উনি কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন।'

'সেকি? কবে এসেছেন?'

'বোধহয় আজকেই। তাই তো?' কুসুম আমার দিকে তাকাল।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'আহা! আর একটা দিন থেকে যান না। পরিচিত সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

হেসে বললাম, 'শহরটা এমন বদলে গেছে যে পরিচিতরা কে কোথায় আছে খুঁজে পাব না। তাছাড়া চল্লিশ বছর বাদে দেখা হলে এতকালের জমে থাকা স্মৃতি যে হোঁচট খাবেই তা আগে বুঝতে পারিনি। চলি!'

কুসুম বলল, 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।'

কিশোর জিজ্ঞাসা করল, 'পিসি, আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

তার মা ধমক দিল, 'তুমি যাও. পড়তে বোসো, সন্ধে হয়ে গিয়েছে।'

নিচে নেমে বললাম, 'এগিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। সামনেই রিকশা রয়েছে।'

'থাক না। ও নিচের রাস্তা দিয়ে বাঁধের শেষে যাক, আমরা বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে ওখানে পৌঁছে গেলে আপনি চলে যাবেন।'

রিকশাওয়ালাকে তাই বলা হল।

ধাপে ধাপে পা ফেলে যখন বাঁধের ওপর উঠে এলাম তখন নদীর জল আরও কালো হয়েছে। বললাম 'বাঁধ দিয়ে বন্যা বন্ধ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। বাঁধটা সেই জন্যেই দেওয়া।' কুসুম বলল। চারপাশ এখন পাতলা অন্ধকার। একটু হালকা বাতাস বয়ে গেল।

আমরা নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বললাম। 'কুসুম তুমি সংসারী হলে না কেন?'

'সেকি! এতকাল তো সংসারই করছি।' হাসল সে, 'বলো বিয়ে করিনি কেন?'

'বেশ, তাই।'

'বিয়ের বয়স যখন হল তখনই বাবা চলে গেলেন। সবে স্কুলে পড়াতে ঢুকেছি, ভাই ছোট। দায়িত্ব নিতে হল। তারপর, একটা বর খুঁজে আনবে তেমন কেউ পাশে ছিল না।'

'কথাটা কি বিশ্বাস্য?'

'সেটা তুমি যেমন ভাবো। মিথ্যে নয়, স্কুলের সহকর্মীরা চেয়েছিলেন শহরের কাউকে বিয়ে করি যাতে স্কুলের চাকরিটা থাকে। উদ্যোগীও হয়েছিলেন কেউ কেউ। আমি রাজি হইনি এই শহরের কাউকে বিয়ে করতে।'

'কেন?'

'তোমার প্রথম গল্প, যেটা দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল, সেটা পড়ার পর মনে হয়েছিল এই শহরের কাউকে বিয়ে করাটা ভুল হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি?'

'বন্ধুত্ব মানেই তাকে স্বামী হিসেবে ভেবে নেওয়া নয়। তুমি হয়তো জানো না, এখানকার সবাই জানে তোমার সঙ্গে আমার গভীর প্রেম আছে। ওরা ভুলে যায় তুমি পনেরো আর আমি বারো, সেই আমাদের শেষ দেখা। আসলে লিখে লিখে তুমি এই ভাবনাটা ওদের মনে ঢুকিয়েছ। তাতে তুমি হয়তো বিখ্যাত হয়েছ কিন্তু আমার চারপাশে একটার পর একটা পাঁচিল উঠেছে।' বিষণ্ণ গলায় বলল সে।

'কিন্তু আমি তোমাকে আহত করতে কোনো লেখা লিখিনি। তোমার নাম বা তোমাকে চিনতে পারা যাবে এমন কোনো সূত্র আমার লেখায় ছিল না।'

'কি ছিল সেটা তুমি ভালো করে জানো।' হাঁটতে শুরু করল কুসুম। তার পরেই হেসে ফেলল আলতো শব্দ করে 'তুমি ভেবো না আমি কোনো অভিযোগ করছি। কেউ একজন বহুদূরে থেকে আমায় কিভাবে দেখছে, আমায় নিয়ে কি ভাবছে তা আবিষ্কারের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ তো আছে।'

'কি করব বলো। আমি তোমাকে ছাড়া ভাবতে গেলেই অসাড় হয়ে যাই।'

'তাই যে চরিত্র আমার নয় তার মধ্যেও আমাকে মিশিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' স্বীকার করলাম।

'এই ভাবনা, আমাকে নিয়ে ভাবনা, তোমার মনে কবে এসেছে?'

'সেই প্রথম লেখা থেকে। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার অন্তত আট বছর পরে।'

'ততদিনে তুমি বিবাহিত?'

'না। তারও তিন বছর পরে।'

'তিনি জানেন?'

'জানি না।'

'শুনেছি তুমি এখন একা থাকো!'

'হ্যাঁ।'

সে আর কথা বলল না। আমরা বাঁধের শেষে চলে এসেছিলাম। কুসুম বলল; এবার ফিরে গিয়ে যা লিখবে সেখানে নিশ্চয়ই আমি থাকব না।'

'কারণ?'

'যে-আমাকে এতকাল মনে রেখেছিল তার সঙ্গে এই আমার কোনো মিল দেখতে পেলে না। আর যাই হোক, এই-আমাকে নিয়ে তো লেখা যায় না।'

কথা না বলে হাসলাম আমি।

হঠাৎ সে নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এত লেখো, বলো তো, নদী কার বন্ধু?'

'আকাশের।' জবাব দিলাম।

'ঠিক। কিন্তু আকাশ যখন অন্ধকারে তখন নদীও কালো। দুজনের কোনো যোগাযোগ থাকে না। যে যার নিজের মতো।' সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

তখন, আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুসুম তুমি কেমন আছ?'

সে তাকাল, 'কি মনে হয়?'

'কুসুম, আমি জানি তুমি ভালো নেই।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল সে, 'দূর! চমৎকার আছি, তোমার এত উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছি আমি, খারাপ থাকব কি করে!' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে এত লেখো, আজ যদি বলি, আমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলো যেখানে বাকি জীবনটা আমরা পাশাপাশি থাকতে পারব; পারবে নিয়ে যেতে?'

উত্তরটা নিজেই দিল সে, 'পারবে না। সম্ভব নয়। ঝরনা নদী হয়ে গেলে আর পাহাড়ে ফিরে যেতে পারে না। তার চেয়ে এই ভালো, এই যেমন আছি। এনাফ।'

কুসুম ফিরে গেল বাঁধের ওপর দিয়ে। ধীরে ধীরে অন্ধকার তাকে আড়াল করল। নেমে এলাম রাস্তায়। রিকশায়। হোটেলে ফিরে আসতেই রিসেপশনের নতুন মেয়ে বলল, স্যার, আপনার একটা মেসেজ আছে। টেলিফোনে।' ঘরে এসে বোতাম টিপতেই কুসুমের গলা শুনতে পেলাম, 'শোনো, আমি জানি, তুমিও ভালো নেই।'

শিহরন

শক্তিব্রতবাবু মুখ তুলে কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখলেন। এই ভয়ংকর গরমেও গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। তাঁর শ্বাস পড়ল। উদাস গলায় বললেন, 'আজকাল আর যুবতী বিধবা বড় একটা দেখা যায় না!'

সুধাকরবাবু অবাক হয়ে মুখ ফেরালেন, 'হঠাৎ এই ভাবনা?'

'কৃষ্ণচূড়া দেখে মনে এল।' শক্তিব্রতবাবু উত্তর দিলেন।

বিমলেন্দু একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ওপাশ থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আশ্চর্য!'

শক্তিব্রতবাবু তাকালেন, 'অন্যায় কি করলাম?'

'কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে যুবতী বিধবার কি সম্পর্ক তাই বুঝতে পারছি না।' বিমলেন্দু বললেন।

'বঙ্কিম পড়েছেন?' শক্তিব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বিমলেন্দু সারা জীবন রেলে চাকরি করেছেন। প্রবাসে কাটিয়েছেন। গল্প উপন্যাস পড়ার বাতিক তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বই তিনি পড়েছিলেন কারণ সেটি তাঁর স্ত্রী বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলেন। কচি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সব সংলাপ বসিয়েছেন যে, লেখকের বাস্তব জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল। যদিও তাঁর স্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর মায়ের চৌদ্দো বছর বয়সের সন্তান। বিমলেন্দু উত্তর দিলেন না।

এই তিন ব্যক্তির বয়স সত্তর পেরিয়েছে। আলাপ বছর দেড়েকের। এখানকার নতুন হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দা এঁরা। রোজ বিকেলে এই পার্কের একটি বিশেষ বেঞ্চিতে তিনজন এসে বসেন। সুধাকরবাবু লোহালক্কড়ের ববসা, এখন ছেলে দেখছে। শক্তিব্রতবাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি হিসেবে অবসর নিয়েছেন।

সুধাকরবাবু বললেন, 'আগে বিজ্ঞান পিছিয়ে ছিল। অল্প বয়সে মানুষ মারা যেত ফলে তাদের যুবতী স্ত্রীরা বিধবা হয়ে যেতেন। কিন্তু সেই সব বিধবাদের তো বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে অনেক নিষেধ ছিল। তাদের দেখতেন কি করে?'

শক্তিব্রতবাবু বললেন, 'দূর মশায়। আমি বিয়ে করিনি, আজ অবধি কোনো মহিলার শরীর দেখা দূরের কথা আঙুলও ছুঁয়ে দেখিনি, আমি কি করে স্বচক্ষে ওঁদের দেখব। আমি তাঁদের দেখেছি বইয়ের পাতায়। ওই বঙ্কিম থেকে বটতলা, কত বইতে ওঁরা আছেন।'

শক্তিবাবু সংসার করেননি এটা ওঁরা জানতেন কিন্তু জীবনে কোনো মহিলার আঙুল স্পর্শ করেননি শুনে বেশ বিমর্ষ হলেন সঙ্গী দুই বৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিমলেন্দু বাবু প্রশ্ন করলেন 'বটতলা?'

শক্তিব্রতবাবু একটু লজ্জিত হলেন, 'ওই যে মলাট বিহীন চটি চটি বইগুলো। বাঁকুড়ায় যখন পোস্টেড ছিলাম তখন এক সহকর্মী কলকাতায় গেলেই নিয়ে আসত। একটু, একটু কেন বেশ অশ্লীল। তবে কিনা ওই বয়সে মন্দ লাগত না।'

সেদিন সন্ধেবেলায় ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সুধাকর বাবু দেখলেন তাঁর স্ত্রী বউমার সঙ্গে হেসে হেসে খুব গল্প করছেন। তিনি কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। শক্তিব্রতবাবুর জন্য ওঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল। চায়ের কাপ নিয়ে বউমা ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোমার শাশুড়িকে একটু আসতে বলো।'

বউমা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। সবিতা এলেন, 'কি বলছ?'

'না কিছু না।' মাথা নাড়লেন সুধাকরবাবু।

'আরো। কি হয়েছে বলবে তো? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'তাহলে? কোনো খারাপ খবর পেয়েছ?'

'ওসব কিছু না।'

'এই শক্তিব্রতবাবুর কথা ভাবছিলাম। অবিবাহিত মানুষ একাই থাকেন।'

'সঙ্গে ভাইপো থাকে বলেছিল না?'

'হ্যাঁ ভাইপো মানে তো সংসার নয়!'

অনেক মানুষ অবিবাহিত থাকে। একমাত্র সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া বেশির ভাগই বদ হয়। ওদের সংসার করার প্রয়োজন হয় না।' সবিতা চলে গেলেন টিভি দেখতে।

আলো নিভিয়ে ছন্দা বিছানায় এসে চাপা গলায় বললেন 'সরে শোও।' শরীরটাকে নাড়াচাড়া করলেন বিমলেন্দু। তারপর শ্বাস ফেললেন।

ধপ করে বিছানায় পড়ে বালিশটাকে স্বামীর বালিশ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে ছন্দা বললেন, 'আবার কি হল?'

'শক্তিব্রতবাবুর জন্যে মন খারাপ লাগছে।'

'কারণ?' অন্ধকারে প্রশ্নটা হল চটজলদি।

'ভদ্রলোকের বয়স এখন তেয়াত্তর। এখন পর্যন্ত কোনো নারীশরীর চোখে দ্যাখেননি। বিয়ে করেননি। কিন্তু অন্য অনেকভাবে তো দেখা যায়।' আবার শ্বাস ফেললেন বিমলেন্দু।

'ভালো মানুষ, সৎ চরিত্র। তোমার মতো ছোঁক ছোঁক বাতিক নেই।'

'আঃ। তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা রোজ একসঙ্গে আড্ডা মারি, অলমোস্ট একই বয়সি, আমি আর সুধাকরবাবু দেখেছি আর উনি দ্যাখেননি, এক ধরনের কমপ্লেক্স তৈরি হয় না? তুমি পুরুষ হলে বুঝতে!'

'আমি পুরুষ হলে এখানে শুতাম না।' দূরত্ব বাড়ালেন ছন্দা, 'মেয়ে মানুষের শরীর যেন বিড়লা প্লানেটরিয়াম! না দেখলে জীবন বৃথা। কথা শুনলে গা জ্বলে যায়!'

বিমলেন্দু স্ত্রীর বাজুতে হাত ছোঁয়াতেই ছন্দা খেপে গেলেন, 'খবরদার আমাকে ছোঁবে না।'

'বয়ে গেছে ছুঁতে। এখন তোমাকে ছোঁয়া আর পাশবালিশকে ছোঁয়ার মধ্যে তফাত নেই।'

'কি? আমি পাশবালিশ?'

'অলমোস্ট!'

ছন্দা বালিশ নিয়ে নিচে নেমে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। গরমকাল। ঠান্ডা লাগার কোনো ভয় নেই।

বিকেলবেলায় সবিতা যাচ্ছিলেন কোঅপারেটিভের দোকানে। সকাল থেকে তাঁর স্বামী মুখে কুলুপ দিয়ে বসে আছেন। দু'তিনটে কথা বলে উত্তর না পেয়ে আর কথা বাড়াননি, যা বলার বউমাই বলছে। পিঠে ঘামাচি হয়েছে। পাউডারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে বললে এনে দিতেন। কিন্তু জেদে বলেননি। নিজেই বেরিয়েছেন, একটু হাঁটাও হবে।

সেলস কাউন্টারে গিয়ে দ্যাখেন ভিড় নেই। দাঁড়াতেই শুনলেন, 'ভালো?'

তাকিয়ে দেখলেন বিমলেন্দুবাবুর স্ত্রী ছন্দা। পুজোর সময় আলাপ। কিন্তু যাওয়া আসা নেই। মাথা নাড়লেন, 'ভালো। আপনি?'

'এই আর কি!' ছন্দা এগিয়ে এলেন, 'একা, না সঙ্গে কর্তা আছেন?'

'এই সময়? পাগল। এখন তিন বন্ধু পার্কে বসে গল্পে মশগুল। কেন? আপনার কর্তা যাননি? শরীর খারাপ নাকি?'

'না না। গেছেন। না গেলে ভাত হজম হবে কেন?' ছন্দা হাসলেন।

কিন্তু কিন্তু করেও জিজ্ঞাসা করে ফেললেন সবিতা, 'আচ্ছা, ও শক্তিব্রতবাবু লোকটি কি রকম বলুন তো?' সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই দেখুন, আমার মনেও একই প্রশ্ন এসেছে। বিয়ে করেনি, ভাইপোকে নিয়ে থাকে। তার মানে সংসারী নয়। এঁদের সঙ্গে তাহলে কি নিয়ে কথা বলে?'

'ঠিক। কাল একটা কথা শুনে লজ্জায়— কি যে বলব!' সবিতা লজ্জা পেলেন।

ঘনিষ্ঠ হলেন ছন্দা, 'কি বলুন না, কি শুনেছেন?'

'আমার বলতে খারাপ লাগছে!'

'মেয়েমানুষের কথা?' ছন্দা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। এত বয়স বেঁচে আছেন, তিনি নাকি দ্যাখেননি তাই ওর জন্য সমবেদনায় মরে যাচ্ছেন আমার স্বামী। ভাবতে পারেন!' সবিতা চোখ বড় করলেন।

'শুধু আপনার? আমারটিও। বুড়ো বয়সে কি মতিভ্রমই না হয়?'

'লোকটা বদ। ওর সামনে গেলে মনে হবে এক্সরে-র চোখে আমাকে দেখছে।'

'যা বলেছেন। অথচ জানেন, কোনোদিন কেউ কারো বাড়িতে যায়নি।'

'অথচ এসব আলোচনা হয়! ভাবতে পারেন!'

'আর কি হয় কে জানে!'

'আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিই।'

'কিন্তু, কি বলে যাবেন?' লোকটা কি রকম তাও তো জানি না।'

'না না। লোকটা যখন থাকবে না তখন যাব। এই বিকেল সাড়ে পাঁচ থেকে ছটার মধ্যে। ওর ভাইপো বাড়িতে থাকলে ঠিক কথা বের করতে পারব।'

'কিন্তু গেলে তো কিছু বলতে হবে!'

দুজনে মিনিট পাঁচেক আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত কথা পাকা করলেন।

পরের দিন স্বামীরা কথা বলতে চেয়েছিলেন, স্ত্রীরা রাজি হননি। বিকেল পৌনে পাঁচটায় ওঁরা পার্কের দিকে চলে গেলে সবিতা এবং ছন্দা দেখা করলেন।

সবিতা বললেন, 'যদি ওর ভাইপো ফ্ল্যাটে না থাকে?'

'ফিরে আসব। কেউ জানোতেও পারবে না।'

বাড়ি বের করতে অসুবিধা হল না। বেল বাজাতে যে ছেলেটি দরজা খুলল তার বয়স কুড়ির আশেপাশে। সবিতা বললেন, 'আমরা মহিলা সমিতি থেকে এসেছি।'

'ও, আসুন। কিন্তু কেউ তো বাড়িতে নেই।'

ঘরে ঢুকে ছন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছেন?'

'পার্কে।'

'এ বাড়িতে মহিলা আছেন?'

সবিতার প্রশ্ন।

'না। আমি আর জেঠু।'

'কোনো মহিলা আছেন?' ছন্দা জিজ্ঞাসা করেন।

'না। জেঠু মহিলাদের পছন্দ করেন না।'

'কেন?'

'আমি জানি না। আমাকে মেয়েদের সঙ্গে বলতে বারণ করেছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমরা ওঁর জন্যে অপেক্ষা করব।'

'দেরি হবে। পার্কে গেলে দেখা পাবেন।'

'না। উনি কোন্ ঘরে থাকেন?'

'ওই ঘরে।'

বলামাত্র ওঁরা চলে এলেন সেখানে। কোনো অবিবাহিত পুরুষের ঘর এত সুন্দর সাজানো হতে পারে ওঁরা জানোতেন না। তাদের স্বামীরা তো জল গড়িয়ে খান না।

'আমরা এখানেই বসছি।'

'আপনারা কি চা খাবেন?'

'তুমি তৈরি করতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

ছেলেটি চলে গেলে সবিতা বললেন, 'ভাইপোকে চাকরের মতো খাটায়।'

'মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেয় না। ওটা কি বই?' সবিতা এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে বইটা তুলল, 'বিদ্যাসুন্দর। এই বই পড়ছে, খুব রস!'

'রসালো বই?'

'হুঁ। বেশ অশ্লীল! পড়েননি?'

'না।'

'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলি আছে আমার কাছে, দেব, পড়বেন।'

বলতে বলতে টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টানলেন ছন্দা। বাধা দিলেন সবিতা, 'এই, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'একটা লোকের চরিত্র বোঝা যায় তার ড্রয়ার দেখে। এমা, এগুলো কি বই।'

তিনটে মলাটহীন চটি বই বের করলেন ছন্দা। পড়লেন, 'লাল শায়া', 'যুবতী বিধবা', 'ভরদুপুরে শিহরন।' লাল শায়ার প্রথম পাতায় চোখ রাখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে রক্ত জমল। কোনোক্রমে বইটা এগিয়ে দিলেন সবিতার দিকে। সবিতা পড়তে আরম্ভ কবলে ওঁরও একই দশা হল। বললেন, 'একি!'

ছন্দা বললেন, 'আমার শরীর কি রকম করছে। মাথা ঝিমঝিম— !'

'আমারও।'

'এ রকম বই কেউ লেখে? ছাপা হয়?'

'হয়েছে তো?'

'কেউ পড়ে?'

'পড়ে। পড়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নেয়। নচ্ছার লোক।'

'বলে নচ্ছার।'

'এসব ওদের পড়াচ্ছে কিনা কে জানে!'

'না। পড়ায়নি।' মাথা নাড়ল ছন্দা, 'পড়লে বাড়িতে এসে রসিয়ে বলত, চলো।'

'যাবে?'

'হ্যাঁ। যা জানার তা হয়ে গেছে।' বইগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও একটা বই বের করে নিল ছন্দা।

সবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা?'

'পড়ে দেখব। কেন পড়ে তা জানা দরকার।'

'ও তো টের পেয়ে যাবে। একটা বই নেই।'

'পাক। ভাইপোর মুখে শুনে বুঝতে পারবে না আমরা কারা।'

বাইরে বেরিয়ে টের পেলেন রান্নাঘরে চা বানানো চলছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন ওরা।

'তুমি আগে পড়ে নাও, তারপর আমি পড়ব।' হঠাৎই তুমি বেরিয়ে এল সবিতার মুখ থেকে। কয়েক লাইন পড়ে শরীর ঘিন ঘিন করলেও রক্ত গরম।

'ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় পড়ি? বাড়ির সবাই তো তাকিয়ে দেখবে!'

'শোওয়ার ঘরে, দরজা বন্ধ করে?'

ছন্দা হাসলেন, 'দরজা বন্ধ করার চল উঠে গেছে দশ বছর আগে। এখন সব সাদা পাতা। কোনো আড়াল নেই। হঠাৎ তো দরজা বন্ধ করা যায় না।'

'আমারও তাই।'

'দেখি।'

আলমারিতে শাড়ির তলায় বইটা রেখে দিয়েছিলেন ছন্দা। ভেবেছিলেন ভোরবেলায় যখন বিমলেন্দু অঘোরে ঘুমিয়ে থাকেন তখন নিশ্চিন্তে পড়বেন। কিন্তু মাঝরাতে ঘটনা ঘটে গেল। বুকে ব্যথা, বমি, প্রবল ঘাম, ছন্দাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হল। যমে মানুষে টানাটানি। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে জানা যাবে না কিছু।

খবর পেয়ে নার্সিং হোমে এসেছিলেন শক্তিব্রতবাবু এবং সুধাকরবাবু। দুজনেই চিন্তিত। ভরসা দিলেন বিমলেন্দুকে। বিমলেন্দু ভেঙে পড়েছেন। সারা জীবন রেলে চাকরি করায় সময় দিতে পারেননি স্ত্রীকে। এরকম সতীসাধ্বী স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে পারেননি।

খবরটা পেয়ে ছটফট করেছেন সবিতা। তাঁর বদ্ধ ধারণা, ওই বই পড়েই ছন্দার শরীর খারাপ। হয়েছে। কিন্তু বইটা কোথায়? স্বামীকেও বলতে পারছিলেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে ডাক্তার কথা বলতে অনুমতি দিলেন। বিমলেন্দু ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'না, বইটা।'

'বই? কি বই বলো? এখন কি পড়তে পারবে?'

'আমি না। সবিতাকে— । আলমারিতে— । ওকে দিয়ে দিয়ো।'

সুধাকরবাবুর স্ত্রীর নাম সবিতা তা বিমলেন্দু জানাতেন না। খোঁজ নিয়ে জানালেন। বাড়ি ফিরে আলমারি ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন, 'ভরদুপুরে শিহরন।' পাতা ওলটাতে তাঁর কান গরম হল। তবু পড়লেন। পড়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল। এই বই তাঁর স্ত্রী পড়তেন? তাঁর স্ত্রীকে তিনি সতীসাধ্বী বলে ভাবতেন? কিন্তু সুধাকরবাবুর স্ত্রীও কি তাই? তাঁকে এই বই দিতে বলেছেন ছন্দা।

সোজা সুধাকরবাবুর বাড়িতে চলে গেলেন বিমলেন্দুবাবু। সুধাকরবাবু তাঁকে দেখে অবাক। আপ্যায়ন করলেন। সবিতা ছন্দার খোঁজখবর নিলেন। চা খেতে হল। কিন্তু কিছুতেই বইটা পকেট থেকে বের করতে পারলেন না তিনি।

সেদিন নার্সিংহোমে যাওয়ার পথে শক্তিব্রতবাবুর বাড়িতে এলেন তিনি। 'আপনার তো এসব পড়ার অভ্যেস আছে। রাখুন।'

'কি? একি? ভরদুপুরে শিহরন? এ বই আপনি কোথায় পেলেন?' প্রায় আর্তনাদ

করে উঠলেন শক্তিব্রতবাবু।

'কেন? কি হল?'

'আরে মশাই দুজন মহিলা মহিলা সমিতি থেকে এসে বইটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি মহিলা সমিতিতে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। ওঁরা কাউকে পাঠাননি।'

'মহিলা সমিতি?' ঘাবড়ে গেলেন বিমলেন্দু।

'ভাইপোকে তাই বলেছিল। দুজনেই বয়স্কা।'

'সেকি?'

'আরে মশাই আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার খুলে নিয়েছে। টাকা পয়সায় হাত দেয়নি। এইজন্যেই বলি বিয়ে না করে ভালো আছি।' শক্তিব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এটাকে কোথায় পেলেন?'

'রাস্তায়।'

'পড়ে টড়ে বাড়িতে রাখতে না পেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। হয়ে গেল!'

'কি হয়ে গেল?' ঘাবড়ে গেলেন বিমলেন্দু।

'এবার ওই দুই মহিলার বৃদ্ধ স্বামীরা বিপদে পড়বেন। প্রৌঢ়ারা তরুণী হয়ে যাবেন আর বৃদ্ধরা সরষের ফুল দেখবেন।' হে হে হে, হাসলেন শক্তিব্রতবাবু।

নার্সিংহোমে গিয়ে দেখলেন সবিতা এসেছেন ছন্দাকে দেখতে। ছন্দা আজ ভালো। বেডে দিয়েছে ওরা। এক মুহূর্তেই বুঝে গেলেন শক্তিব্রতবাবুর বাড়িতে কারা হানা দিয়েছিল। সবিতা চলে গেলে স্ত্রীর পাশে টুল নিয়ে বসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'অবিবাহিত পুরুষের বাড়ি থেকে চুরি করে আনার মতো আর কিছু পেলে না?'

ছন্দা তাকালেন। চোখ বন্ধ করলেন লজ্জায়। তারপর একটা হাত স্বামীর হাঁটুর ওপর রেখে কাঁপা গলায় বললেন, 'অসভ্য।'

খেয়ালি

জংশন স্টেশন থেকে দুপুর সাড়ে বারোটার ট্রেন ধরলে ঠিক পৌনে চারটের সময় গমনপুরে পৌঁছে যাওয়া যায়। অগ্রিম জানোতে পারলে ভদ্রলোক স্টেশনে লোক রাখবেন। গমনপুর থেকে খেয়ালি গ্রাম গাড়িতে পনেরো মিনিটের পথ। ওই চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিয়েছিলাম কবে যাচ্ছি। মুশকিল করল মেল ট্রেনটা। সারাটা পথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যখন জংশন স্টেশনে ঢুকল তখন দুটো বেজে গেছে। গমনপুরের ট্রেন তার অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে।

কথা বলে জানা গেল ওই লাইনে দিনে দু'বার ট্রেন যায়, আসে। দ্বিতীয় ট্রেনটি ছাড়বে পৌনে ছটায়, গমনপুরে পৌঁছোবে নটায়। তা না হলে আজকের রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে, সেক্ষেত্রে কাল সাড়ে বারোটার আগে ট্রেন নেই। স্থির করলাম সন্ধের ট্রেনই ধরব। রাত নটায় পৌঁছে পনেরো মিনিটের বাসপথ নিশ্চয়ই ম্যানেজ করা যাবে। ধরে নেওয়া যাচ্ছে অরুণেশ্বরবাবুর লোক অত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।

ট্রেনের চেহারা এবং গতি ছ্যাকরা গাড়িকেও হার মানায়। যাত্রীরাও কোনোও বিশেষ পরিচয়ের নয়। টুকন টুকন কথাবার্তায় জানা গেল দিন দুয়েক খুব বৃষ্টি হওয়ায় এদিকের অনেক রাস্তা এখন প্লাবিত। জানা গেল, গমনপুরে কোনও হোটেল নেই।

ট্রেন ঠিকঠাক সময়ে স্টেশনে পৌঁছোলে আবিষ্কার করলাম আমাকে নিয়ে মাত্র দু'জন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পা দিল। টিমটিমে আলোর বাইরের পৃথিবীটায় ঘন অন্ধকার। একজন কর্মচারী গম্ভীর মুখে লুঙ্গির ওপর ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে দেখছেন যেন ট্রেনটি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বললাম, 'নমস্কার।'

ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা উঁচু করে তাকালেন যে তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মনে হল।

'আমি খেয়ালি গ্রামে যেতে চাই। কোথায় বাস পাওয়া যাবে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখানে কোনও হোটেল নেই, ধর্মশালা নেই, স্টেশনের ওয়েটিং রুমের অবস্থা খুব খারাপ। তাই হাঁটতে শুরু করুন। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।' ভদ্রলোক তাঁর অফিস ঘরের দিকে লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন।

স্টেশনের বাইরে এলাম। দুটো দোকান দেখতে পাচ্ছি তারার আলোয়, যাদের ঝাঁপ বন্ধ। লোকজন নেই। পাশেই রেল কোয়ার্টার্স। সেখানে রেডিয়োতে হিন্দি গান বাজছে। ওই ভদ্রলোক সম্ভবত ওখানেই থাকেন। এই সময় একটা সাইকেল দ্রুত

চলে এসে ব্রেক কযল, 'ট্রেন চলে গেল?'

আমার উদ্দেশে নয়, তবু উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'যাঃ শালা! আজও সটকে গেল। রাস্তার যা অবস্থা কিছুতেই জোরে আসতে পারলাম না।'

'আপনি এখানে থাকেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'এখানে মানে, আরামপুরে। চার মাইল দূরে। আপনি?'

'ওই ট্রেন থেকে নেমেছি। যেতে চাই খেয়ালি গ্রামে।' বিনীত ভঙ্গিতে বললাম।

'ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। এত রাত্রে হাঁটতে পারবেন?'

'রাস্তাটা যদি বলে দেন—!'

'উঠুন, পেছনে বসুন। এক মাইল এগিয়ে দেব, তারপর আমি বাঁ দিকে আপনি ডান দিকে। খেয়ালিতে কার বাড়িতে যাবেন?'

ততক্ষণে সুটকেশ নিয়েই ক্যারিয়ারে উঠে বসেছি। বললাম, 'অরুণেশ্বরবাবু, অরুণেশ্বর বিশ্বাস।'

'ও। ভদ্রলোকের জলজ্যান্ত ছেলেটা হুট করে মরে গেল। তা খবর দেননি কেন? দিলে নিশ্চয়ই লোক পাঠাতেন স্টেশনে।' প্যাড্‌ল ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল লোকটা। জবাব দিলাম না। দিলে অনেক কিছু বলতে হত। আমি অন্ধকার দেখছিলাম। শহরে বসে এই অন্ধকার কল্পনা করা যাবে না। লক্ষ করলাম একটু একটু করে মেঘ ছড়াচ্ছে আকাশে, ফলে তারার আলোর নিভতে শুরু করেছে। খারাপ রাস্তায় চাকা পড়ায় শরীর লাফাচ্ছে। লোকটা একসময় থামল, 'এবার আপনি ডান দিকের রাস্তা ধরে চলে যান। খেয়ালির আগে কোনও গ্রাম নেই।'

আমি নেমে দাঁড়াতেই সে নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। চারপাশে একটা পাক দিয়ে দেখলাম কোথাও আলো নেই। যেটাকে রাস্তা বলে গেল লোকটা সেটা মাটির। যা কাদা হয়ে আছে এবং পাঁচ হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না, এর চেয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা অনেক বেশি স্বস্তির ছিল।

হাঁটা শুরু করলাম। প্রায়ই কাদায় জুতো ডুবে যাচ্ছে। প্রথম দিকে জুতোর জন্যে যে মায়া হচ্ছিল পরে তা থাকল না। যা হচ্ছে হোক, পৌঁছোতে যখন হবে তখন এসব ভেবে লাভ নেই। কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ আওয়াজটা কানে এল। দু'পাশের মাঠ অন্ধকারে ঢাকা। ডান দিকের মাঠে একটি ব্যাঙ প্রবল আর্তনাদ করছে। ব্যাঙের ডাক শুনেছি, আর্তনাদ এই প্রথম। সম্ভবত সাপের পেটে যাচ্ছে ওটা। তখনই খেয়াল হল এই অন্ধকারে পায়ের সামনে সাপ পড়লেও তো বুঝতে পারব না। দ্রুত হাঁটলে ছোবল মারার সুযোগ পাবে না সাপ। সেই চেষ্টা করলাম। তার পরেই চলে এলাম বড় বড় গাছের মাঝখানে। ওগুলো কি গাছ এখন চেনা সম্ভব নয়। তবে বেশ ঝাঁকড়া। গাছের নীচে আসতেই কান্না কানে এল। যেহেতু ওটা ওপর থেকে ভেসে আসছে তাই পাখির কান্না বলেই বোধ হয়। পাখিও যে মানুষের গলার কাছাকাছি গলায়

কাঁদতে পারে তা আগে জানতাম না। শরীরে কাঁটা ফুটল।

আমি ভূতপ্রেত নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অনুভব করিনি। ভূত এবং ভগবান, দুটোই দুর্বলচিত্ত মানুষের কল্পনায় তৈরি। কিন্তু পরিবেশ কখনও কখনও এদের অস্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। এই অন্ধকারে এই গোঙানি, পাতার খসখস শব্দ, পায়ের তলার কাদা মাটি একত্রিত হয়ে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা ভূতের গল্পগুলোকে মনে আনতে সাহায্য করল। আমি দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কানের পর্দা থেকে গোঙানির আওয়াজটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। বুঝলাম আমি একটি গ্রামে ঢুকেছি। এই গ্রামের নাম খেয়ালি হলেও হতে পারে। কিন্তু বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। আলো জ্বলছে না। এখন রাত বারোটার কাছাকাছি। গ্রামের মানুষ এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন! বিস্তর ডাকাডাকির পর সাড়া মিলল। দু'জন বেরিয়ে এলেন। একজনের হাতে হারিকেন, দ্বিতীয়জনের লাঠি। আমার অবস্থা দেখে বোধহয় ওঁরা বুঝতে পারলেন আমি দুর্বৃত্ত নই। হ্যাঁ, গ্রামের নাম খেয়ালি। আর অরুণেশ্বরবাবু থাকেন দক্ষিণপাড়ায়। সামনের মোড় থেকে ডান দিকে হাঁটলেই দক্ষিণপাড়া। সবচেয়ে বড় বাড়ি তাঁর। ওঁর পিতামহ জমিদার ছিলেন। সেইসঙ্গে ওঁরা আমার পরিচয় জানোতে চাইলেন। ফাঁপরে পড়লাম। বানিয়ে বললাম, 'আমি ওঁর সঙ্গে ইনসিয়োরেন্সের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।' ওঁরা আমাকে বিদায় দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। লক্ষ করেছিলাম, কথা বলার সময় দু'জনেই চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে দেখছেন। সেই দৃষ্টি স্বাভাবিক ছিল না।

দক্ষিণপাড়ায় ঢুকেও একই দৃশ্য। কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। বই-এর পাতায় ভূতুড়ে গ্রামের যে বর্ণনা থাকে হুবহু তাই। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেও বিশাল বাড়িটাকে ঠাওর করলাম। কোথাও কোনও আলো নেই। ছাদের দিকে তাকাতেই একটা সাদা বস্তুকে নড়তে দেখলাম। তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। শুধু ছাদের এক পাশ থেকে সেটা অন্য পাশে চলে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আমি দ্রুত বাড়ির গেটে আওয়াজ করতে লাগলাম, 'বাড়িতে কেউ আছেন? দরজা খুলুন।'

বেশ কয়েকবার চিৎকার করার পর হঠাৎই দোতলা থেকে একটা টর্চের তীব্র আলো আমার ওপর এসে পড়ল। আমি চোখের ওপর হাতের আড়াল রেখে দেখার চেষ্টা করতেই গলার স্বর শুনতে পেলাম 'কে? কে ওখানে? কী চাই?'

'আমি শহর থেকে আসছি। অরুণেশ্বরবাবু আমাকে আসতে লিখেছিলেন!' চেঁচিয়ে বললাম।

'নাম বলুন!'

বললাম। তারপরেই হুকুম হল, 'কার্তিক, দরজা খুলে ওঁকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

মিনিট দুয়েক বাদে দরজা খুলল। একটা হারিকেন এগিয়ে এসে গেটের তালা খুলে সরে দাঁড়াতে আমি ভেতরে ঢুকলাম। আবার তালা লাগিয়ে লোকটা হাত বাড়াল,

'ওটা দিন।'

এততটা পথ যখন বইতে পেরেছি তখন এটুকু পারব। বললাম, 'থাক।'

'না। কর্তার হুকুম। ওর ভেতরে অস্ত্র থাকতে পারে।' তর্ক না বাড়িয়ে লোকটা আমার সুটকেস হস্তগত করল। কেউ এই বাড়িতে লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা আছে নাকি?

ভেতরে ঢোকার পর হারিকেনের আলোয় বাঁধানো উঠোন চোখে পড়ল। দু'পাশে বারান্দা। যে ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর পরনে ফতুয়া এবং ধুতি। বয়স ষাট পেরিয়েছে। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার চিঠিটা কি সঙ্গে আছে?'

ছিল, দিলাম। সেটার ওপর চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোকের গলার স্বর বদলে গেল, 'ও হো! আমার লোক গিয়েছিল স্টেশনে। দুপুরের ট্রেনে আসার কথা, না দেখে ফিরে এসেছে। আপনি এই অন্ধকারে কাদাভরা রাস্তায় কী করে এলেন?'

অল্প কথায় ঘটনাগুলো জানালাম। স্টেশনে বসে রাত না কাটিয়ে হেঁটেই আসতে পারব ভেবে এগিয়েছিলাম। রাস্তার অবস্থা জানলে পা বাড়াতাম না।

'আপনার খুব ভাগ্য ভালো তাই সশরীরে পৌঁছোতে পেরেছেন। যাক, এখন পোশাক পালটে থিতু হয়ে বসুন। রাতের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে কাজের কথা হবে। কার্তিক, বাবুকে স্নানঘর দেখিয়ে দে।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। ওঁর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র বাড়িটা কী ভয়ঙ্কর চুপচাপ হয়ে গেল! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর আমার জন্যে খাবার নিয়ে এল কার্তিক। মাছভাজা গোটা তিনেক, রুটি, ডাল, বেগুনভাজা আর সামান্য ক্ষীর। কার্তিক বিনীত ভঙ্গিতে বলল, হেঁশেল তুলে দিয়েছিল, সবার খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, এইটুকু কোনওরকমে—আপনার খুব অসুবিধে হবে!'

'আমাকে তো সারারাত মাঠেঘাটে বসে থাকতে হত। এ তো অমৃত পাওয়া!'

'আপনি খুব ভাগ্যবান বাবু।'

'কেন?'

'এত রাত্রে কুলকুলির মাঠ ভেঙে সশরীরে এলেন—!'

'কেন?' ওখানে কী হয়?'

'আত্মারা থাকেন।'

'ও। না, তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।' খাওয়া শুরু করলাম,'আচ্ছা কার্তিক, তোমাদের গ্রামের মানুষরা এত তাড়াতাড়ি দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে কেন বলো তো? মনে হচ্ছে বাইরের কাউকে ভয় করছে সবাই?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি এসব বড়বাবুর মুখে শুনবেন!' কার্তিক নড়ে উঠল, 'আপনি খাওয়া হয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। থালাবাসন কাল সকালে নিয়ে যাবে। হারিকেনটা অসুবিধে হলে জ্বেলে রাখবেন। আচ্ছা!' কার্তিক চলে গেল।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। অতটা কাদাজলে হাঁটাহাঁটি করে শরীর বোধহয় আরাম চাইছিল। দেখলাম, বেশ রোদ উঠেছে। বাথরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। কথাগুলো যদি সকালেই হয়ে যায় তাহলে দুপুরের ট্রেন ধরে ফিরে যাব।

ঘোমটা দেওয়া এক কাজের মহিলা চা নিয়ে এল ট্রেতে। শুধু চা নয়, সঙ্গে ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা আর ক্ষীর। বুঝলাম এ বাড়িতে দুধের কোনও অভাব নেই। কিন্তু সকালে প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে এত ভাজাভুজি খাওয়া অভ্যেস আমার নেই। তাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্তত করছিল। বললাম, 'এখন আমি ওসব খাই না।'

'বউদিমণি রাগ করবেন।'

বউদিমণি কে আমি জানি না। বললাম, 'তাঁকে বুঝিয়ে বোলো।'

অনিচ্ছা নিয়ে সে চায়ের কাপ নামিয়ে ট্রে তুলে চলে গেল।

চা শেষ হতেই কার্তিক দরজায় এল, 'বড়বাবু বাগানে অপেক্ষা করছেন!'

বাগানটি ফুলের নয়। নানান ধরনের সবজি চারপাশে। তার মধ্যে দুটো বড় বেঞ্চি যার একটায় বসে ছিলেন অরুণেশ্বরবাবু। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুম হল?'

'হ্যাঁ। খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই—'

'বসুন। হ্যাঁ, প্রথমে আপনার পরিচয় একটু বিশদে শুনি।'

'আমি যা লিখেছি তার বেশি তো কিছু বলার নেই।' বললাম।

'আপনার বয়স উনচল্লিশ। এতদিন বিয়ে করেননি কেন?'

'উদ্যোগ নেওয়ার কেউ ছিল না, নিজেরও ইচ্ছে হয়নি।'

'বাড়িতে কে আছেন?'

'বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। একজন কাজের লোক, অবশ্য তাকে কাজের লোক বলা চলে না। আমার বাল্যকাল থেকেই তিনি আছেন। বাবা-মা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতে চাননি। ওখানেই মারা গিয়েছেন বয়স হওয়ায়। কাশীদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি চাকরি করার পর।'

'আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর করার তাহলে ওই কাশীদা ছাড়া কেউ নেই?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'আপনি একটি বড় ওষুধের কোম্পানির ওই জেলার প্রতিনিধি। চিঠিতে যে মাইনের কথা লিখেছেন তা খুবই ভালো। একা লোক, কী করেন অত টাকা দিয়ে?'

'বছরে একবার ভারতবর্ষ দেখতে যাই। বড় হোটেলে উঠি। বেশ খরচ হয়ে যায়।'

'এবার বলুন, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন উনি আপনার মেয়ের মতো, ব্যাপারটা কী?'

'আর?'

'কত বয়স? কী করেন? ছবিতে বয়স বোঝা যায়নি। মনে হয়েছে খুব কমবয়সি। সেক্ষেত্রে আমার আপত্তি আছে। কিন্তু আপনি লিখেছেন যে আপনার বয়স এখন

ছিয়াত্তর। ছবির মেয়েটি আপনার মেয়ে হওয়া একটু অস্বাভাবিক। তাই—।'

'ঠিকই। ওটা আমার মায়ের বছর সাতেক আগে তোলা ছবি। এখন ওর বয়স তিরিশ।'

'ও।'

'এই সাত বছরে সে কিছুতেই ক্যামেরার সামনে যেতে চায়নি বলেই ওটা পাঠাতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য বয়স বাড়া ছাড়া চেহারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি।' বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন।

আমি চুপ করে ওঁকে দেখছিলাম। বার্ধক্যেও উনি সুপুরুষ।

বললেন, 'বছর সাতেক আগে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সন্তান। মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েটিকে পুত্রবধূ হিসেবে নিয়ে এসেছিলাম এবাড়িতে। সেদিন ওদের কালরাত্রি। আলাদা থাকতে হয়। ছেলে গেল বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রে যাত্রা শুনতে। ওই স্টেশনের ধারে। মাঝরাতে ফেরার সময় ওই জঙ্গলের পথে সে খুন হয়ে গেল।' বৃদ্ধ চুপ করলেন, করে থাকলেন কিছুক্ষণ।

'সে কী? কেন?'

'ভুল করেছিল। যে পার্টি খুন করে তারা অন্য কাউকে খুন করতে চেয়েছিল, অন্ধকারে বুঝতে পারেনি। ওরা পরে খুব অনুতপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমার ছেলে চলে গেল। এই হত্যার বদলা নিতে মারামারি চলল কিছুদিন। তারপর রাজনৈতিক খুনোখুনি বলে পুলিশ হাত গুটিয়ে নিল। আমার পুত্রবধূর ফুলশয্যা হল না। তার মামা এসেছিলেন খবর পেয়ে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই অবস্থায় মেয়েটির কী হবে? আমি বলেছিলাম, বউমা যদি আপত্তি না করেন তাহলে আমি তাঁকে আমার মেয়ে ভেবে মাথায় করে রাখব। আমার তো কোনও মেয়ে নেই। স্ত্রী চলে গেছেন, ছেলেও গেল, তিনি থাকলে আমি বাঁচতে পারব। সেই থেকে তিনি এখানে আছেন। কিন্তু আমার বয়স হচ্ছে। আমার পরে তাঁর কী হবে? এই ভাবনা থেকেই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।'

'কিন্তু বিজ্ঞাপনে বা তার পরে চিঠিতে এসব প্রকাশ করেননি!'

'কারণ আমার পুত্রবধূকে আমি বিবাহিতা বলে মনে করি না। বিয়ের লগ্ন ছিল মধ্যরাতের পরে, সেসব চুকতে ভোর হয়ে আসে। দিনের বেলায় ফিরে আসে এ বাড়িতে। সে রাত কালরাত্তির। সব অর্থেই। সে শেষ হয়ে যায়। মেয়েটা নিজেকে বিবাহিতা ভাবার অবকাশই পায়নি।' বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন, 'অবশ্য আপনি আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।'

আমি সত্যি কৌতূহলী হয়েছিলাম। পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে মনে করে ইনি আবার বিয়ে দিতে চাইছেন, এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

বললাম, 'এই ছবি সাত বছর আগের। এখন—!'

'নিশ্চয়ই।' বৃদ্ধ গলা তুললেন, 'কার্তিক!'

কার্তিক হাজির হলে বললেন, 'মাকে একবার এখানে আসতে বলবে?'

মাথা নেড়ে সে চলে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা প্রশ্ন। কাল রাত্রে এই গ্রামে ঢোকার পর লক্ষ করেছি সবাই যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরুচ্ছেন। কোথাও কোনও আলো জ্বলছিল না। ব্যাপারটা কী?'

অরুণেশ্বরবাবু মাথা নাড়লেন, 'মানুষ ভয় পেয়েছে।'

'কীসের ভয়? ডাকাতের?'

'না। রাজনৈতিক দলগুলো জঙ্গিভাব দেখানোর পর এ অঞ্চলে কেউ ডাকাতির কথা ভাবতে পারে না। বছর পাঁচেক আগে একরাত্রে আটজন ডাকাতকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল পার্টির ছেলেরা। তারপর থেকে ওই ভয় দূর হয়েছে।' অরুণেশ্বরবাবু বললেন।

'তাহলে?'

'গত ছয় মাসে এই গ্রামে তিনটি বাইরের মানুষ মারা গিয়েছে। গুলি বা ছুরিতে মৃত্যু হয়নি, শরীরের কোথাও সামান্য ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে রাত্রে। পুলিশ তদন্ত করে রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে গুজব ছড়িয়েছে, গ্রামের রাস্তায় দুষ্টু আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে সন্ধের পরেই দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে সবাই। আজ সকালে কয়েকজন খোঁজ করতে এসেছিলেন, কাল রাত্রে সত্যি কোনও অতিথি এ বাড়িতে এসেছে কি না এবং যদি আসে তাহলে বেঁচে আছে কি? দেখুন, এসব আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি গোয়েন্দা নই।' অরুণেশ্বরবাবুর কথার মাঝখানেই তাকে দেখতে পেলাম। বাগানের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। বিন্দুমাত্র সাজগোজ ছাড়াই সে চোখ টানছে। না, ছবির সঙ্গে তার খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে একটু শীর্ণ আর বেশি ফরসা মনে হচ্ছে। এত ফরসা যে রক্তে হেমোগ্লোবিন নিশ্চয়ই বেশ কমে গেছে।

'ডেকেছেন?' তার গলাটি বেশ মিষ্টি।

'ও হ্যাঁ। বোসো মা।' বেঞ্চির একটা পাশ দেখিয়ে দিলেন অরুণেশ্বরবাবু। সে বসলে বৃদ্ধ বললেন, 'ইনি আমাদের অতিথি। শহর থেকে এসেছেন।'

সে হাতজোড় করল, 'নমস্কার।'

আমি নমস্কার জানালাম।

'গত রাতে আপনার খেতে অসুবিধে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।' সে বলল।

'ছি ছি। দোষ তো আমারই। না জানিয়ে মাঝরাতে এসেছি। অবশ্য খেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।' মাথা নাড়লাম।

অরুণেশ্বরবাবু বললেন, 'আপনার আসার কথা ছিল বিকেলে। রাত্রে আসছেন জানোলে নিষেধ করতাম। তেমন হলে স্টেশনেই রাত কাটাতে বলতাম।'

সে আমার দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ। কাল ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করেছে।'

প্রতিবাদ করলাম, 'এ কী বলছেন? অকারণে আমাকে কেউ খুন করবে কেন?'

'ঠিকই। কোনও যুক্তি নেই। থানার দারোগা যখন অনেক অনুসন্ধান করেও কিছু

পেলেন না তখন উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন বাড়ির ভেতর থাকলে যখন বিপদ হচ্ছে না তখন রাত-বিরেতে বাইরে না গেলেই ভালো। যাক গেল, আপনারা কথা বলুন. আমার কিছু কাজ আছে. সারি গিয়ে।' কথাগুলো বলে উঠে গেলেন অরুণেশ্বরবাবু।

ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম সে স্থির চোখে আমাকে দেখছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাকে কেন উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন!'

'জানি। আপনাদের চিঠিগুলো উনি আমাকে পড়িয়েছেন।' সে নিচু গলায় বলল।

'তাহলে আপনার আপত্তি নেই!'

'আমার কথা পরে। এখানে আসার পরে বাবা নিশ্চয়ই আপনাকে আমার সব কথা বলেছেন। চিঠিতে লিখলে কি আসতেন?'

'জানি না। তবে কৌতূহল নিশ্চয়ই হত। শ্বশুর পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে বলে ভেবে নিয়ে আবার তাকে সংসারী করতে চাইছেন, এই ব্যাপারটা একটু অভিনব।'

'আপনি আর কী জানতে চান?'

'সাধারণত বিধবা হওয়ার পর মেয়েরা বাপের বাড়িতে ফিরে যান। আপনি তো তার সঙ্গে একটি রাতও থাকেননি। আপনি এখানে রয়ে গেলেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্রথম কথা, আমার কোনও বাপের বাড়ি ছিল না। থাকতাম মামার বাড়িতে। এখানে আমি পিতৃস্নেহ পেলাম। আমার নিজের বাবার স্মৃতি ঝাপসা। বিয়ের আগে আমার সম্মান নিয়ে কেউ ভাবেনি, এখানে সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে।' সে বলল।

'আমার কথা আপনি চিঠিতে পড়েছেন, আজ দেখলেন। আমাকে কি আপনার গ্রহণীয় বলে মনে হচ্ছে?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

'গ্রহণ তো করে পুরুষেরা, মেয়েদের সেটা মেনে নিতে হয়। দেখুন, বিয়ের বাসনা আমার চলে গেছে। কিন্তু বাবাকে সন্তুষ্ট করতে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' সে বলল।

'বুঝলাম। আপনাদের এখানে এক অদ্ভুত আতঙ্ক রাত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ খুন হচ্ছে অথচ কীভাবে এবং কে খুন করছে বোঝা যাচ্ছে না। আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

সে হাসল, 'দুটোই। বিশ্বাসও করি, অবিশ্বাসও। ঠিক ভগবানের বেলায় যা হয়ে থাকে।'

কিছু মনে করবেন না, কাল রাত্রে আপনি এ বাড়ির ছাদে ছিলেন?'

'কেন?' তার চোখ ছোট হল।

'কাল রাত্রে এ বাড়ির কাছে এসে দেখলাম ছাদে কিছু হাঁটছে। হয়তো সাদা শাড়ি পরা মহিলা। আপনি কি কাল সাদা শাড়ি পরেছিলেন?'

'না, সাদা শাড়ি পরতে নিষেধ করেছেন বাবা। কিন্তু কথাটা আপনি ওঁকে বলেছেন?'

'না।'

সে উঠে দাঁড়াল, 'আমার মনে হয় দিনের আলো থাকতেই আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। ওঁকে বললে উনিও একই কথা বলবেন।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'যাঁরা রহস্যজনকভাবে মারা গিয়েছেন তাঁরা নাকি মৃত্যুর আগের রাত্রে সাদা কিছুকে অন্ধকারে হাঁটতে দেখেছিলেন।'

শিরশির করল মেরুদণ্ড, সেটাকে থামাতে বললাম, 'আপনার কি মনে হয় না এটা নেহাতই গপ্পো? কষ্টকল্পনা!'

'যা ঘটেছে তাই বললাম।'

এই সময় অরুণেশ্বরবাবু ফিরে এলেন, 'কি, কথাবার্তা হল?'

উঠে দাঁড়ালাম, 'আলাপ হল।'

'মা আমার বড় ভালো মেয়ে।'

'বাবা, আমি এখন যেতে পারি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'এসো মা।' অরুণেশ্বরবাবু মাথা নাড়তেই সে চলে গেল গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাড়ির দিকে।

অরুণেশ্বর বললেন, 'এখনই আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ফিরে গিয়ে ভেবে-চিন্তে জানালেই হবে। যদি আপত্তি থাকে তাহলেও জানাবেন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে তৈরি হই?'

'সে কী কথা! স্নান খাওয়া না সেরে যাবেন কেন? আপনি আমার অতিথি।'

'ট্রেন পাব তো?'

'স্বচ্ছন্দে। বিকেল তিনটের সময় জংশনের ট্রেন আছে। কার্তিক তুলে দিয়ে আসবে। তা এখান থেকে আড়াইটে নাগাদ বের হলেই চলবে। ওই কথা থাকল। আমি একটু বেরুব।'

আমি মাথা নাড়তে অরুণেশ্বরবাবু চলে গেলেন।

বাগানটি বেশ বড়। ফলের গাছ ছাড়াও শাক-সবজির চাষ হয়েছে। তাদের নধর চেহারায় চোখের আরাম হল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। গাছে গাছে পাখি ডাকছে খুব। বাড়ির এক পাশে গিয়ে পুকুরটাকে দেখলাম। মাছ আছে বলেই মনে হল। ফেরার পথে গাছটা চোখে পড়ল। তার ডালে ডালে পাকা ফল ঝুলছে। আঙুরের আকৃতি ডাবল হলে যা দেখাবে এই ফলগুলো সেইরকম। টুকটুকে লাল হয়ে আছে। প্রচুর মৌমাছি ঘুরছে গাছটাকে ঘিরে, পাখিরা কিন্তু এই গাছে বসেনি। এই ফলের নাম জানি না। এই রকম গাছ কখনও দেখিনি। মৌমাছিরা যখন আকর্ষণ বোধ করছে তখন নিশ্চয়ই ফলটি মিষ্টি। বিষফলের গাছ কেউ বাগানে রাখবে কেন?

হাত বাড়িয়ে একটা পাকা ফল ছিঁড়ে সামান্য চাপ দিতেই রস গড়াল। জিভ ঠেকাতে বেশ মিষ্টি লাগল। ফলটা মুখে পুরলাম। মিষ্টি রসে মুখ ভরে গেল। তারপরেই সমস্ত শরীরে অদ্ভুত ঝিমঝিম ভাব ছড়িয়ে পড়ল। কোনোও রকমে ফলটি বাইরে

ফেলে দিতেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে গেল। ঘাসের ওপর বসে পড়লাম আমি। এই বসাটাও টের পেলাম না। আমি তাকিয়ে আছি কিন্তু কিছুই দেখছি না, চিৎকার করছি কিন্তু শব্দ বের হচ্ছে না এমন কি আমার কানেও কোনও শব্দ ঢুকছে না। অথচ আমার বোধশক্তি নষ্ট হয়নি। হাত-পা নাড়াতে পারছি না।

কতক্ষণ পরে জানি না, আমাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল। কার্তিক আর একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বাড়িতে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল যত্ন করে। তার পরেই অরুণেশ্বরবাবু এলেন হন্তদন্ত হয়ে। ঘটনাগুলো যে ঘটছে তা আমি টের পাচ্ছি না, কিন্তু অনুমান করতে পারছি। চোখে দেখতে পাচ্ছি না চোখ খুলেও কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে।

পরে শুনেছি ডাক্তার এসেছিল। গ্রামের ডাক্তার। লোকটা ওষুধ খাইয়ে বমি করিয়েছিল অনেকটা। তারপরেই আমি মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙলে দেখলাম আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। ঘরে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর মশারির বাইরে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। আমাকে চোখ ঘোরাতে দেখে মূর্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই আবার ঘুমে চোখ জুড়িয়ে গেল। কিছুতেই জেগে থাকতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি মশারির বাইরে চলে এলাম। দ্রুত বাইরে আসতেই সেই ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে হাঁটছে। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। মূল বাড়ির ভেতর ঢুকে একটা সিঁড়ির ওপর পা রাখতেই কেউ একজন ওর সামনে এসে দাঁড়াল, 'আজ আর ছাদে যেয়ো না মা।'

'আমাকে বাধা দেবেন না বাবা।' তার কণ্ঠস্বর।

'অতিথি অসুস্থ। কোনোওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন। ওঁর পাশে একজনের থাকা দরকার।'

'ওখানে বসে থেকে আমি ওঁর কোনোও উপকারে লাগব না। তাই না?' সে চলে গেল।

অরুণেশ্বর বললেন, 'কার্তিক খেয়াল রাখিস, ভালো ঘুম হলে ঠিক হয়ে যাবে।'

আশেপাশে কোথাও কার্তিককে দেখতে পেলাম না।

সিঁড়ি যখন জনশূন্য হল তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। সে ছাদে গিয়েছে, গত রাতেও নিশ্চয়ই গিয়েছিল। যেভাবে সে ছাদে গেল তা স্বাভাবিক নয়। মনে হচ্ছিল সেখানে যাওয়ার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হাওয়া বইছে বাগানে। শব্দ হচ্ছে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দরজায় চলে আসতেই তাকে দেখতে পেলাম। ছাদের ঠিক মাঝখানে বাবু হয়ে বসে আছে, কিন্তু মেরুদণ্ড টান টান। মুখ আকাশের দিকে। শূন্য বিশাল ছাদে এইরকম ভঙ্গির একটি মূর্তি মোটেই লৌকিক বলে মনে হচ্ছিল না।

আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। সময় বয়ে যাচ্ছে। মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে সে মুখ

নামাল। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। মাথার ওপর দিয়ে একটি নাম-না-জানা রাতপাখি চিৎকার করে উড়ে গেল। সে কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ সে গোপন করার চেষ্টা করছে না।

এই সময় সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে আমি দ্রুত সরে গেলাম। কোণের দিকে ফেলে রাখা ড্রামের আড়ালে যেতে না যেতেই অরুণেশ্বরবাবুকে দেখতে পেলাম। বড় বড় পা ফেলে ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'কি হচ্ছে কী? অ্যাঁ? তুমি এভাবে কাঁদছ জানলে লোকটা তোমাকে বিয়ে করবে? ওর আগে তিনজনকে ভাগিয়েছ তুমি, এবার কথা দিয়েছিলে বাধ্য হবে।'

সে মাথা নাড়ল। 'না, আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।'

'পারতে তোমাকে হবেই। আমি তো বেশিদিন বাঁচব না। তখন শেয়াল-কুকুর তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমার কর্তব্য আমি করে যেতে চাই। ওঠো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'না। ওরা আসবে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সে উঠে দাঁড়াল।

'আঃ। ওসব তোমার মনের ভুল। কেউ কখনও আসে না। তুমি নিজের মনে কথা বলো। শোনো, এরকম করলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।' অরুণেশ্বর থামলেন, একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ঘরে যাবে, এ আমার আদেশ।' জুতোয় শব্দ তুলে অরুণেশ্বর নেমে গেলেন ছাদ থেকে।

সে দাঁড়িয়েছিল, একা। দূর থেকেই বুঝতে পারলাম সে কাঁপছে। অসহায় এক কিশোরীর মতো এখনই ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছিল। আমি দ্রুত তার কাছে গেলাম। সামনে দাঁড়াতেই সে তাকাল। ফিশফিশ করে বলল, 'আমি এখন কী করব!'

'আপনি যেমন থাকতে চান তেমনই থাকুন।' বললাম।

'সত্যি?' তার মুখে হাসি ফুটল। তার পরেই সে হাঁটতে শুরু করল। দ্রুতগতিতে ছাদের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে চলল। লক্ষ করলাম হাঁটার সময় সে ফিশফিশিয়ে কিছু বলে চলেছে। কী বলছে শোনার জন্যে আমি ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে যখন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তখন অস্পষ্ট উচ্চারণ বুঝতে পারলাম না।

আমার সামনে নির্জন রাতের গ্রাম। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। রাস্তা শুনশান। এই গ্রামে তিনজন মানুষ খুন হয়েছেন কিন্তু তাঁদের মৃত্যুরহস্য আজও অন্ধকারে। আঘাতের কোনও চিহ্ন মৃতদের শরীরে ছিল না। এটা কী করে সম্ভব? হঠাৎ কানে এল, 'শুনতে পাচ্ছ? তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আমি যেমন আমি তেমন থাকব।' বলতে বলতে সে ছাদের মাঝখানে গিয়ে বাবু হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছিল সে? কোনও অশরীরীর অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না। ওর মন কি একা থাকতে থাকতে নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে? ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

'আপনি খুব একা?'

সে তাকাল। মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'আপনাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেলে আমি খুশি হব।' বললাম।

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যে বললেন, যেমন আছি তেমনই থাকতে পারব।'

'এরকম থাকলে আপনি মারা যাবেন।'

'আমি বাঁচতে চাই না।' শব্দে কান্না জড়ানো।

'কেন?'

হাঁটুতে মুখ রেখে সে কাঁদতে লাগল।

এই সময় অরুণেশ্বরবাবুর গলা কানে এল, 'তুমি নীচে যাও।'

বলার ধরনে এমন কর্তৃত্ব ছিল যে সে এক মুহূর্ত দেরি করল না।

'আপনি অসুস্থ, এখানে আসা আপনার উচিত হয়নি।' ভদ্রলোক জানালেন।

'যাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে এসেছি তাকে জানতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়।'

'তাই? বেশ, আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারি?'

'উনি কেন, কী কারণে ছাদে এসে এমন আচরণ করেন জানোতে পারলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

'সেটা না জানলে—?'

'আমার পক্ষে ওঁকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'বেশ। আপনাকে আর আটকাতে চাই না। ভোর ভোর একটা ট্রেন জংশনে যায়। সেটা ধরতে রাত তিনটে নাগাদ আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তৈরি থাকবেন, কার্তিক আপনাকে জানিয়ে দেবে।' কথাগুলো বলে তিনি নেমে গেলেন।

এখন আমি একা ছাদে দাঁড়িয়ে। হাওয়ারা শব্দ তুলছে। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। অরুণেশ্বরবাবু আর আমাকে আতিথ্য দিতে চান না। তাই রাত তিনটে নাগাদ এই বাড়ি থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে ট্রেন ধরতে। তখন চারপাশ অন্ধকার, রাস্তায় আরও একাকিত্ব। নেমে এলাম। তিনটে বাজতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। ঘুমটুম মাথায় উঠল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এই যাওয়াটা সুখের হবে না।

ঠিক তিনটের সময় দরজায় শব্দ হল, কার্তিক এসে দাঁড়াল। আমি তৈরি ছিলাম, ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটাও কথা না বলে কার্তিক আমাকে গেটের কাছে পৌঁছে দিল।

'দাঁড়ান। আপনাকে এগিয়ে দেব আমি।' অন্ধকার ফুঁড়ে সে বেরিয়ে এল।

'আপনি!'

'হ্যাঁ, এই গ্রামে আর একটা খুন হোক আমি চাই না।'

'আমাকে কে খুন করবে? আর যদি করে, তাহলে আপনি কী করতে পারেন।'

'যারা খুন হয়েছিল তাদের সঙ্গে কোনও সঙ্গী ছিল না। চলুন।'

'এ কি! আপনি যাবেন না, বড়বাবু খুব রাগ করবেন!' কার্তিক প্রতিবাদ করল।

সে জবাব দিল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা ফিরবেন কী করে? আপনার উচিত হয়নি আমার সঙ্গে আসা।'

'এতদিন ধরে শুধু উচিত কাজগুলো মেনে চলেছি, আজ না হয়—।'

আমরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলেছি। চারপাশের বাড়ি নিঝুম। কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। গ্রামের প্রান্তে এসে থামলাম, 'দেখলেন কিছুই হল না। এবার আপনি ফিরে যেতে পারেন।'

সে মাথা নাড়ল, 'না। আপনাকে কুলকুলির মাঠের পাশ দিয়ে যেতে হবে। চলুন।'

সেই ঝাঁকড়া গাছ, জঙ্গুলে পরিবেশ যখন ছাড়াচ্ছি তখন অন্ধকার অনেক পাতলা। যে মোড়ে এসে সাইকেলওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে বললাম, 'আর এগোতে হবে না। আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট করলেন!'

সে কথা না বলে হেঁটে চলছিল।

আমি দাঁড়ালাম, 'স্টেশন আর দূরে নেই। অনেকটা পথ আপনাকে ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি ফিরব।'

'সে কী!'

'মন থেকে ভয়টাকে সরাতে পারছি না।'

'আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।'

'না। যে তিনজন মারা গিয়েছে তারা আমাকে দেখতে এসেছিল। সমস্ত কথা জানার পর আপনার মতো রাজি না হয়ে ফিরে গিয়েছিল। প্রত্যেককেই গভীর রাতে বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এবার আমি মরিয়া হলাম। আপনাকে আমি কিছুতেই এখানে মরতে দেব না।' হাঁটতে হাঁটতে সে বলছিল।

'কেন তাদের মরতে হয়েছিল? শুধু প্রত্যাখ্যান করার কারণে?' আমি নার্ভাস।

'কিছুটা। আর বাকিটা হল, তারা অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল।' সে বলল, 'সেই জানাটা বাইরে প্রচারিত হোক তা কাম্য ছিল না।'

'কার কাছে?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই।'

আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। টিকিটঘর এই ভোরে বন্ধ। সূর্য এখনও ওঠেনি।

হেসে বললাম, 'আর কোনোও চিন্তা নেই। এখানে আপনার গ্রামের ছায়া পড়বে না।'

সে মাথা নাড়ল।

বললাম, 'অরুণেশ্বরবাবু নিশ্চয়ই খুব রাগ করবেন আপনার ওপর।'

'আমি পরোয়া করি না। কী করবে? বড়জোর খুন করবে।'

'একথা বলছেন কেন? উনি তো আপনাকে সংসারী করতে চান!'

সে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বিধবা হওয়ার পর মামার বাড়িতে ফিরে গেলে ওঁরা ভালো মনে নিতেন না। ঠিক। কিন্তু আমি কি বেওয়ারিশ ছিলাম?

মেয়ের মতো তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন সবার বাহবা পেতে অথচ প্রতি রাত্রে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে গেছেন তিনি কত একা। কতদিন নারীসঙ্গ পাননি। রাতের পর রাত তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছি। আমাকে কত লোভ দেখিয়েছেন। পুত্রবধূকে বিয়ে করা যায় না কিন্তু দুজনের শরীরকে তো তৃপ্ত করা যায়! যখন কিছুতেই রাজি হলাম না, রাত নামতেই ছাদে চলে যাই তখন বললেন তোমার বিয়ে দেব। বিয়ের পর তুমি আমার বউমা থাকবে না। তখন তোমাকে ঋণশোধ করতে হবে। আমি মেনে নিলাম। কিন্তু তিন-তিনজন পাত্র যখন আমার চেহারা দেখে সম্মতি জানালেন তখন আমাকেই সত্যি কথাটা বলতে হল। শোনার পর প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন।'

'কেন? বিয়ে হয়ে গেলে তো আপনাকে ওই বাড়িতে থাকতে হত না?'

'আসতে হত। কারণ ওটা তখন আমার বাপের বাড়ি হয়ে যেত আর উনি ঠিক আমাকে আসতে বাধ্য করতেন। আপনার ট্রেন আসছে। ট্রেনে উঠে টিকিট কাটবেন।'

'এর পরে ফিরে গেলে কী হবে বুঝতে পারছেন?' বললাম, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

সে মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। আমি পারব না। ওই বাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারব না। মাত্র একটা রাত, পাশে অনেক মানুষ, তবু একটা রাত ধরে তাকে দেখেছিলাম। ও বাড়ির ছাদে গেলেই তাকে দেখতে পাই। হোক সেটা কল্পনায়, তবু পাই তো।'

ট্রেনের জানলায় বসে তাকে দেখলাম। সবে ওঠা রোদ গায়ে মেখে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। খেয়ালির দিকে। হঠাৎ মনে হল, অরুণেশ্বরবাবুর শত্রু কি তাঁর মৃত সন্তান?

যাকে এ জীবনে তিনি কখনই হারাতে পারবেন না।

প্রেমে ওঠা

প্রেমে পড়লেন পতিতপাবন পাল। সহকর্মীরা ডাকত 'ট্রিপল পি' বলে। সেই ডাকগুলো বছর কয়েক আগে শেষ হয়েছে। এখন উনসত্তর। উনসত্তরে কোনো বঙ্গসন্তান প্রেমে পড়েন কি না তাঁর জানা নেই। অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক প্রেমে পড়া কি না তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। পার্কে ইদানীং এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয় বিকেলে গেলে। ওপাড়ার জটাবাবু। পুরো নাম জটিলেশ্বর কাঞ্জিলাল। একাশি বছর বয়স। জানেন না—এমন কোনো বিষয় পৃথিবীতে নেই। পতিতপাবনের মনে হল এ ব্যাপারে জটাবাবু তাঁকে জ্ঞানী করতে পারেন। বাস্তবে, বাংলা উপন্যাসে কেউ উনসত্তর বছরে প্রেমে পড়েছেন কি না জানা দরকার। তিনি আজ পর্যন্ত মেরে কেটে গোটা কুড়ি উপন্যাস পাঠ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই কুড়ি হাজার উপন্যাস আছে। বাকিগুলো খুঁটিয়ে পড়া এ জীবনে সম্ভব নয়।

বিকেল পাঁচটায় জটাবাবু একাই পার্কের ঈশানকোণের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। সুযোগ পেয়ে প্রসঙ্গটা তুললেন পতিতপাবনবাবু। চোখ বন্ধ করলেন জটাবাবু,—প্রথমেই আপত্তি জানাচ্ছি। —জটাবাবু বললেন, —আপনি বলবেন প্রেমে পড়ার কথা। হোয়াই নট প্রেমে ওঠা? বাঙালির একটা টেন্ডেন্সি আছে পতনের দিকে। প্রেমে পড়া, সিনেমায় নামা, অলওয়েজ নিম্নমুখী। কথাটা হবে—প্রেমে ওঠা।

তা চিরকাল 'পড়া' শব্দটাই শুনেছেন, আজ 'ওঠা'-তে উঠতে একটু অস্বস্তি হল পতিতপাবনের।

জটাবাবু বললেন, —এই যে প্রেম, এ আপনাকে উজ্জীবিত করবে, রোমাঞ্চিত করবে, উদার করবে। এই ঘটনা আপনাকে জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করবে। এতকাল বদ্ধ জলে আটকে ছিলেন, এখন ঢেউ-এর দোলায় দুলবেন। এ পতন নয়, এ উত্থান। তাই 'প্রেমে ওঠা' বলবেন। কত বয়স?

—উনসত্তর।

—এঃ। একেবারে হাঁটুর বয়সি! কি জানতে চান, উনসত্তরে প্রেমে ওঠা যায় কিনা? রবিশংকর বিয়ে করেছিলেন উনসত্তর বছর বয়সে। বিয়ের আগে অনেক অসুখের খবর পেতাম, এখন দিব্যি আছেন বউ-এর সান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমে, মানে ভিক্টোরিয়ার প্রেমে উঠেছিলেন চৌষট্টিতে। তার পরের ওই নাবালিকার কেসটা ধরলে সত্তরে। —হাত নাড়ালেন জটাবাবু।

—বাংলা উপন্যাসে—

—দূর! বিভূতিভূষণ টু সমরেশ বসু, মারা গিয়েছেন উনসত্তরের অনেক আগে। কি করে নায়ককে ওই বয়সে নিয়ে যাবেন? তাছাড়া তখনকার বাঙালি লেখকরা ছিলেন বিমল করের নায়কের মতো। কফ, কাশি, মাফলার, হাঁপানি, অজীর্ণরোগা আর বাঁদুরে টুপি। ওদের যৌবন তিরিশেই শেষ হয়ে যেত। এই যে রবীন্দ্রনাথ, 'নষ্টনীড়ের' নায়ক কে? ভূপতি না অমল? ওঁর ইচ্ছে ছিল ভূপতিকে নায়ক বানানোর, কিন্তু যেহেতু তার বয়স তিরিশ পেরিয়েছে তাই অমল ক্রিম খেয়ে গেল। বিদেশে যান, আশি-পঁচাশিতেও লেখক-অভিনেতারা প্রেমে উঠছেন। বিয়ে করছেন। একই পৃথিবীর মানুষ তো আপনি। তাই না? —জটাবাবু পতিতপাবনকে উৎসাহিত করলেন।

পতিতপাবন পাল এখনো পর্যন্ত বিয়ে-থা করেননি। বাড়িতে একজনই আছেন যাঁর শাসন এখনো মান্য করতে হয় তাঁকে, তিনি তাঁর গর্ভধারিণী। ষোলোয় বিয়ে হয়েছিল, সতেরোতে তাঁকে জন্ম দিয়েছেন। ছত্রিশ বছরে বিধবা হন। এখন এই ছিয়াশিতেও কোনো হেলদোল নেই। বাড়ির বাইরে যান না বটে কিন্তু বাড়ির সব কাজ তাঁর নির্দেশেই কাজের লোক করে। মাঝে মাঝে রান্নাঘরেও ঢোকেন। পঞ্চাশ বছরের বৈধব্যজীবন সত্ত্বেও দীক্ষা নেননি, বাড়িতে ঠাকুরঘর তৈরি করেননি। এককালের বড় চাকুরে পতিতপাবন নির্জীব হয়ে পড়েন জননীর সামনে গেলে। তা এই মহিলাকে প্রেমে ওঠার কথা না নিবেদন করলে তাঁর প্রেম পূর্ণতা পাবে না। কিন্তু এই কর্মটি করার হিম্মত পতিতপাবনের নেই।

বাড়ি ফিরে শুনলেন সন্ধ্যা মুখার্জির গান বাজছে মিউজিক সিস্টেমে। এই সাগরবেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক-একজন পুরোনো শিল্পীর গান একঘন্টা শোনেন জননী। সাতদিনে সাতজন। আবার রিপিট হয়। এই সময় উনি কথা খরচ করেন না। ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকেন চোখ বন্ধ করে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আজও একই দৃশ্য দেখলেন পতিতপাবন। হচ্ছে তো প্রেমের গান অথচ প্রেমে ওঠার কথা ওঁকে বলতে পারছেন না।

একঘন্টায় গান শোনা শেষ হলে ডাক এল—পতিত, ফিরেছিস?

পতিতপাবন ঘরে ঢুকলেন,—হ্যাঁ মা।

—তুই নাকি সকালে হেঁটে এসে বাড়ির চা খাস না?

ধক্ করল বুকটা,—না, মানে, খেতে ভালো লাগে না।

—উঁহু, লক্ষণ ভালো নয়। খাবারে অরুচি এলেই বুঝবি শরীর খারাপ হতে যাচ্ছে। তার চেয়ে সকালে না হেঁটে বিকেলে আর একটু আগে বেরিয়ে হেঁটে নিস। —জননী রায় দিলেন।

—না না। সকালে হাঁটলেই শরীরের উপকার হয়। এ নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না। —পতিতপাবন পালিয়ে বাঁচলেন।

ভোর পাঁচটায় তৈরি হয়ে নিলেন। বাইরের দরজা খুলে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে আপনা থেকেই সেটা এঁটে যায়। কিন্তু এইসময় জননী উঠবেনই।

—হাঁটতে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—তুই ফিরলে তবে চা খাব।

—আচ্ছা।

জননী দরজা বন্ধ করলেন। বাড়ি থেকে পার্ক মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ। সাদা কেডস, সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা জামা পরে ঊনসত্তরেও বেশ জোরেই হেঁটে এলেন পতিতপাবন। পার্কে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, প্রচুর লোক হাঁটা শুরু করেছে। মাঝখানের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। মাঠের ধার দিয়ে ডিমের মতো রাস্তা। হাঁটতে শুরু করলেন পতিতপাবন। আজ উলটোদিক দিয়ে।

আধাআধি যেতেই, যেখানে বড় বড় দেবদারু গাছগুলো দাঁড়িয়ে, গলা কানে এল—এই যে, আমি এখানে।

তাকালেন। যাজ্ঞসেনী বসে আছেন বেঞ্চিতে। কিছুদূরে তাঁর পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। তার কাঁধে ফ্লাস্ক, হাতে বাস্কেট।

—গুডমর্নিং। —কাছে গিয়ে বললেন পতিতপাবন।

—মর্নিং। বেলা, সাহেবকে চা দে।

পতিতপাবন আপত্তি করলেন।

—সে কি? আমি মকাইবাড়ির চা নিয়ে এসেছি। লিকার, এক চামচ মধু দিয়ে তৈরি। না খেলে খুব দুঃখ পাব। ঠোঁট ফোলালেন যাজ্ঞসেনী।

—'মকাই বাড়ি'—বিড়বিড় করলেন পতিতপাবন।

—হ্যাঁ। দে বেলা।

বেলা নামের পরিচারিকা সঙ্গে সঙ্গে কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিল।

—আপনি?

—এখন না, এর পরের বার। চিকেন স্যান্ডউইচ আছে আজ।

পতিতপাবন হাসলেন—বাব্বা! বেড়াতে এসে এত সময় পান?

—আগে তো করতাম না, এখন করি। যাজ্ঞসেনী বললেন,—আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না, কত জায়গা পড়ে আছে। বেলা, যা, একটু ঘুরে আয়। আধঘণ্টার মধ্যে আসবি। যা।

যাজ্ঞসেনী হাত নাড়তেই বেলা উধাও হল।

আলাপ মাত্র দশদিনের। এই ভোরে হাঁটতে হাঁটতে একটু জিরোচ্ছিলেন, পরিচারিকাকে নিয়ে যাজ্ঞসেনী এখানে এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি সঙ্গীতার স্বামী, না?

—না না। আমি অবিবাহিত।

—ইয়ে, কিছু মনে করবেন না। কি ভুলটাই না করেছি।

—তাতে কি হয়েছে? আমি পতিপাবন মিত্র।

—আমি যাজ্ঞসেনী দত্ত। উইডো। বিয়ের আগে বোস ছিলাম।

—ও। খুব স্যাড। —পতিতপাবন বললেন,

—স্যাড কেন?

—না, আপনার উনি চলে গেছেন।

—ভালোই হয়েছে। ক্যান্সারে ভুলছিল। যন্ত্রণা পাচ্ছিল খুব। আমার তখন অল্প বয়েস। এই উনচল্লিশ কি চল্লিশ। কুড়ি বছর হয়ে গেল।

—তাহলে অবশ্য ভালোই।

—চা খাবেন?

—চা?

—বেলা, সাহেবকে চা দে।

সেই আলাপ। তারপর প্রতিটি সকালে একঘণ্টার জন্যে দেখা, হাঁটা মাথায় উঠল। জানলেন যাজ্ঞদেবীর বয়স উনষাট। ছেলে-মেয়ে হয়নি। নিজের বাড়ি। অর্থাভাব নেই। গান শোনা আর বই বড়া ওঁর হবি। আর খাওয়াতে ভালোবাসেন। কিন্তু ভালোবাসলেই তো হল না, ভালো লোক চাই, যাকে খাওয়ানো যায়।

তাই ভোর না হতে হতেই মন আনচান করে আজকাল। কখন যাজ্ঞসেনীর দেখা পাওয়া যাবে! এককালে যে সুন্দরী ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়; স্লিভলেস পরেন। সেকালে হয়ত শাঁখের মতো ছিল হাত দুটো, এখন গজদাঁতের মতো। তাই বা কম কি!

—আমি আর পারছি না। —যাজ্ঞসেনী বললেন।

—কি ব্যাপারে? —পতিতপাবন বুঝতে পারলেন না।

—দুষ্টু। কিছু বোঝেন না যেন!

—ও।

—আজই বাড়িতে আসতে হবে।

—বাড়িতে?

—হু। কোনো ভয় নেই। একতলায় বাবা থাকেন। বাতের ব্যথায় সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না, তাই দোতলায় আমি একা। কি একা! —যাজ্ঞসেনী বললেন।

—বাবা বেঁচে আছেন? কি ভালো!

—নাইন্টি। বাবা মানে আমার শ্বশুরমশাই। মাইডিয়ার মানুষ। ওঁকে বলেছি আপনার কথা। খুব খুশি হয়েছেন।

—খুশি হলেন কেন?

—বললেন, যাক, তবু তুমি সঙ্গী পেলে। শুনুন মশাই, আপনি আমার বাড়িতে না গেলে বাবা আপনার বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে প্রস্তাব দেবেন।

আঁতকে উঠলেন পতিতপাবন, —অসম্ভব!

—কেন? অসম্ভব কেন?

—আমার মা যে কি, মানে কত কড়া তা তো জানেন না!

—আশ্চর্য! উনসত্তর বছরেও আপনি শিশু হয়ে আছেন নাকি?

—না, তা নয়—

—তার মানে মায়ের ভয়ে আপনি এগোবেন না?

—তা নয়—

—তা-নয় তা-নয় করছেন, হয়টা কি? বলুন?

পতিতপাবন চুপ করে থাকলেন। সেটা দেখে যাজ্ঞসেনী সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, —সব খুলে বলুন তো। আপনি আমার প্রেমে পড়েননি?

—না, প্রেমে উঠেছি।

—মানে?

জটাদার কথা বললেন পতিতপাবন। শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন যাজ্ঞসেনী, একবার পতিতপাবনের গায়েও ছোঁয়া লাগল। সেই সঙ্গে ভালো সেন্ট নাকে এল। পতিতপাবন বললেন,—ভাবছি আমি নিজেই মাকে বলব।

—গুড! এই তো চাই। আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসতে হবে বাবা আলাপ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। যাজ্ঞসেনী ঘোষণা করলেন।

দরজা খুলল বেলা। দেখেই চ্যাঁচাল—এসে গেছেন! এসে গেছেন! মা এখন বাথরুমে। বসুন।

—কে রে বেলা? —বৃদ্ধের গলা কানে এল।

—ওই যে, সে! —বেলা কান পর্যন্ত হাসল। বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। পাকা আমের মতো দেখতে।

—পতিতপাবন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বউমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ?

—না, মানে—

—আবার 'না' কিসের? বসো। বে-থা করোনি শুনলাম।

—হ্যাঁ। করা হয়ে ওঠেনি।

—এই কুড়ি বছরে অন্তত পনেরো জনকে দেখলাম। ম্যাক্সিমাম আয়ু যার ছিল, সে তিন সপ্তাহ এসেছিল। ব্যস।

—কেন?

—বউমা তো সতী-সাবিত্রী মহিলা। খাবার খাওয়াবে, গল্প করবে, যত্ন নেবে কিন্তু নিজের ঘরে একা শোবে আমার ছেলের ছবি নিয়ে। বিয়ের পর কোন্ পুরুষ সেটা সহ্য করবে বলো! আমার মতো বুড়োও করবে না। —ফিকফিক করে হাসলেন বৃদ্ধ।

পতিতপাবন আর দাঁড়ালেন না। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে পা বাড়ালেন। প্রেমে পড়লে গড়াগড়ি খেতে হয়, কিন্তু প্রেমে উঠলে তো উড়ে যাওয়া যায়। আর যাই হোক প্রেমে ওঠা তো ওলাওঠা নয়!

মেট্রোতে এক রাত

নটা বিয়াল্লিশে মেট্রো রেলের শেষ ট্রেনের টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা ধারার জন্য সিঁড়ি ভেঙে ওর উঠতে দু'মিনিট সময় দরকার হয়। সৌমেনের টিকিট কাটার ঝামেলা নেই। সেই সারা মাসের টিকিট একবারেই কেটে রাখে। এতে কিছু টাকাও বেঁচে যায়। আজ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে টালিগঞ্জ মেট্রোর গেটের কাছে আসতেই একজন মহিলা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনার কাছে এক্সট্রা টিকিট আছে? কাউন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার এখনই শ্যামবাজার যাওয়া খুব দরকার!'

ঘড়ির দিকে তাকাল সৌমেন, দু'মিনিট দশ সেকেন্ড বাকি ট্রেন ছাড়তে। সে নিজের জন্য টিকিট পাঞ্চ করিয়ে, ওটা বের করে দ্বিতীয়বার পাঞ্চ করালো।'ঢুকে পড়ুন।' বলে টিকিট নিয়ে দৌড়োল নীচের দিকে। ওপর-নীচ করে ট্রেনে উঠতে তার ঠিক একমিনিট সময় লাগে। সামনের কামরা ফাঁকা। উঠে বসল সে। এই জায়গাটায় সে ফেরার সময় বসে যখনই টালিগঞ্জে আসে।

বসার পরে খেয়াল হতে হতে ট্রেন ছেড়ে দিল। এখনই ঢুকে যাবে সুড়ঙ্গে। আট টাকা চলে গেল। একজন অজানা অচেনা মহিলার জন্যে আটটা টাকা সে কেন খরচ করল? একটা পুরুষ যদি বলত তাহলে কি সে রাজি হত? না। হত না। মহিলার মুখটাও এখন ভালো করে মনে পড়ছে না। এই ট্রেনেই নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু কোন্ কামরায়? আর সেটা খুঁজে দেখে ওঁর কাছে টিকিটের দাম চাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার সৌমেনের কাছে।

কালীঘাট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে আজ বেশি লোক উঠল না। কিন্তু সৌমেন চমকে উঠল গলা শুনে, 'আচ্ছা মানুষ তো! চট করে এখানে চলে এলেন আর আমি অন্য কম্পার্টমেন্টে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!' ধপ করে পাশের খালি বেঞ্চিতে বসে পড়লেন মহিলা, 'উঃ। কি ভয় যে পেয়েছিলাম!'

'ভয়? কেন?' সৌমেন না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'বাঃ! এই আপনার বুদ্ধি! আমি বেরুব কী করে? আমার কাছে কি টিকিট আছে? ওটা তো আপনার পকেটে। বেরুতে পারব না। টিকিট গর্তে না ঢোকালে দরজাই খুলবে না। ব্যস। মেট্রোর লোকজন আমাকে ধরবে। অনেক টাকা পেনাল্টি করবে, বেশি রাগি লোক হলে জেলেও পাঠাতে পারে। ভয় পাব না?'

'অনেক সময় গেট খোলাই থাকে। শেষ ট্রেনের বেলায়—মানে ওঁদের তো বাড়ি

ফেরার তাগাদা থাকে। সেরকম হলে টিকিট পাঞ্চও করতে হয় না। গটগট করে বেরিয়ে যাওয়া যায়।' সৌমেন বলল।

'যদি না যায়? যদি গেট বন্ধ থাকে? বেশ বাজি রাখুন।'

'কিসের বাজি?' সৌমেন অবাক।

'গেট বন্ধ থাকলে আপনি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবেন আর খোলা থাকলে আমি আপনাকে খাওয়াব!'

সৌমেন হাসল। জবাব দিল না। আটটা টাকা তো গিয়েছে, তার ওপর কফির দাম দিতে ইচ্ছে করছে না। সে তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা। কোলের ওপর নিয়ে এল। আজ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনের ফলের দোকানে দারুণ দারুণ কাশীর পেয়ারা বিক্রি হচ্ছিল। এগুলো শোভাবাজারে দেখা যায় না। গোটা চারেক কিনে ফেলেছে সে। তাতেই এককিলো ওজন বেড়ে গেছে ব্যাগের।

নেতাজিভবন স্টেশনে কামরা ভরে গেল। এক বৃদ্ধা উঠে এসে সৌমেনের সামনে দাঁড়ালেন। বোঝা যাচ্ছিল চলাফেরায় তেমন অভ্যস্ত নন। ওপরের হ্যান্ডেলের নাগাল পাচ্ছিলেন না। সৌমেন উঠে দাঁড়াল, 'আপনি বসুন।'

বেঞ্চিতে বসে বৃদ্ধা বললেন, 'বাঁচালে বাবা!'

আশপাশের লোকজন হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেল।

মহিলা বললেন, 'দিন, আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন।'

সৌমেন বলল, 'না, না, ঠিক আছে।'

'আশ্চর্য! ভারী ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন যখন আমি বসে আছি, দিন।' শেষ শব্দটি এমন ঝংকারে উচ্চারিত হল যে ব্যাগ না দিয়ে পারল না সৌমেন।

বৃদ্ধা হাসলেন, 'ছেলে বোধহয় কাউকে কষ্ট দিতে চায় না।'

মহিলা বলল, 'হুঁ! আমি শুধু ভয়ে মরছি।'

ওঁকে থামাতে সৌমেন বলল, 'অযথা ভয় পাচ্ছেন।'

'অযথা? আপনি কোথায় নামবেন তা কি আমি জানি?' মহিলা মুখ তুললেন।

'শোভাবাজারে।'

'সর্বনাশ।' মহিলা চোখ বন্ধ করলেন।

'কেন?'

'আমি বেলগাছিয়ায়। আপনি শোভাবাজারে নেমে গেলে বেলগাছিয়া স্টেশন থেকে বেরুব কি করে?'

'আমার সঙ্গে শোভাবাজারে নামুন। নেমে বাস ধরে চলে যান!'

'এই মেট্রো ছেড়ে কেউ একই পথের বাসে ওঠে?'

'যদি আমার সঙ্গে দেখা না হত তাহলে তো টালিগঞ্জ থেকে বাসেই আসতেন?

'আসতাম না।'

'ও।'

'প্লিজ, বেলগাছিয়া বলছি না, শ্যামবাজার পর্যন্ত চলুন। ওখান থেকে বাসে আমার দুটো স্টপ, আপনারও দুটো।' মহিলা কাতর হয়ে তাকালেন।

মুখ ঘুরিয়ে নিল সৌমেন। আট টাকা গেছে, বাসে উঠলে আরও চার টাকা। রাত দশটার পরে দূরত্বটা হাঁটতে কারও ইচ্ছে করে? অদ্ভুত পরিস্থিতি!

'এত ভারী কেন? গোল গোল কী এতে?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওই আর কি!' সৌমেন বিরক্ত হল।

'দেখব? দেখি?' হাত ঢোকালেন মহিলা। পেয়ারা বের করে চোখ বড় করলেন, 'আরিব্বাস। এ তো এক্সপোর্ট কোয়ালিটির পেয়ারা। কোথায় পেলেন?'

'টালিগঞ্জে।'

ততক্ষণে আশপাশের কেউ কেউ পেয়ারার প্রশংসা আরম্ভ করেছেন। একজন বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কাশীর পেয়ারা, ভেতরটা লাল।'

মহিলা বললেন, 'লাল? লাল কিনা দেখব?'

সৌমেন কিছু বলার আগেই কামড় দিলেন মহিলা। তারপরেই একটু আফশোশী গলায় বললেন, 'এমা, কেন কামড়ালাম? এত বড় পেয়ারা একা খেতে পারব?' দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রৌঢ় পকেট থেকে নেলকাটারের ছুরি বের করে বললেন, 'দিন, কেটে দিচ্ছি।' কাটা হল। দেখা গেল, ভেতরটা সত্যি লাল।'

'আপনি খান একটু—।' মহিলা এক-টুকরো এগিয়ে ধরলেন।

'নাঃ।'

সৌমেন না বললেও পেয়ারার টুকরোগুলো বিতরিত হয়ে উধাও হল।

শোভাবাজার স্টেশন আসছে, ব্যাগটা নিয়ে এখানেই নেমে পড়া উচিত।

'আমার ব্যাগটা।'

'এখনও শ্যামবাজার আসেনি।'

'এসে যাবে।'

কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না, শোভাবাজার ছেড়ে শ্যামবাজারের দিকে এগোল ট্রেন। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, 'এতটা করলেন, বেলগাছিয়া পর্যন্ত গেলে কী ক্ষতি হত? না হয় একটু বাসে চড়া হত!'

'আমি কিছুই করিনি।' সৌমেন ব্যাগটা নিয়ে নিল।

মান্থলি টিকিট দুবার পাঞ্চ করিয়ে মহিলাকে ভয়মুক্ত করে ওপরে উঠতে গিয়ে সৌমেন আবিষ্কার করল, ওঠা যাচ্ছে না। ভিড় থিকথিক করছে সিঁড়িতে। শুনল উত্তর কলকাতা জলে ভেসে গেছে। শ্যামবাজারের মোড়ে এক কোমর জল। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। অত জল মানে বাস বন্ধ। অত জল ভেঙে শোভাবাজারে পৌঁছোনো মানে নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়া। প্রচণ্ড রাগ হল।

মহিলা পেছনেই ছিলেন! দেখলেন? গোঁ ধরেছিলেন বলে এখানে নামতে হল। বেলগাছিয়ায় নামলে তিনমিনিটেই বাড়ি পৌঁছে যেতাম। এখন তো বাসও চলবে

না। এত রাত্রে বাড়িতে ফিরব কী করে?'

'আমার কথাটা দয়া করে ভাববেন?' জোরে বলল সৌমেন।

'ভেবেই তো বলছি। আপনি বাস না পেলে আমার বাড়িতে থেকে যেতেন।'

'আপনার বাড়িতে?' হতভম্ব হয়ে গেল সৌমেন।

'তাতে কী আছে। আমার বিপদে আপনি রক্ষা করেছেন, আপনার বিপদে—।'

এ কি! ট্রেনটা এখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কেন?' মহিলা সেদিকে এগোলেন।

এইসময় আকাশবাণী হল, 'মেট্রোরেলের লাইনে জল ঢুকে যাওয়ার দমদম পর্যন্ত ট্রেন এখনই যাবে না। যাত্রীদের অসুবিধের জন্যে আমরা দুঃখিত।'

সৌমেন তাকাল মহিলার দিকে, একটু খুশি হয়েই তাকাল।

মহিলা কাঁদো-কাঁদো হলেন, 'কী হবে এখন?'

রাত একটায় বৃষ্টি থামল। স্টেশনের আলো নিভে গেল। যাঁরা বাইরে বেরুবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা সুটসাট জল ভেঙে মিলিয়ে গেল কর্পূরের মতো। ওরা ওপরে উঠে এসে দেখল রাস্তা অন্ধকার, জল জমে আছে হাঁটুর ওপর।

সৌমেন বলল, 'এই জল ভেঙেই যেতে হবে।'

ককিয়ে উঠলেন মহিলা, 'এত রাত্রে এই জল ভেঙে একঘণ্টা হাঁটব আমি?'

সৌমেন জবাব দিল না। জবাব দেওয়া যায় না।

'আপনার বাড়ি কাছে। কে কে থাকে?'

'কেন? আপনি যাবেন নাকি?' চমকে উঠল সৌমেন।

'না, না। আপনি যদি আমাকে পৌঁছে দেন।'

'অসম্ভব!'

'প্লিজ। একজন অসহায় নারীর কথা ভাবুন।'

দোনমনা করে জলে নামল সৌমেন। কয়েক মিনিট হাঁটতেই শ্যামবাজারের মোড়। একটা রিকশওয়ালা অবতারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে এককথায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কত নেবে জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'যা দেবেন।'

মহিলা আঁতকে উঠলেন, 'যাব না। এর বদ মতলব আছে। এত রাত্রে জলের মধ্যে পাঁচগুণ বেশি চায় ওরা, এ বলছে যা দেবেন।'

অতএব সৌমেনও রিকশয় উঠল। মহিলার বাড়ির সামনে পৌঁছোলে তিনি রিকশ থেকে নেমে দশটাকা দিলেন রিকশওয়ালাকে। তারপর বললেন, 'নামবেন না?'

'না। আমি এই রিকশয় ফিরে যাব।'

'তা কি হয়? আমার বাড়িতে চলুন। সকালে যাবেন।'

এইসময় বাড়ির দরজা খুলে গেল। একটা বয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন, 'ও, তুই আসতে পারলি। কী দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।'

'আমার বাবা।'

'ও।'

'আসুন। এখান থেকে চলে গেলে খারাপ দেখাবে।'

অতএব বাড়িতে ঢুকতে হল। মহিলা পরিচয় করালেন, 'ওঁর জন্যেই এতরাত্রে নিরাপদে ফিরতে পেরেছি।' মহিলা ভেতরে চলে গেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'কী বলে ধন্যবাদ জানাব—!'

'না না। তার দরকার নেই।' সৌমেন বলল, 'আসি।'

'আসুন। কতদূর যাবেন?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

'শোভাবাজারে।'

'ও, কি বলি! আপনার চলে যাওয়াই ভালো।'

বেরিয়ে এল সৌমেন। রিকশওয়ালাটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'শোভাবাজার যাবে?'

'যাব।'

'কত নেবে?'

'যা দেবেন।'

'অদ্ভুত তো।'

'বাবু—।'

'কী?'

'ওই দিদি ভুল করে দশটাকার বদলে কুড়িটাকার নোট দিয়ে গেছেন। আমার কাছে খুচরো নেই। কি করে ফেরত দেব?'

রিকশয় উঠে বসল সৌমেন, 'ফেরত দিতে হবে না। চলো।'

'কিন্তু সেটা অন্যায় হবে বাবু।'

'একদম না। আমার ভাড়ার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দেব।'

রিকশ চলেছিল। ঠান্ডা বাতাস বইছে।

আটটাকা নষ্ট হওয়ার শোক ভুলে গেল সৌমেন। ভদ্রমহিলার নাম না জানার চেয়ে যেটা অনেক আনন্দদায়ক!

হঠাৎ হয়ে যায়

দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে রবিবারের সকালটা কাটিয়ে দেওয়ার বিকল্প আর কিছু নেই ইন্দ্রজিতের কাছে। সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর এই সময়টা তার নিজস্ব, আরাম করার সময়। যোধপুর পার্কের এই বিরাট ফ্ল্যাটটার বাসিন্দা ছয়জন। ওরা তিনজন আর কর্মচারী তিনজন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে এটা মেনে নিতে পারত না ইন্দ্রজিৎ, এখন এটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এখন ইন্দ্রজিতের চোখ বন্ধ, পাশের টুলের ওপর তিন তিনটে খবরের কাগজ, পায়ের তলায় সুন্দর বেঁটে মোড়া।

একটা ঘর পেরিয়ে ছোট লাইব্রেরি রুমে তখন সুনেত্রা। ইন্দ্রজিতের পড়ার অভ্যেস এবং সময় না থাকলেও সুনেত্রার আছে। টিভি দেখতে ওর মোটেই ভালো লাগে না। কখনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান দেখালে সামনে গিয়ে বসে। সেই ছেলেবেলা থেকে যে সব বই পড়ে এসেছে তাদের একত্রিত করে রাখার ব্যাপারে সে সচেষ্ট। যে বইটি পনেরো বছর বয়সে পড়েছিল তার বিষয়বস্তুর আকর্ষণ তেমন না থাকলেও সেটি স্পর্শ করলে সেই দিনটিতে ফিরে যেতে পারে অনায়াসে। বাবার কিনে দেওয়া বইটিতে পনেরো বছরের হাতে লেখা নামটা এখন ওর কাছে বড় আদরের। বইগুলোতে ধুলো জমার কোনও সুযোগ নেই তবু ঝাড়ন বোলাচ্ছিল সুনেত্রা, এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ছেলে, 'মাম।'

ছেলের বয়স উনিশ। ফরসা, সুন্দর চেহারা, ছয়ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। কথা বলতে গেলে মুখ তুলে তাকাতে হয়। যাদবপুরে পড়ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান। জয়েন্টে প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে ছিল।

'কিছু বলবি?' সুনেত্রা পথের পাঁচালীটা বের করল।

'আই অ্যাম ইন প্রব্লেম!' ছেলে বেঁকে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার?' মুখ তুলে তাকাল সুনেত্রা।

কাঁধ নাচাল ছেলে, ঠোঁট বেঁকাল, 'শি হ্যাজ মিস্‌ড হার মান্থ!'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠল সুনেত্রা।

'ইটস নট আওয়ার ফল্ট। হয়ে গেছে। টিলা খুব আপসেট। প্লিজ হেল্প হার। আমি সুইমিং-এ যাচ্ছি। বাই।' ছেলে বলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড শরীর অসাড়, শুধু বুকের ভেতরটা দুমড়ে উঠছে। ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল সুনেত্রার।

পথের পাঁচালীকে যথাস্থানে না রেখে সে দ্রুত বেরিয়ে এসে কমলাকে দেখতে পেল, 'বাবি কোথায়?'

'ছোটবাবু তো বেরিয়ে গেল!'

সুনেত্রা নিশ্বাস নিতে পারছিল না। এত বড় কাণ্ড করে কি রকম নির্লিপ্ত গলায় বলে গেল, সাহায্য করো। মাথা ঝিম ঝিম করছিল সুনেত্রার। বেডরুমে গিয়ে সে শুয়ে পড়ল। মাস তিনেক আগে ডাক্তার বলেছিল, আপনার প্রেসারটা গোলমাল করছে ম্যাডাম, এখন থেকে রোজ অ্যামটাফ ফাইভ আর ইকোস্পিন সেভেন্টি ফাইভ খেয়ে যেতে হবে যতদিন বাঁচবেন। ওই ওষুধ-দুটো ব্রেকফাস্টের পর খেয়ে সে বেশ ভালোই ছিল। এখন মনে হচ্ছে পায়ের তলা ঝিমঝিম করছে, মাথা ঘুরছে। মিনিট দশেক চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে টিলার মুখ মনে পড়ল। মেয়েটাকে মাত্র একদিন দেখেছে সে। ছেলের সঙ্গে পড়ে। খুব ভালো মেয়ে। প্রায় পুতুলের মতো দেখতে। ছেলের থেকে তিন নম্বর বেশি পেয়েছিল জয়েন্টে। জনা চারেক ছেলেমেয়ে আধঘণ্টার জন্যে এসেছিল, তখন আলাপ হয়েছিল টিলার সঙ্গে। খুব মিষ্টি আর শান্ত বলে মনে হয়েছিল ওকে। ব্যস এটুকুই।

সুনেত্রা উঠল।

দক্ষিণের বারান্দায় যেতেই ইন্দ্রজিৎ ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ইটস টু মাচ। তোমার ছেলেকে আমি বার বার বলেছি গাড়িতে হাত না দিতে কিন্তু ওটা ওর কানে ঢুকছে না। একটু আগে কাউকে কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল!'

'চাবিটা তোমার কাছে রাখলে কী অসুবিধে হয়!'

'আশ্চর্য! আমার বাড়িতে আমি চোরের ভয়ে জিনিস লুকিয়ে রাখব? ও যে কথা শুনছে না সেটা তোমার নজরে পড়ছে না?' সোজা হল ইন্দ্রজিৎ, 'এই জন্যেই বলে বেশি আদর দিলে মাথায় চড়ে বসে। আমার বাবা কোনও নিষেধ করলে আমি সেটা অমান্য করার কথা ভাবতেই পারতাম না! গায়ে হাত তোলা যাবে না, বলে লাভ হচ্ছে না, এখন শুধু গিলে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, গেলা ছাড়া আর উপায় কি?' দ্বিতীয় চেয়ারটিতে বসল সুনেত্রা।

'গত রবিবার দু'দুটো অ্যাকসিডেন্ট করেছে। বললেই বলে অন্য গাড়ির দোষ। কিন্তু আমার পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে গ্যারাজের বিল মেটাতে। তাও যদি পুরোনো অ্যাম্বাসাডারটা নিত গায়ে লাগত না, ওর এস্টিম ছাড়া নবাবি দেখানো চলবে না। তা ছাড়া আজকাল ওর কথাবার্তা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

স্ত্রীর দিকে তাকানোয় গলার স্বর বদলে গেল ইন্দ্রজিতের, 'তোমার কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'চেপে যাচ্ছ কেন? প্রেসার বেড়েছে?'

'জানি না। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

সুনেত্রা চুপচাপ সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। বুকের ভেতরটা কী-রকম করছিল তার। তারপর বলল, 'একটা কথা রাখবে?'

'আশ্চর্য! কথাটা কী তা বলবে তো?'

'না। আগে তোমাকে কথা দিতে হবে।'

অস্বস্তিতে মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ। তারপর মেনে নিতে বাধ্য হল, 'ঠিক আছে।'

'আমি যা বলব তা শুনে তুমি উত্তেজিত হবে না।' সুনেত্রা নিশ্বাস ফেলল, 'এখন আমাদের যা করার মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে।'

ইন্দ্রজিৎ চোখ বড় বড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। সুনেত্রার কথা বলার ধরন তার ভালো লাগছিল না। খুব বড় রকমের কাণ্ড না হলে সুনেত্রা এমনভাবে কথা বলবে না।

'তুমি তো টিলাকে চেনো না।' সুনেত্রা বলল।

'টিলা? কে টিলা?'

'বাবির সঙ্গে পড়ে।'

'অ। তো কি হয়েছে তার?'

'টিলা সম্ভবত কনসিভ করেছে।' নিচু গলায় বলল সুনেত্রা।

'সে কি! নিশ্চয়ই বিয়ে হয়নি?'

'আশ্চর্য! এই তো স্কুল থেকে বেরিয়ে জয়েন্ট দিয়ে বাবির সঙ্গে পড়ছে।'

'দ্যাখো, কী অবস্থা! এইটুকু মেয়ে কোথায় নেমে গেছে! ভাগ্যিস তোমার মেয়ে নেই, ছেলেকে নিয়ে একরকম সমস্যা, মেয়ে থাকলে তো—! ওর বাবা-মা জানেন?' ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করল।

'জানি না। বোধহয় জানে না।'

'কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'বাবি বলল।'

'বন্ধুকে জানিয়েছে অথচ নিজের বাবা-মাকে জানায়নি! তা এ নিয়ে তোমার এত আপসেট হওয়ার কী কারণ আছে। এটা ওর মা-বাবার সমস্যা, তোমার নয়।'

'আমাদেরও।'

'তার মানে?' ইন্দ্রজিতের গলা আচমকা শুকিয়ে গেল।

'তোমার ছেলে বলল, ইটস নট আওয়ার ফল্ট, হয়ে গেছে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রজিৎ।

'চিৎকার কোরো না।'

'কী বলছ তুমি? ওইটুকুনি ছেলে, উনিশ বছর বয়স, জুতো মেরে ওর মুখ ভেঙে দেব আমি। কোনওদিন গায়ে হাত দিইনি বলে—। ওঃ হারামজাদা আমাকে পাগল

করে দেবে। কোথায় গিয়েছে সে, জানো?'

'কেন? সেখানে যাবে?'

'হ্যাঁ যাব। আমি ওকে এমন শাস্তি দেব যা জীবনে ভুলবে না। আমার ছেলে ব্রিলিয়ান্ট, হ্যান্ডসাম, স্মার্ট শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ছেলে যে একটি অবাধ্য বাঁদর তাই এতদিন জানতাম। কিন্তু—, কোথায় গেছে সে?' উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। তার মুখের চেহারা বদলে গেছে।

'বোসো!'

'সুনেত্রা!'

'আমি তোমাকে অনুরোধ করেছি উত্তেজিত না হতে।'

'আরে, এই কথা শোনার পর আমাকে তুমি শান্ত হতে বলছ? ওইটুকুনি ছেলে, সবে স্কুল ছেড়েছে, কখন ক্রিমিনাল হয়ে গেল! আমার ছেলে রেপ করেছে আর আমি শান্ত হয়ে বসে থাকব?' ইন্দ্রজিৎ আবার বসে পড়ল।

'রেপ বলছ কেন?' নিচু গলায় বলল সুনেত্রা।

'ওই হল!' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'এই সেদিন জন্মাল, চোখের ওপর বড় হতে দেখলাম, সে কি না—! তোমার কাছে সোজাসুজি বলল?'

'হ্যাঁ। এটাই প্লাস পয়েন্ট, লুকোয়নি।'

'আশ্চর্য! আমি খুনটুন করে এসে লুকোলাম না, আমার সাত খুন মাপ হয়ে যাবে? আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল।'

'কখন?'

'একটা বাচ্চা, কোনও ভাইবোন নেই, এদের বেশির ভাগই শয়তান হয়। এই যে মুখার্জির ছেলেটা, ব্রিলিয়ান্ট বয়, কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারের জন্যে বাপ-মাকে ফেলে চলে গেল। এখন শুনেছি ফোন পর্যন্ত করে না।'

'অন্যের কথা না ভেবে কী করা যায় চিন্তা করো।'

'মেয়েটা কে?'

'ওর সঙ্গে পড়ে।'

'কি রকম ফ্যামিলির মেয়ে? তোমার ছেলেকে নিশ্চয়ই কলেজে ঢোকার পর চিনেছে, এর মধ্যেই এতটা এগিয়ে গেল? বাপমায়ের কোনও শিক্ষা নেই?'

'সেটা তোমার ছেলের ক্ষেত্রেও তো বলা যায়।'

'আমার ছেলে বলবে না।'

'ছেলে তো আমার একার হতে পারে না।'

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ কথা বলল না। সুনেত্রাও চুপ করে বসে রইল। ইন্দ্রজিতের মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরটা কীরকম হু হু ফাঁকা হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে কথা বলল, 'ব্যাপারটা হয়েছে কোথায়?'

'আমি জানি না। বলেনি।'

'এই বয়সে হোটেলে ঢুকেছে। ভাবো। ভেতরে ভেতরে কত বড় ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠেছে! উঃ। কখন আসবে কিছু বলে গেছে?'

'না।' সুনেত্রা বলল, 'শুধু বলেছে মেয়েটাকে সাহায্য করতে।'

'সাহায্য করতে? আমরা কী সাহায্য করব? যাদের মেয়ে তারা করবে। মেয়েটার বাবা-মা জানে?'

'আমি কিছু জানি না। বললাম তো কথাটা শুনে এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম যে—! তা ছাড়া বলেই ও সুইমিং-এ চলে গিয়েছিল।'

'সুইমিং? আমি ক্লাবে ফোন করছি।'

'দাঁড়াও। ও তো ব্যাপারটা নাও বলতে পারত।'

'না বলে উপায় নেই। বিয়ে করে খাওয়াতে হলে বাপের হোটেলে বউকে নিয়ে আসতে হবে। অতএব বলতে বাধ্য। অতএব ওই উনিশ বছরের ছেলের বিয়ে দাও। বাকি জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাক।'

'বিয়ে ছাড়া কি অন্য কোনও উপায় নেই?'

'অন্য উপায়? অ। সেটার জন্যে তোমাকে বলার কি দরকার? নিজেরা যখন অতটা এগিয়েছে তখন বাকিটাও পারবে। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে এখন ওসবের ব্যবস্থা আছে।' বিরক্তিতে স্থির হতে পারছিল না ইন্দ্রজিৎ।

'নিশ্চয়ই সাহস পায়নি। পেলে বলত না, আমরা জানতেও পারতাম না। তুমি ওকে ক্রিমিন্যাল বলছ, পুরোপুরি তাই হলে আমাদের জানাত না।'

সুনেত্রার বক্তব্য অস্বীকার করতে পারল না ইন্দ্রজিৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মেয়েটা ওর সঙ্গে পড়ে। তার মানে সমান বয়স। বড়ও হতে পারে। না হলেও সমবয়সি ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি ম্যাচিয়োর্ড হয়। ওই মেয়েটা ইন্টেনশনালি করেনি তো?'

সুনেত্রা উঠে দাঁড়াল, 'তোমার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে!'

ছেলে ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পরে। স্নান সেরে ঝকঝকে হয়ে। ড্রইং রুমে ঢুকে দেখল বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কপালে ভাঁজ পড়ল তার, 'কিছু বলবে?'

ইন্দ্রজিৎ হতভম্ব হয়ে গেল। এতবড় একটা কান্ড করার পর এই গলায় প্রশ্নটা করে কি করে? এইসময় সুনেত্রা ঘরে ঢুকল, 'বোস, কথা আছে।'

ছেলে বলল, 'তাড়াতাড়ি বলো, কুইজটা শুনতে হবে।'

সুনেত্রার গলার স্বর বদলাল, 'তোমাকে এখন এখানেই বসতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ছেলে, ইন্দ্রজিতের উলটো দিকে।

'তুমি যা বলে গেলে সেটা সত্যি?' সুনেত্রা জিজ্ঞেস করল।

'বাঃ, মিথ্যে বলব কেন?'

'তো-তোর লজ্জা করছে না এইভাবে কথা বলতে। ইউ-ইউ-!' ইন্দ্রজিতের কথা

জড়িয়ে গেল। সুনেত্রা বলল, প্লিজ, আমাকে কথা বলতে দাও।'

ছেলে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না। মিথ্যে কথা বলব কেন! বলে আমি কি খুব অন্যায় করেছি। বাবা এত এক্সাইটেড হয়ে পড়েছে কেন?'

সুনেত্রা হাত তুলল, 'তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না কাজটা অন্যায় হয়েছে?'

'ওয়েল, এখন মনে হচ্ছে।' ছেলে মাথা নাড়ল, 'বাট উই নেভার থট অফ ইট। টিলা এখন এতটা আপসেট যে মনে হচ্ছে অন্যায় হয়েছে।'

'ওর বাবা-মা জানে?' সুনেত্রা প্রশ্ন করল।

'ওঃ, নো। জানলে ওর বাবা ওকে কেটে ফেলবে।'

'ফেলাই উচিত। শুধু ওকে নয়, তোমাকেও।' ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করল।

সুনেত্রা বলল, 'প্লিজ!' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'টিলা ওর মাকে বলছে না কেন?'

'মায়ের কোনো ভয়েস নেই। শুনলেই বাবাকে বলে দেবেন।'

'কিন্তু এটা তো বেশিদিন গোপন করে রাখা যাবে না।'

'জানি! আমি অলরেডি স্টাডি করেছি। তাই তো তোমাকে সাহায্য করতে বললাম।'

'কিন্তু আমরা কী ভাবে সাহায্য করব? যাদের মেয়ে তারা যদি না করে—!'

সুনেত্রার কথার পরেই প্রশ্ন করল ইন্দ্রজিৎ, 'কোথায় গিয়েছিলি? কোন্ হোটেলে?'

'হোটেলে? হোটেলে যাব কেন?' অবাক হল ছেলে।

হতাশ চোখে ইন্দ্রজিৎ সুনেত্রার দিকে তাকাল।

'ব্যাপারটা কি করে হল তোর বাবা জানতে চাইছে।'

'তাই বলো। সুভদ্রদের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। জাস্ট আড্ডা মারতে। সুভদ্রর বাবা-মা বাড়িতে ছিল না। ওরও কোথাও যাওয়ার দরকার ছিল। আমাদের বলেছিল ঘণ্টাখানেক বাড়ি পাহারা দিতে। ওয়েল, হঠাৎই, বিশ্বাস করো, কোনও প্ল্যান ছিল না। জাস্ট হ্যাপেন্ড।'

'বাড়িতে চাকরবাকর ছিল না?' ইন্দ্রজিতের গলা ফ্যাসফেসে শোনালো।

'দোতলায় না ডাকলে ওরা ওঠে না।'

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল, 'শোনো, তোমার এখানে থেকে পড়ার দরকার নেই। ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, দিল্লি যেখানে হোক চলে যাও পড়তে। তোমার এখানে থাকা চলবে না।'

'বাঃ। আমি এখন ওসব জায়গায় অ্যাডমিশন পাব? কবে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি চলে গেলেই টিলার প্রব্লেম সল্‌ভ হবে?'

'সেটা টিলার প্রবলেম।'

'না। আমাদেরও। আমারও।' ছেলে উঠে দাঁড়াল।

সুনেত্রা কথা বলল, 'ঠিক আছে, আমি টিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে এখানে

আসতে বল।'

সোমবার বিকেলে যখন ছেলের সঙ্গে টিলা বাড়িতে এল তখন ইন্দ্রজিৎ অফিসে। এক নজরেই সুনেত্রা বুঝতে পারল মেয়েটার মুখ শুকনো। বসতে বলে কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এমন বোকামি করলে কেন?'

টিলা বাবির দিকে তাকাল, কাঁধ ঝাঁকাল।

'কটা মাস মিস করেছ?'

'একটা।'

'এটা অন্য কারণেও হতে পারে।'

মাথা নাড়ল টিলা, 'না। আমি ইউরিন পরীক্ষা করিয়েছি।'

'সে কি? তুমি নিজে প্যাথলজিতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। অন্য নাম বলেছিলাম।'

'তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে এতবড় ভুল করতে পারে ভাবা যায় না।'

'ওর একার দোষ নেই মা। ইনফ্যাক্ট ওর ইচ্ছে ছিল না। আমি ইনসিস্ট করলাম বলেই।' বাবি বলল।

ছেলের দিকে তাকাল সুনেত্রা। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলাতে পারল সে। এরা কি নির্লজ্জ না যা বলছে তার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না?'

টিলার দিকে তাকাল, সে, 'তোমার মাকে বলছ না কেন?'

'আমার মায়ের কোনও পার্সোনালিটি নেই। ওঁকে বললেই বাবা জানবে। বাবা এটাকে কিছুতেই মেনে নেবে না।' টিলা বলল।

'কী করবেন?'

'আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

'নিজের একমাত্র মেয়েকে কেউ বাড়ি থেকে বের করে দেয় না।'

'আপনি জানেন না আন্টি, বাবা পারেন।'

'তা হলে তো • ই ব্যাপারটাকে আইনসঙ্গত করতে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়।' অন্যমনস্ক গলায় বলল সুনেত্রা।

'ইম্পসিবল।' মাথা ঝাঁকালো টিলা।

'মানে?'

'আপনি কি বিয়ের কথা ভাবছেন?' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল টিলা।

'এটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি না। কী আশ্চর্য! বিয়ে করব কেন?'

অবাক হয়ে গেল সুনেত্রা, 'মানে?' তোমরা, ভালোবাসো, অথচ—।'

'না তো। ভালোবাসি কে বলল?' উই আর নট ইন লাভ। কিরে, বল না আমি

যা বলছি ঠিক কি না!' টিলা বাবির দিকে তাকাল।

'ঠিক।' বাবি মাথা নাড়ল।

হতভম্ব হয়ে গেল সুনেত্রা, 'সে কি?'

টিলা বলল, 'ওকে দেখে কখনই মনে হয়নি ভালোবাসব। এইরকম, কোনও চিন্তা মাথাতেই আসেনি।' টিলার গলায় জোরালো প্রতিবাদ।

অসহায় চোখে ওদের দেখল সুনেত্রা। তারপর বলল, 'তুমি তো যথেষ্ট বড় হয়ে গেছ। সমস্যার সমাধান নিজেই করে নাও।'

চোখ বন্ধ করল টিলা, 'আমার ভয় লাগছে আন্টি।'

'আশ্চর্য! অতটা এগোতে পেরেছ যখন তখন এটাও পারবে।' সুনেত্রা মাথা নাড়ল।

টিলা বাবির দিকে তাকাল। বাবি বলল, 'মা, প্লিজ! ইউ ডোন্ট নো এনি প্লেস। যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়—।'

'তুমি কি চাও তোমার মা-বাবাকে না জানিয়ে তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাব আমি? এটা কত বড় অন্যায় জানো?' সুনেত্রা রেগে গিয়ে প্রশ্ন করল টিলাকে।

'কেন? অন্যায় কেন? আমি এখন অ্যাডাল্ট। আমার সব কাজের জন্যে মা-বাবাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, না দিলে অন্যায় হবে কেন?' টিলা বলল।

'তোমাদের বোঝানো শিবের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আমি ভাবি। কিন্তু যদি তাই করি তা হলে একটা কন্ডিশনে করব!'

'বলুন!' টিলা তাকাল।

'তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

'সম্পর্ক মানে?' বাবি জিজ্ঞাসা করল।

'তোমরা আর কখনও পরস্পরকে মিট করবে না।'

'বাঃ কলেজে গেলেই তো দেখা হবে।'

'সেটা হোক। কিন্তু ক্লাসের বাইরে কথা বলবে না।'

টিলা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, নো প্রবলেম অ্যান্টি।

কথাগুলো শোনার পর ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছ না যে?'

এখন সবে সন্ধে পেরিয়েছে। অফিস থেকে ফিরে সদ্য শেষ করা চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এদের কেউ বুঝতে পারবে না।'

বোঝাবুঝি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। মেয়েটার তো সর্বনাশ হবে।'

'আমাদের কি দায়িত্ব আছে?' ইন্দ্রজিৎ তাকাল।

'আছে। যদি উলটোপালটা জায়গায় গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে খারাপ কিছু হয়ে যায় তা হলে তো পুলিশ তোমার ছেলেকে ধরবে।' সুনেত্রা বলল।

'আমার ছেলে বোলো না।' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'আমি ওর ব্যবস্থা করেছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'ওকে এখানে রাখব না। চেন্নাইতে পাঠিয়ে দেব। ওখানে সেসন দেরিতে আরম্ভ হয়। কম্পিউটার ওখানেও শিখতে পারবে।' ইন্দ্রজিৎ বলল।

'তুমি পাগল হয়ে গেলে? যে ছেলে জয়েন্ট দিয়ে যাদবপুরে সুযোগ পেয়েছে তাকে পাঠাবে একটা কম্পিউটার স্কুলে পড়তে?' সুনেত্রা আঁতকে উঠল।

'ওর ওই ট্রিটমেন্ট দরকার।' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'ভালোবাসাবাসি নেই অথচ ওটা হয়ে গেল! এতো পশুদের মধ্যে হয়।'

'আমার কিন্তু মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে।'

'মানে?'

'একটা মেয়ে এমন সমস্যায় পড়েও সত্যি কথাটা বলছে এটা কজন পারে? ও বাবিকে ভালোবাসে না, বাবিও না। কিন্তু এখন তো বলতেই পারত ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে হবে বাবিকে। সেটা তো বলেনি।' সুনেত্রা বলল।

'হুম!'

'শোনো, ডক্টর চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলব?'

'কী বলব?'

'একটা ব্যবস্থা করে দিতে—।'

'চমৎকার বুদ্ধি! ছেলে একটা কাণ্ড করে ফেলেছে অতএব আপনি মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। এই বলবে?'

'তুমি আমার সব কথার খুঁত ধরো অথচ নিজে কোনও রাস্তা বলবে না।

'দ্যাখো, মেয়েটাকে নাবালিকা নয়। তুমি ওকে নিয়ে সোজা কোনও নার্সিংহোমে যেতে পারো। তোমার মেয়ে পরিচয় দিয়ে মুক্ত করিয়ে আনতে পারো। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? ওর মা-বাবা যদি জানতে পারেন তা হলে কী কৈফিয়ত দেবে?'

'ঠিকই! তা ছাড়া যদি নার্সিংহোমে খারাপ কিছু হয়ে যায় তা হলে তো হাতে হাতকড়া পড়বে।' শিউরে উঠল সুনেত্রা।

'আরও আছে। এই ঘটনাটা মেয়েটাকে ভবিষ্যতে বিপদে ফেললেও ফেলতে পারে। না না, ওকে বলো নিজের বাপমায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

সুনেত্রার কথাটা বলতে খারাপ লাগছিল। কিন্তু চোখকান বুজে পরের সকালে ছেলেকে জানিয়ে দিল।

দিন চারেক বাদে বাবি কলেজে কি সব অনুষ্ঠান আছে বলে সকাল সকাল বেরিয়ে যাওয়ার পরেই ফোনটা বাজল। সুনেত্রা ফোন ধরল।

'নমস্কার। আমি টিলার মা।'

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সুনেত্রার, 'ও হো। নমস্কার!'

'টিলা আপনাদের বাড়িতে পৌঁছেছে?'

'না, মানে—।'

'ওকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ও গেলে প্লিজ বলে দেবেন যাতে ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। নইলে ওর বাবা রাগারাগি করবেন।'

'আচ্ছা!'

'আপনাদের কথা শুনেছি, আলাপ হয়নি, একদিন আসুন না।'

'ঠিক আছে, বেশ তো—।'

রিসিভার নামিয়ে স্বস্তি পেল সুনেত্রা। ভদ্রমহিলা এখনও কিছু জানেন না। কিন্তু টিলার কি এ বাড়িতে আসার কথা আছে? কই, বাবি কিছু বলে যায়নি তো! কেন আসবে! কেন আসবে? যা বলার বাবিকেই বলে দেওয়া হয়েছে, নতুন কিছু তো বলার নেই। তারপরেই খেয়াল হল, বাবি গিয়েছে কলেজের অনুষ্ঠানে। সারাদিন হবে। নিশ্চয়ই টিলা সেখানে যাবে। হয়তো যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা বলে যেতে চায়। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও অজুহাত দিয়েছে এখানে আসার ব্যাপারে।

বিকেল তিনটে নাগাদ ফোন এল, 'মা, কী করছ?'

'কী করছি মানে? তুই কোথায়?'

'নার্সিংহোমে। এক্ষুনি চলে এসো। এটা থার্টি থ্রি বাই সি পার্ক সার্কাস স্ট্রিট। নার্সিংহোমের নাম সানফ্লাওয়ার—প্লিজ।'

'তুই নার্সিংহোমে কী করছিস? সুনেত্রা অবাক।

'টিলার জন্যে। এভরিথিং সেট্‌লড। কিন্তু তোমাকে আসতে হবে। মা, প্লিজ।'

এভরিথিং সেট্‌লড? তার মানে ওরা নিজেরা গিয়ে সব কিছু করিয়েছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল সুনেত্রার। কোনো মতে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন হল?'

'আজ সকালে। এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল, একটু ঘুমিয়েছে।'

'এখন?'

'কথা বলছে, তবে এখনও পুরো ফিট নয়।' হঠাৎ রাগ হয়ে গেল সুনেত্রার, 'আমি গিয়ে কী করব?'

'নার্সিংহোমে বলেছি রিলিজের সময় মা আসবে।'

'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।' টেলিফোন রেখে দিল সুনেত্রা। কয়েক মিনিট পর ভাবনাটা মাথায় এল। একবার ভাবল স্বামীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবে কী করা উচিত। এমন হতে পারে ওদের কাছে নার্সিংহোমের বিল মেটানোর মতো টাকা নেই। তা হলে তো বিরাট সমস্যায় পড়বে। মেয়েটার যে কিছু হয়নি সেটা জেনে অবশ্য ভালো লাগছে। কিন্তু বাড়িতে যখন ফিরবে তখন মায়ের চোখে ধরা পড়ে যাবে না? সুনেত্রারই কিরকম ভয় ভয় করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে। গাড়ি দুটো, কিন্তু ড্রাইভার একটা—যে ইন্দ্রজিতকে অফিসে নিয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে সুনেত্রা পৌঁছোলো নার্সিংহোমে গেটেই ছেলে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখতেই মুখ হাসিতে ভরে গেল। সুনেত্রা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'তিন নম্বর কেবিনে। চলো।' পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ছেলে।

টিলা শুয়েছিল, চোখ বন্ধ। সুনেত্রা ঢুকতেই চোখ খুলল। দেখে উঠে বসল চট করে। সুনেত্রা বাধা দিল, 'আরে, উঠছ কেন? শুয়ে থাকো।'

'না না। আই অ্যাম ওকে, ফাইন।'

'কিন্তু তোমার চোখে ঘুম আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ।'

এই সময় একজন নার্স ঢুকল, কেবিনে, 'ও কিছু নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কেটে যাবে। তারপর দেখবেন ঘুমোবে। কাল সকালে ওকে দেখে বুঝতেই পারবেন না।'

'আজই ছেড়ে দেবেন?' সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ও এখনই চলে যেতে পারে। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে না হয় থাকুক।'

নার্স চলে গেলে সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল, 'বিল কত হয়েছে?'

টিলা মাথা নাড়ল, 'সব পে করে দিয়েছি।'

'তোমার কাছে টাকা ছিল?'

বাবি বলল, 'ফিফটি ফিফটি দিয়েছি। এখন আমি বেগার।'

'তা হলে আমাকে ডাকলি কেন?'

'আন্টি, প্লিজ একটা অনুরোধ করব?' টিলা অনুনয় করল।

সুনেত্রা তাকাল, কথা বলল না।

'আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?'

'তোমাকে? কেন?'

'আপনি জাস্ট বলবেন দুপুরে আজেবাজে খেয়ে আমার পেটে গোলমাল হয়েছে। আপনার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। আপনি ওষুধ দিয়েছেন। এখন ভালো আছি। ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাব। তাই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'আমি এত মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'আমাকে বাঁচাতে। নইলে মা-বাবা ঠিক—।'

সুনেত্রা ভাবল। এমন তো হতেই পারে। টিলাকে তো সে নার্সিংহোমে নিয়ে আসেনি। ভেবে বলল, 'একটাই শর্ত, যা আগে বলেছি, তোমরা আর ক্লাসের বাইরে দেখা করবে না।'

'ডান।' বাবি বলে উঠল। টিলাও মাথা নাড়ল।

টিলার বাবা ছিলেন না। ওর মা ব্যস্ত হলেন মেয়েকে দেখে, 'কী হয়েছে?'

টিলা বলল, 'কিছু হয়নি। সুনেত্রা আন্টি।'

সুনেত্রা বলল, 'যাও রেস্ট নাও।' তারপর বলল, 'আজ সকালেই আপনার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হল, তখন ভাবিনি বিকেলে দেখা হবে। আসলে হয়েছে কি আপনার মেয়ে কলেজের অনুষ্ঠানে উলটোপালটা কিছু বোধহয় খেয়েছিল। আমার বাড়িতে এসে বমি করল। আমি ডাক্তারকে ফোন করে ওষুধ আনিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। এখন ভালো আছে। বললাম একা ছাড়ব না, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

'খুব ভালো করেছেন। এত করে বলেছি বাইরের খাবার খাবি না, কথা শোনে না।'

'ওকে এখন ঘুমোতে দিন, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে।' সুনেত্রা হাসল, 'আচ্ছা, চলি।'

'সেকি! আপনি প্রথম এলেন, একটু বসুন, চা খান।'

'না না। ওসব আর একদিন হবে। জরুরি কাজ আছে। আচ্ছা নমস্কার।' সুনেত্রা যেন পালিয়ে এল, এসে বাঁচল।

রাত্রে স্বামীকে ঘটনাটা বলতে গিয়েও পারল না সুনেত্রা। প্রতিক্রিয়া কি হবে কে জানে। কিন্তু ছেলের জন্যে এটুকু না করলে টিলার ক্ষতি হত, কথাটা ইন্দ্রজিৎ বুঝতে চাইবে না।

দিন সাতেক বাদে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'সামনের সোমবার তোমার ছেলেকে চেন্নাই পাঠাব। হ্যাঁ, মেয়েটার খবর কি?'

'ঠিক আছে।'

'তার মানে?'

'মুক্তি পেয়ে গেছে।'

'সেকি? ওর মা-বাবা হেল্প করলেন?'

'না, নিজেরাই।'

'মাই গড! তোমার ছেলে এতবড় তালেবর হয়ে গেছে যে মেয়েটাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে—। ওই বয়সে আমি কল্পনাই করতে পারতাম না। ওকে ডাকো। এখনই। কথা বলব।' ইন্দ্রজিৎকে হিংস্র দেখাল।

'এসব ব্যাপারে কথা না বললে নয়?'

'এসব ব্যাপারে কথা বলতে আমার ঘেন্না করবে। ওকে চেন্নাই-এর কথা বলব। প্রসপেক্টাস আনিয়েছি, দেব।'

সুনেত্রা অবাক হল। বাবি চেন্নাই-এর প্রস্তাব শুধু মেনেই নিল না, যাওয়ার জন্যে বেশ উৎসাহী হল। চেন্নাই-এর কলেজে কম্পিউটার নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে নাকি অনেক বেশি এক্সপোজার পাওয়া যাবে! সুনেত্রারও মনে হল, এই ভালো। প্রথম বয়সের ভুলটাকে ভুলে যেতে পারবে ওরা। নিত্য ওদের সমস্যায় জড়াতে হবে না তাকে।

কদিন থেকেই টেলিফোন ঘন ঘন বাজছে। চেন্নাই চলে যাবে বলে বন্ধুরা ফোন করে যাচ্ছে। ছেলে চেঁচিয়ে কথা বলছে। কেউ আপত্তি জানালে উড়িয়ে দিচ্ছে। একটু আগে যে টেলিফোনটা এল সেটা ধরে ছেলে কথা বলছিল হই হই করে, হঠাৎ গলা নেমে গেল। তারপর ছেলে এল সুনেত্রার কাছে, 'মা তোমার ফোন!'

'কে?'

ছেলে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রিসিভার তুলল সুনেত্রা, 'হেলো।'

'আন্টি! আমি টিলা।'

'ও। কি খবর? কেমন আছ?'

'আন্টি, আজ আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বলল ও এখান থেকে চলে যাচ্ছে চেন্নাই-তে। কেন?'

'বেটার এক্সপোজার পাবে, তাই বোধহয়।'

'কথাটা ও তো আমাকে জানাতে পারত।'

'আমি তো তোমাদের নিষেধ করেছিলাম।'

'কেন?'

'আশ্চর্য? তোমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসো না, মিছিমিছি কেন যোগাযোগ রাখবে? রাখলেই তো অতীতটা মনে পড়বে।'

'বাট আন্টি—!'

'তুমি কিছু বলবে?'

'আই হ্যাভ ডিসকভার্ড সামথিং।'

'কী সেটা?'

'আমি ওকে ভালোবাসি। রিয়েলি, বিশ্বাস করুন।'

'টিলা—।'

'হ্যাঁ আন্টি! ইটস লাইক এ আবিষ্কার!'

'তুমি কি বলছ?'

'আমি একদম ঠিক বলছি। কথাটা আমি ওকে বললাম। অদ্ভুত ব্যাপার, ও নাকি এটা ডিসকভার করেছে বলে চেন্নাই-এ যাওয়ার কথা আমাকে জানাতে পারেনি।'

'তুমি কি চাইছ ও চেন্নাই-তে না যাক?' সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল।

'নট দ্যাট। ভালো হলে ও যাক। কিন্তু আন্টি, আমি যদি মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করি, আপনার আপত্তি আছে?'

'না। নেই। তোমার ফোন পেলে খুশি হব।'

রিসিভার নামিয়ে ছেলের দিকে তাকাল সুনেত্রা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'টিলা কী বলল তুই বুঝতে পেরেছিস?'

মাথা নাড়ল ছেলে, 'ইটস নট আওয়ার ফল্ট, মা। হঠাৎ হয়ে গেল। আমি চেন্নাই চলে গেলে প্লিজ হেল্প হার। করবে তো?'

সাদা টিভি, রঙিন টিভি

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি এ বাড়িতে এসেছিল পনেরো বছর আগে। অ্যান্টেনা টাঙানো হয়েছিল, ছবি আসত ঝকঝকে। আশেপাশের বাড়ির লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ত সেই ছবি দেখতে। ওদের ছোট শোওয়ার ঘর ভিড়ে ঠাসা। বিরক্তি আসত কিন্তু কোথাও যেন গর্বও ছিল। এ যদি বলত, দিদি আজ উত্তমকুমারের সিনেমা দেখতে যাব তো ও বলত, আজ নাকি হেমন্ত টিভিতে গাইবে, শুনতে যাব কিন্তু, না বলতে পারবে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়ত, 'কি যে বলো, যখন ইচ্ছে আসবে, না বলব কেন?'

প্রতুল রেলে চাকরি করে। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তখনও ঘরে ভিড় থাকলে এপাশ-ওপাশ ঘুরতে যেত। কিন্তু বিরক্ত হত না। হাওড়া থেকে এতটা ট্রেনে আসার পর সাইকেল চালিয়ে গ্রামে ফেরা। ফিরে ঘরে লোকের ভিড় দেখলে রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষটার হেলদোল বড় কম।

আস্তে আস্তে ভিড় কমছিল। এবাড়ি-ওবাড়িতে টিভি এসে যাচ্ছিল ইনস্টলমেন্টে। একা একাই দেখতে হয় সন্ধ্যাকে। তারপর শুনল বীণাদির বাড়িতে কালার টিভি এসেছে। সবাই যাচ্ছে সেখানে। কৌতূহলী সন্ধ্যা সেখানে পৌঁছে গেল। টিভির ছবি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী রঙ আর তার কী বাহার! সেই ছবি দেখে আসার পর নিজের ঘরের সাদা-কালোর দিকে তাঁকাতেই ইচ্ছে করছিল না। রাত্রে প্রতুল বাড়ি ফিরতে প্রথম সুযোগেই সন্ধ্যা কথাটা বলল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলো নিভিয়ে প্রতুল তখন টানটান। যে কোনো মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়বে। লোকটা টিভি দ্যাখে না, প্রেম-ট্রেম শরীরে নেই। কথাটা শুনে বলল, 'উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা। অত টাকা কোথায় পাব?'

'বীণাদি কি করে কিনতে পারল?'

'বীণাদি! ও, ওর কথা বোলো না। যতীনদা মারা যাওয়ায় চাকরিটা পেয়েছে। যতীনদার যা কিছু সরকারের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা তা তো পেয়েছেই আবার নিজেও মাইনে পাচ্ছে। যতীনদা মরে যাওয়ায় ওদের ফ্যামিলি ইনকাম বেড়ে গেছে।'

'তুমি ইনস্টলমেন্টে কেনো!'

'শোধ করতে হবে না?'

'আমি কোনো কথা শুনব না। ওই সাদা-কালো টিভি আমি দেখব না। আজ পর্যন্ত কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি। না গয়না, না শাড়ি। মুখ ফুটে একটা কালার টিভি চাইলাম, বেশ, ঠিক আছে।'

এই যে অভিমান করে কথাগুলো বলা, টিভির নাটক সিনেমায় কোনো নায়িকা যদি এভাবে বলত তাহলে নায়ক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু সন্ধ্যার নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। প্রতুল ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার খুব রাগ হলো। সে বিছানা থেকে নেমে একটা কাপড় দিয়ে টিভিটা ঢেকে দিল।

কয়েকটা দিন খুব মন খারাপ নিয়ে কাটল সন্ধ্যার। টিভির ওপর থেকে ওই কাপড়ের আড়ালটাকে আর সে সরায়নি। ঘরের লোকটা এমন কানা যে একবারও জিজ্ঞাসা করেনি টিভিটা ঢাকা কেন? সন্ধ্যা ভাবতে বসল প্রতুল তাকে কি কি দিয়েছে? হ্যাঁ, খাওয়া পরা থাকার কোনো অভাব নেই। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফেরে বলে মাসের প্রথমে সব কেনাকাটার পরেও একশ টাকা ওর হাতে দেয়। সেগুলো জমিয়ে জমিয়ে এখন প্রায় চার হাজার টাকা হয়ে গেছে সন্ধ্যার। কিন্তু কালার টিভির দাম তো প্রায় আট-নয় হাজার। রেলে চাকরি করে অথচ আজ পর্যন্ত একবার পুরীতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোথাও নিয়ে যায়নি প্রতুল। তাও পুরী যাওয়ার সময় শাশুড়ি সঙ্গে ছিল। শাশুড়ি মরার পর কোথাও যাওয়ার কথা বললেই যেন গায়ে জ্বর আসত প্রতুলের। হ্যাঁ, লোকটার মনে একটা দুঃখ আছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তিন-চার বছরেও যখন হল না তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যাকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন, সন্ধ্যার কোনো দোষ নেই, সে ঠিকই আছে। অতএব প্রতুলকে পরীক্ষা দিতে হল। দেখা গেল দোষটা ওরই। ওষুধ খেয়েও সেই দোষ গেল না। খুব ভেঙে পড়েছিল প্রতুল। তখন এই সন্ধ্যাই তো অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল। সেটা এখন কাটিয়ে উঠেছে। তাহলে এই দাঁড়াল, স্বামীর কাছ থেকে সে সন্তান, গহনা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিছুই পায়নি। এমনকি একটা কালার টিভিও নয়।

সেদিন রাত্রে নয়, বিকেল হওয়ার আগেই ফিরল প্রতুল। তবে সাইকেলে নয়, সাইকেল ভ্যানে শুয়ে। সঙ্গে ওর দুই তরুণ সহকর্মী। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে বিছানায় শোওয়ানো হল। সহকর্মীদের পরিচয় তারাই দিল, শ্যামল আর তরুণ। শ্যামল বলল, 'কোনো ভয় নেই বউদি। পাড়ার ডাক্তার দেখান। তেমন বুঝলে একটু খবর দেবেন। কলকাতা থেকে চলে আসব। আমাদের রেলের হাসপাতাল আছে, ওঁকে ভর্তি করিয়ে দেব। আমাদের কথা সবাই শোনে।'

তরুণ বলল, 'প্রতুলদার গ্রামে এসে যে আপনার মতো একজনকে বউদি হিসেবে পাব ভাবতেই পারিনি। প্রতুলদাও কখনও বলেনি আপনি এত সুন্দরী।'

গালে রক্ত জমেছিল সন্ধ্যার। বলবে কেন? ওরা টেলিফোনের নম্বর দিয়ে চলে যাওয়ার পর ভেবেছিল সে। বউ-এর প্রশংসা করতে তো প্রাণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু সে কি এমন সুন্দরী যে কলকাতার মানুষের প্রশংসা পাবে? কিন্তু এসব নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ ছিল না। মানুষটার কপালে জলপট্টি দিতে হচ্ছিল বারংবার। ডাক্তার এল। দেখে শুনে বলল, টাইফয়েড হতে পারে। রক্তটা পরীক্ষা করানো দরকার।

অফিসে যাওয়ার আগে বীণাদি এল। পঁয়তাল্লিশ বছরে বিধবা কিন্তু দেখে কে

বলবে? পরনে রঙিন শাড়ি, হাতে ঘড়ি। দেখে-শুনে বীণাদি বলল, 'নাঃ, এই রোগীকে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। তুমি হাসপাতালে দাও।'

'কোন্ হাসপাতালে?' এবার সত্যি ভয় পেল সন্ধ্যা।

'এখানকার হাসপাতালে দিলে ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে ঠিক আছে, না এলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে রেলের হাসপাতালে দাও।'

'আমি তো কিছু চিনি না দিদি।'

'ওর সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের কাউকে চেনো?'

'হ্যাঁ। যারা নিয়ে এসেছিল।' নামলেখা টেলিফোন নাম্বার দিল সে বীণাকে।

বীণা বলল, 'আমি কলকাতায় গিয়েই ফোন করে দিচ্ছি।'

বিকেল নাগাদ প্রতুলের অবস্থা আরও খারাপ হল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। জ্বর বীভৎস। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল সন্ধ্যা। প্রতিবেশী মহিলারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল, বলছিল ভগবানকে ডাকতে। তখনই গাড়ি এল গ্রামে। বাড়ির সামনে থামতে দেখা গেল প্রতুলের সহকর্মীরা এসেছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। প্রতিবেশীরা বলল, 'দ্যাখো, ভগবানকে ডাকলে তিনিই সমাধান করে দেন।'

দেখেশুনে শ্যামল বলল, 'কোনো চিন্তা নেই। চলুন কলকাতায়।'

ধরাধরি করে প্রতুলকে গাড়ির পেছনের আসনে শোওয়ানো হল। পায়ের কাছে কোনোমতে বসল সন্ধ্যা। শ্যামলরা ড্রাইভারের পাশে। বাড়িঘর প্রতিবেশীর জিম্মায় রেখে স্বামীকে নিয়ে রওনা হল সন্ধ্যা।

যেতে যেতে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কতদূর পড়েছেন বউদি?'

সন্ধ্যা বলল, 'ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল।'

'বাঃ গুড।' শ্যামল মাথা নাড়ল।

তরুণ বলল, 'আপনাকে দেখার পর অফিসে গিয়ে আলোচনা করছিলাম। তা আমাদের অফিসে এখন অনেক মেয়েছেলে কাজ করে। বেশির ভাগই বিধবা। স্বামী মরে যাওয়ায় কাজ পেয়েছে। কিন্তু কি বলব বউদি, যাদের বয়স পঞ্চাশ সে পঁয়ত্রিশ বলে ঢুকে পড়েছে।'

'কি করে?' সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

'ফলস্ এফিডেভিট করে। অরিজিন্যাল বার্থ সার্টিফিকেট নেই তো। ফলে আমাদের অফিসে বুড়িদের সংখ্যা বাড়ছে।'

সন্ধ্যার মনে পড়ল বীণাদির কথা। যতই সাজুক বীণাদি তো বুড়িই।

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল প্রতুল। যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। রাত বাড়ছে। শ্যামল আর তরুণ খুব ছোটাছুটি করছে। ওদের জন্যে খুব মায়া লাগছিল সন্ধ্যার। ওরা না থাকলে যে কি হত।

একসময় সব সুনসান হয়ে যেতে ভয় ভয় করছিল সন্ধ্যার। এইসময় ওরা ফিরল। তরুণ বলল, 'বউদি, মন শক্ত করুন।'

'মানে?' কেঁদে উঠল সন্ধ্যা।

'আহা কাঁদবেন না। প্রতুলদা মারা যাবেন না।'

'তাহলে?'

'জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন। বিছানায় শুয়ে বাকি জীবন কাটবে। কথা বলতে পারবেন না। বিছানাতেই সব কিছু। বুঝতেই পারছেন। প্রাণহানির ভয় কেটে গেছে।'

'তাহলে?'

'সেটাই। চাকরি চলে যাবে। কুড়ি বছরও চাকরি হয়নি, টাকা-পয়সা কি পাবেন বুঝতেই পারছেন। ধরে নিন ব্যাঙ্কে রাখলে মাইনে যা উনি পাচ্ছেন তার সিকিভাগ হাতে পাবেন। তাতে ওঁর চিকিৎসা, আপনাদের খরচ কি করে যে হবে!'

'আমাকে চাকরি দেবে না?'

'কি বলব বউদি, আগে দিত। এখন খুব কড়াকড়ি হয়েছে। মারা না গেলে দিতে চায় না। তাও সব বিধবারা পায় না। খুঁটির জোর থাকা চাই। তা নিয়ে ভাববেন না। আমরা আছি। বুড়িদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, আপনি এলে তবু চোখের আরাম হবে।' শ্যামল বলল।

'মানে?' ফ্যাসফ্যাস করে বলল সন্ধ্যা।

'বুঝতেই পারছেন এই অবস্থায় দাদার বেঁচে থাকা মানে ওঁর যন্ত্রণা বাড়ানো। আপনারও প্রচণ্ড আর্থিক, শারীরিক কষ্ট।'

'আমি কি করব বুঝতে পারছি না।' হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সন্ধ্যা।

'কাঁদবেন না বউদি। কাঁদলে মেয়েদের খুব খারাপ দেখায়।' বলল তরুণ।

মুখ বন্ধ করল সন্ধ্যা।

'মুশকিল হল এসব ক্ষেত্রে অন্তত হাজার দশেক লাগে ডেথ সার্টিফিকেটের জন্যে। ওটাই তো আসল। একটা ছবি তোলাতে হবে। শ্মশানের ব্যাপারটা তো আছেই। তারপর মাসখানেক, ব্যস, আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।' শ্যামল বলল।

'এমনি হয়তো শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে স্বীকার করতেই হবে এটাই সবচেয়ে ভালো। জীবন বড় নির্মম বউদি।' তরুণ বলল, 'আপনি রাজি হলে দশ হাজার টাকা জোগাড় করতে যেতে হবে এখনই।'

রঙিন টিভির দাম নাকি নয় হাজার। যা কেনার সামর্থ্য ছিল না প্রতুলের। তার থেকে এক হাজার বেশি দিলে সন্ধ্যা একটা চাকরি পাবে, স্বামীর যা কিছু অফিস থেকে প্রাপ্য সব পাবে। সব যদি পোস্ট অফিসে রাখে তাহলে তার সুদ আর মাইনে যোগ করলে স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার হবে। তখন একটা রঙিন টিভি কিনতে কোনো চিন্তাই করতে হবে না।

সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তারপর মাথা নাড়ল।

শ্যামল বলল, 'কি হল বউদি?'

সন্ধ্যা দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি কখনই বিধবা হব না। কিছুতেই না।'

দায়মুক্ত

কয়েকদিন যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠলেন রজতাভ। কাঁহাতক চব্বিশ ঘন্টা বাড়িতে বসে থাকা যায়! সেই ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙার পর নিজে চা তৈরি করেন। কলকাতায় থাকলে শিখাকে ডেকে চায়ের কাপ ওর মাথার পাশে রাখতেন। শিখা উঠে পড়ত। এখানে শিখার ঘুম ভাঙে ঠিক সাতটায়। উঠেই ছেলের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ছোটে। রঙ্গন অফিসে বের হয় ঠিক আটটায়। দু'মাস আগে বউমাও যেতেন। মাস খানেক আগে বাচ্চা হওয়ার পর তিনি স্বাভাবিক কারণেই দেরিতে বিছানা ছাড়েন।

বউমার সন্তান হবে শুনে শিখা চলে এসেছিল মাস দুয়েক আগে। আসার সময় রজতাভকে সঙ্গে চেয়েছিল। রজতাভ আসেননি। একা একা কি করে কলকাতা থেকে কলম্বাসে আসবেন এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিখার ঘুম হয়নি। কথাটা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছের মূল্য রজতাভ কোনোদিন দেননি। আমেরিকা থেকে রঙ্গন অভয় দিয়েছিল। সে এয়ারপোর্টে থাকবে। মায়ের কোনো চিন্তা নেই। নাতি হয়েছে খবর পেয়েও কিছুদিন টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছিলেন রজতাভ। আমেরিকা তাঁর একদম ভালো লাগে না, কিরকম বন্দি বন্দি মনে হয় নিজেকে। তার ওপর মাসটা এখন জানুয়ারি। বাইরে মাইনাস আট।

সেই ভোর থেকেই জানলার পাশে গিয়ে মাঝে-মাঝে দাঁড়ান রজতাভ। বাইরে বরফ আর বরফ। মাঝে-মাঝে বরফ-সরানো গাড়ি রাস্তা ঠিক করে যাচ্ছে। আর ছুটছে শোঁ শোঁ গাড়ি, ভাবখানা এখন যেন থামলেই জমে যাবে। অন্য সময় বাইরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন, চাই কি মলেও পৌঁছে যেতেন। ছুটির দিন বা অফিস ফেরত রঙ্গন তাঁকে নিয়ে ঘুরতে বের হত। এর বাড়ি ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে যেত। এখন তো বাইরে হাঁটার কোনো সুযোগই নেই। একহাঁটু বরফে দু'মিনিট থাকলেই জমে যাবেন। অফিসের পর রঙ্গন বাড়ি ফিরে অবশ্য বলে, 'যাবে নাকি কোথাও?' কোথায় যাবেন? গেলে তো গাড়ির বাইরে পা দেওয়া যাবে না। ছেলের সঙ্গে কত আর বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল শপে ঘুরে বেড়াবেন। অতএব সময় কাটছে টিভি দেখে।

শিখার এসব সমস্যা নেই। বউমার শরীর দুর্বল বলে সে-ই সংসার সামলাচ্ছে। কত আধুনিক ব্যবস্থা এখানে, যা ইচ্ছে রান্না করা যায়। তারপর এক মাসের বাচ্চাটা তো আছেই। তাকে নিয়ে কাজের বাইরের সময়টায় পুতুলখেলা চলে তার। কলকাতায় থাকলে প্রায়ই তাঁদের বাক্‌যুদ্ধ হয়। এখানে সেটা হচ্ছে না।

রঙ্গন মদ্যপান করে না। কিন্তু বাবার জন্যে স্কচ এনে দেয়। নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় দুপেগ হুইস্কি খান তিনি। এই অভ্যেসটা হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের পর যখন তিনি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিলেন।

ছেলের দিকে তাকালে তাঁর খুব ভালো লাগে। পড়াশুনায় তো ভালোই ছিল। তরতর করে প্রতিটি পরীক্ষায় আশির ওপর নম্বর পেয়ে আমেরিকায় চলে এসে দিব্যি চাকরি করছে। এর মধ্যে তিনবার বাড়ি বদলেছে। প্রতিবারই বাড়ির সাইজ বেড়েছে। দেশে থাকলে প্রতি সপ্তাহে দু'বার ফোন পান ছেলের। বউমাটিও মন্দ নয়।

কিন্তু তাই বলে কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বরফের মধ্যে গৃহবন্দি হয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

ছেলে বলল, 'তুমি লস এঞ্জেলেসে চলে যাও। ওখানে বরফ তো দূরের কথা ঠান্ডাও বেশি পড়ে না। আমার বন্ধু সুব্রতকে বলেছি। ও খুব আগ্রহী। অনেক জায়গা ওর বাড়িতে। কয়েকদিন ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে এসো।'

'না না, একি হয়? চিনি না জানি না!' রজতাভ আপত্তি জানালেন।

'সুব্রতকে দেখলে একথা মনে হবে না। ও খুশি হবে তোমাকে পেলে!'

কিন্তু রজতাভ রাজি হলেন না।

শনিবার বিকেলে এই বাড়িটায় যেন উৎসব শুরু হয়। বউমা এখন শরীরের কারণে পারছেন না কিন্তু তাঁর ভূমিকা শিখা নিচ্ছে। আড়াইটে নাগাদ মা-ছেলে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ ঠেলে। ফিরে আসে পাঁচটায়। রিমোট টিপে গ্যারাজের দরজা খুলে রঙ্গন গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ির উত্তাপ গ্যারেজেও থাকে। তারপর গাড়ির ডিকি থেকে প্যাকেটের পর প্যাকেট নামায় ওরা। রজতাভ সোফায় বসে দেখেন।

প্যাকেট খুলে জিনিসগুলো বের করতে করতে শিখার মুখে আলো ফোটে, 'কি দারুণ বেগুন, তোদের এখানে কত টাটকা আর বড় সবজি, আমাদের ওখানে চোখেই দেখিনি! কই মাছটা দ্যাখা তোর বাবাকে, দশ ইঞ্চি লম্বা। ইলিশের সময় বাজার থেকে এক কেজির বেশি নিয়ে আসতে পারে না। অথচ এখানকার বাংলাদেশিদের দোকানে আড়াইকেজি ইলিশের ছড়াছড়ি। তোর এখানে না এলে এসবের দেখাই পেতাম না।'

শুনতে শুনতে মুখ না খুলে পারেন না রজতাভ, 'বেশ তো, বাকি জীবনটা এখানেই থেকে যাও। নয়ন ভরে দেখে যেতে পারবে।'

ছেলে মাথা নাড়ল, 'নো মোর বাবা।'

শিখা বলল, 'দেখলি! সবসময় আমাকে না খোঁচালে ওঁর ভাত হজম হয় না।'

হ্যাঁ। খাওয়ার সুখ আছে এখানে। এত বড় লবস্টার কখনও চোখেই দ্যাখেনি রজতাভ। গাড়ি-বাড়ির আরাম আছে। কিন্তু জীবন? জীবন কোথায়? সেই সকালে বেরিয়ে যায় ছেলেটা, ফেরে সন্ধের মুখে। বউমাও তাই। তখন কোনোমতে রাতের

খাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এগিয়ে না দিলে ভোরে উঠবে কি করে?

আর একটা ব্যাপার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে রজতাভের কাছে। আড্ডা নেই, হইচই নেই, মাইনের চেক থেকে বাড়ি-গাড়ির ইনস্টলমেন্ট দিয়ে যাও। তাই প্রত্যেক শুক্র বা শনিবারে এর বাড়ি ওর বাড়িতে কথা বলার জন্যে জমায়েত। ক্যালেন্ডারে ছ'মাসের যত শুক্র এবং শনিবারে সব লেখা হয়ে আছে। কবে কার বাড়িতে যেতে হবে। যেহেতু বউমার বাচ্চা হয়েছে তাই আগামী পাঁচ মাস এ বাড়িতে জমায়েত হতে পারে না।

রঙ্গন জোর করে তাঁকে নিয়ে যেত, শিখা খুশি হয়েই যেত। রজতাভ লক্ষ করেছেন এই পার্টিগুলোর চেহারা। যাঁর বাড়িতেই পার্টি হোক অতিথিদের সংখ্যা প্রায় এক আর একই মুখ সর্বত্র। কারণ একটাই, এই বাঙালিরাই শহরের বাসিন্দা। যদিও প্রচুর বাংলাদেশি এই শহরে থাকেন কিন্তু কলকাতার বাঙালিরা তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে পছন্দ করেন না। এরকম পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে সত্তর-আশি মাইল গাড়ি চালিয়েও লোকে আসে। সাতটার মধ্যে জমায়েত শুরু হয়ে যায়। গৃহকর্তা পানীয় অফার করেন। অর্ধপেগ হুইস্কি অথবা কোমল পানীয়। সেটা শেষ হওয়ার আগেই গৃহকর্ত্রী সবিনয়ে জানান ডিনার পরিবেশিত হয়েছে। খেতে খেতে গল্প চলে। একই গল্প। শিখা দুটো পার্টিতে এক পোশাক পরে যায় না। গহনাও আলাদা। না, এটা সম্রাট থেকে কেনা। না-না, নিউমার্কেট কেন, দক্ষিণাপণেই সব পাওয়া যায়। কথাবার্তা এই একই খাতে বয়ে যায়। বাড়ি ফেরা সাড়ে আটটায়। রজতাভ বিরক্ত হয়ে পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। শিখা এসে গাল ফুলিয়ে বলল, 'কি করছ, তুমি না গেলে সবাই প্রশ্ন করবে। কি জবাব দেবে খোকা?'

'যা হোক কিছু। বলবে বউমার শরীর খারাপ, তাই বাড়িতে আছি।'

'আশ্চর্য! বউমার শরীর খারাপ হলে আমার বাড়িতে থাকার কথা।'

'তাহলে বলে দিয়ো পেট খারাপ হয়েছে আমার।'

'তার মানে ছেলের সম্মান রাখতে তুমি যাবে না?'

'আমি না গেলে ওর সম্মান যদি চলে যায় তাহলে যাওয়াই ভালো।'

রজতাভ ছেলেকে ডাকলেন। জানিয়ে দিলেন কেন তিনি যাচ্ছেন না। রঙ্গন হাসল, 'সত্যি, একদম রোবটের মতো ব্যাপার। আমারই যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু এখানে সম্পর্ক রাখা দরকার বলে যাই। তোমার ভালো না লাগলে যাবে না। আমি যাহোক বলে ম্যানেজ করে নেব।' রঙ্গন চলে গেল।

শিখা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখল, 'বউমার জন্যে খোকা একা যায়। কিন্তু আর সবাই জোড়ে আসে। তুমি এখানে থাকতে আমি একা যাচ্ছি, এতে যে সম্মান ধুলোয় লুটোবে তা ভেবেছ?'

'তাই বলো। খোকা নয়, তোমার কথা ভেবে আমাকে যেতে বলছ। তা তুমিও তো না যেতে পারো। সম্মান বজায় থাকবে।' রজতাভ হাসলেন।

শিখা কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রজতাভ জানেন শিখা যাবেই। এখানকার তরুণীমহলে শিখার খুব খাতির হয়েছে। ওর কাছ থেকে সবাই বিভিন্ন রান্নার রেসিপি জেনে নেয়।

পরদিন দুপুরে রোদ উঠল। বেশ কড়া রোদ। বরফও গলতে শুরু করল। ভরসা পেলেন রজতাভ। আপাদমস্তক গরম কাপড় মুড়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হলেন। রাস্তায় মোড় অবধি গিয়েছেন, মনে হল সারা শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে। হঠাৎ গাড়িটাকে দেখতে পেলেন। রঙ্গনের গাড়ি। চিৎকার করে বলছে, 'উঠে পড়ো, জলদি।'

উঠতে গিয়ে দেখলেন পা এগোচ্ছে না। কথা বলতে গেলে শব্দ হারিয়ে গেল। রঙ্গন দ্রুত নেমে এসে তাঁকে টেনে তুলল গাড়িতে। গাড়ির ভেতরটা মেশিন গরম রেখেছে। পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে গেল রঙ্গন। ধরাধরি করে তাঁকে শোওয়ানো হল বিছানায়। টেলিফোন পেয়ে ছুটে এল রঙ্গনের বাঙালি ডাক্তার বন্ধু। ইনজেকশন দিল সে। বলল, 'ঘন্টা তিনেকের মধ্যে বোঝা যাবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিনা। মেসোমশাই-এর ইনস্যুরেন্স করা আছে তো?'

শিখা জানে না। রঙ্গন দ্রুত রজতাভর পাসপোর্ট যে ব্যাগে থাকে সেটা খুঁটিয়ে দেখল। মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারের ইনসিয়োরেন্স করিয়ে এসেছেন রজতাভ কলকাতা থেকে আসার সময়। সম্ভবত প্রিমিয়ামের টাকাটা নষ্ট হয় বলে কম টাকায় করিয়েছিলেন। রঙ্গন জানে ওই পঞ্চাশ হাজার ডলার তেমন তেমন ক্ষেত্রে কিছুই কাজ দেবে না। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হলে কি পরিণতি হবে ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

কপাল ভালো ছিল। ডাক্তার বন্ধু জানাল ইনজেকশনে কাজ হয়েছে। এখন রজতাভ ঘুমোবেন। কেউ যেন ওঁকে বিরক্ত না করে। পাক্কা তিরিশ ঘন্টা ঘুমোবার পর চোখ খুললেন রজতাভ। শুনলেন তাঁর কোল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। ওই ঠান্ডায় যা পরে বের হওয়া উচিত তা তিনি পারেননি। মাথা থেকে পা ঢাকলেই মাইনাস পাঁচকে কবজা করা যায় না। তার জন্যে চাই আলাদা পোশাক। হিট স্ট্রোকের কথা তিনি জানেন, কোল্ড স্ট্রোক আজ প্রথম জানলেন। একা পেয়ে শিখা জানাল তাঁর মুখ নাকি বেনারসের হনুমানের মতো হয়ে গেছে। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত চামড়া পুড়ে গিয়েছিল। ওইটুকুই খোলা ছিল তখন।

সাতদিনের মাথায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রজতাভ দেখলেন তাঁর মুখ থেকে শুকনো চামড়া উঠছে। সাপের খোলস যেমন ওঠে তেমনি মুখের চামড়া উঠে যাওয়ার পর তিনি রঙ্গনকে বললেন দেশে ফিরে যাবেন। শিখার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে নাতি আর বউমাকে নিয়ে ব্যস্ত। রঙ্গন আপত্তি করেছিল প্রথমে, শেষে প্লেনে সিট বুক করে দিল। ওদের শহর হয়ে লন্ডন, লন্ডন থেকে কলকাতা। শিখার একটুও ইচ্ছে ছিল না স্বামীকে ছাড়ার। যাওয়ার আগের রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলল, 'তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি।'

রজতাভ বললেন, 'কি চেয়েছ যা তোমাকে দিইনি?'
'জানি না। যাচ্ছ যাও। কিন্তু রোজ ফোন করতে হবে।'
'কত বিল দিতে হবে খেয়াল আছে?'
'তাহলে একদিন অন্তর একদিন?'
'আচ্ছা।'
'আর একটা কথা। আমাদের বেডরুমে শোবে না।'
'তাহলে কোথায় শোব?'
'অন্য কোনো ঘরে। খোকার ঘরে।'
'বেশ। তাই হবে।' রজতাভ আর তর্ক করতে চাইলেন না।

রঙ্গন এল তাঁকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে। শেষ মুহূর্তে বলল, 'আমি জানি তোমার এখানে খুব অসুবিধে হয়, তবু তোমাকে দেখলে মন ভালো লাগে।'

রজতাভ ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমি মরে গেলে তুই তোর মাকে এখানে নিয়ে আসিস। কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিবি। তুই তো কখনও কলকাতায় ফিরে যেতে পারবি না।'

'অনেস্টলি বলছি বাবা, ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারব না। এই বাড়িটাকে কিনেছি পঁচিশ বছরে ইনস্টলমেন্টে। তাছাড়া আমি চাকরি পেতে পারি কিন্তু তোমার বউমা ওখানে গেলে হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকবে। সেটা আর ও কিছুতেই পারবে না।'

'আমি জানি। তাই বলছি, বাড়িটাকে রেখে কোনো লাভ নেই।'
'এখনই এসব কথা বলবে না।'

ছেলের মুখটায় এখনও ওর ছেলেবেলার অভিমান। এখনও যে এটুকু বেঁচে আছে তা দেখে খুব খুশি হলেন রজতাভ।

লন্ডনে নামলেন সকাল আটটায়। এখানে ঘন্টা পাঁচেক বসে থাকতে হবে। ট্রানজিট লাউঞ্জে পৌঁছে বোর্ড দেখলেন। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্লেন যাচ্ছে। তারা কখন কোন্ গেট থেকে ছাড়ছে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। তাঁর প্লেনের কোনো খবর নেই। মালপত্র যা ছিল তা আমেরিকায় বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় প্লেনকোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছেন। খালি হাতে ঘুরতে লাগলেন রজতাভ। দু'পাশে ডিউটি ফ্রি শপের আকর্ষণ। কয়েকটা দোকানে ঘুরতেই বুঝলেন, নামেই ডিউটি ফ্রি শপ। যে কোনো জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। লন্ডন শহরে এর চেয়ে শস্তায় পাওয়া যায়।

হাঁটতে হাঁটতে একটা লাউঞ্জে চলে এলেন রজতাভ। অনেক যাত্রী সেই লাউঞ্জের সোফায় বসে আছেন। এঁরা নিশ্চয়ই দূর থেকে আসছেন, অন্য ফ্লাইট ধরবেন। হঠাৎ নজর পড়ল এক মহিলার ওপর। দারুণ ফরসা, লম্বা, সুন্দর শরীর, তবে বয়স ষাটের কম নয়। পরনে অফহোয়াইট শাড়ি। মনে হল এই মহিলা যৌবনে ডানাকাটা

সুন্দরী ছিলেন। এঁর বসে থাকার ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট। ভদ্রমহিলা মুখ ফেরাতেই চোখ সরিয়ে নিলেন রজতাভ। এই সত্তরের কাছাকাছি এসে তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যা আঠারো-উনিশে মানায়।

রজতাভ কাচের দেওয়ালের কাছে গেলেন। ওপাশে হিথরো এয়ারপোর্টের রানওয়েতে কর্মব্যস্ততা চলছে। গোটা পৃথিবী থেকে উড়ে আসা প্লেনগুলো স্বচ্ছন্দে নামছে আবার উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নাকে মিষ্টি গন্ধ লাগল। ঘুরে তাকাতেই অবাক হলেন। সেই মহিলা উঠে এসেছেন তাঁর সামনে। চুল প্রায় সাদা, গলায় হাঁসের পায়ের দাগ। মহিলা হাসলেন, 'চিনতে পারছ না?'

এই একটি বাক্যে হুড়মুড় করে বিস্মৃতির সব দেওয়া খসে পড়ল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রজতাভ। কি করছেন না জেনেই এগিয়ে গিয়ে মহিলার হাত ধরলেন তিনি, 'তুমি!'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু বুঝলাম তুমি পারোনি। তাই উঠে এলাম।'

'আমি, আমি ভাবতেই পারছি না লালী, তোমাকে এখন এখানে দেখব ভাবতেই পারছি না। কিন্তু তুমি খুব বদলে গেছ।'

'কি রকম? মোটা হয়েছি? বুড়ি?'

'দূর! তুমি আরও আরও সুন্দরী হয়েছ।'

'বাজে বোকো না। পঁয়ষট্টি বছরের বাঙালি মেয়েকে লোকে বুড়িই বলে।'

'পঁয়ষট্টি?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার থেকে তিন বছরের বড়।'

'তাইতো।' চোখ বন্ধ করলেন রজতাভ। লালী হাত ছাড়িয়ে নিলেন। রজতাভ চোখ খুললেন, 'হ্যাঁ। ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে তোমাকে দেখছি।'

'ভাবা যায়?' লালী হাসলেন, 'তখন যদি আমরা ঠিক করতাম পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হবে তাহলে বিশ্বাস করতাম? চুলগুলো এত্ত উঠে গেল কেন?'

'বাপ-ঠাকুরদার দান।' রজতাভ হাসলেন, 'তুমি কি একাই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমিও। চল, ওই সোফায় বসে কথা বলি।' রজতাভ লালীর কনুই ধরে নিয়ে এলেন। লালী বললেন, 'একটু আস্তে, এখন কি অত জোরে হাঁটতে পারি? তুমি দেখছি এখনও যুবক!'

'যুবক?' হো হো করে হাসলেন রজতাভ, 'আমার নাতি হয়ে গেছে।'

'ছেলে তো আমেরিকায় থাকে।'

অবাক হয়ে তাকালেন রজতাভ, 'তুমি কি করে জানলে?'

হাসলেন লালী, 'চার বছর আগে পর্যন্ত জানতাম। মা বেঁচে ছিলেন ততদিন। মায়ের কাছে তোমাদের খবর পেতাম। তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'ভালো। ছেলের কাছে থেকে গেল কিছুদিনের জন্যে। নাতিকে সামলাচ্ছে।'

'বাঃ।'

'তোমার ছেলে মেয়ে?'

মাথা নাড়লেন লালী, 'একটি ছেলে।'

'তোমার স্বামী?'

'শরীর ভালো নয়। হাঁপানিতে ভুগছে।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ব্যাঙ্গালোরে। ছেলে ওখানে চাকরি করে। বছরে একবার যাই।'

'লন্ডনেই থাকো?'

'না। ম্যাঞ্চেস্টারে।'

'লালী, তুমি সুখে আছ তো?'

স্পষ্ট চোখে তাকালেন লালী, 'স্বার্থ আর অনুকম্পা দিয়ে যে সম্পর্কের শুরু তাতে কখনও সুখ জন্ম নেয়? ওঁর আত্মীয়স্বজন সবাই তো বিয়ের ব্যাপারটা জানে। পঞ্চাশ বছরেও সেই জানাজানি পুরোনো হয়নি।'

মাইকে ঘোষণা চলছিল সমানে। কখন কোন্ গেট দিয়ে যাত্রীদের প্লেনে উঠতে হবে। টিভি মনিটরে ফ্লাইটচার্ট দেখাচ্ছে। রজতাভর কলকাতা ফ্লাইটের ঘোষণা একবারও করেনি কর্তৃপক্ষ।

রজতাভ বললেন, 'আবার কি করে দেখা হবে লালী?'

'জানি না। হয় তো এভাবেই হয়ে যাবে।'

গম্ভীর হলেন রজতাভ, 'তোমার টেলিফোন নাম্বার পেতে পারি?'

একটু চুপ করে থাকলেন লালী। এই সময় মাইকে ঘোষণা করা হল, লালীর ফ্লাইট তৈরি। লালী চোখ তুললেন, 'তোমারটা?'

'নিশ্চয়ই।' পার্স বের করে নিজের কার্ড এগিয়ে দিলেন রজতাভ। সেটা নিয়ে লালী বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' অবাক হলেন রজতাভ।

'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কেউ কাউকে ফোন করব ..'

'সেকি?' অবাক হয়ে গেলেন রজতাভ।

'আমরা জানব ইচ্ছে করলেই কথা বলে খবর নিতে পারি যা এতদিন পারতাম না। কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে লাগাব না।' লালী চোখ বন্ধ করলেন।

'তাহলে নাম্বার নিয়ে কি হবে?'

'হবে!' মাথা নাড়লেন লালী, 'তুমি এবং আমি এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে যেই আমাদের কেউ পৃথিবী থেকে চলে যাবে অমনি যে বেঁচে থাকবে সে যেন জানতে পারে। শুধু এইটুকু! বলো, রাজি আছ?'

একটা বড় শ্বাস বুক নিংড়ে বেরিয়ে এল, রজতাভ মাথা নাড়লেন। লালী তাঁর

ফোন নাম্বার লিখে দিলেন, কার্ড ব্যাগে ঢোকালেন। এখন ঘন ঘন আবেদন জানানো হচ্ছে প্লেনে ওঠার জন্যে। রজতাভ লালীকে ওঁর প্লেনে ওঠার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারলেন। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে প্লেনের কর্মচারীরা লালীকে পরীক্ষা করে ভেতরে যেতে বলল। রজতাভ আশা করছিলেন ভেতরে যাওয়ার আগে লালী মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাবে, কিন্তু তাকাল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন উড়ে গেল আকাশে।

হিথরো এয়ারপোর্টের ট্র্যানজিট লাউঞ্জ যাত্রীর ভিড়ে গমগম করছে। কিন্তু রজতাভর সব কিছু ফাঁকা বলে মনে হচ্ছিল। পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হল। অথচ শেষ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর লালীর কথা বেমালুম ভুলে ছিলেন তিনি। প্রথম পাঁচ বছরে রাগ ছিল, জ্বালা ছিল না পাওয়ার যন্ত্রণা কুরে কুরে খেত। নিজের যোগ্যতা এত কম ছিল যে ধিক্কার দিতেন নিজেকে। তারপর সামলে নিয়েছিলেন। মোটামুটি ভালো রেজাল্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় চাকরিটা তাঁকে ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে গিয়েছে ওপর মহলে। বিয়ে করেছেন, ছেলে হয়েছে। ভালোই ছিলেন এতকাল। লালীর স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে অথবা ওই বয়সের প্রেমকে 'কাফলাভ' বলা হয় কারণ তা কখনই স্থায়ী হয় না বুঝে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কখনও ভাবেননি পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হলে লালী বলবে সে সুখে নেই। কখনও কল্পনাও করেননি লালী তাঁর সব খবর রাখার চেষ্টা করে গেছে চার বছর আগে পর্যন্ত। তার মানে, জীবন সব সময় থিয়োরি মেনে চলে না।

আঠারো বছর বয়সে রজতাভ পাড়া-কাঁপানো ছেলে। ভালো ফুটবল খেলে, আশুতোষ কলেজে পড়ে কিন্তু সাত-আটজনের দল নিয়ে হকি স্টিক হাতে নিয়ে মারপিট করে নামও করে ফেলেছে। বাবার প্রচণ্ড শাসন সত্ত্বেও মায়ের প্রশ্রয়ে রজতাভ যখন পাড়ার হিরো তখনই লালীর সঙ্গে দেখা। লালী তখন ক্লাশ টেনের ছাত্রী। বেলতলা স্কুলে পড়ে। ওর স্কুলে যাওয়া-আসার সময় কাজের মেয়ে সঙ্গী হয়। তাকে উপেক্ষা করে বেপাড়ার কিছু ছেলে লাইন মারছিল। খবর পেয়ে রজতাভ দল নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটাল তাদের। পিটিয়ে থানায় গিয়ে বলল, 'আমাদের পাড়ার মেয়েকে বেইজ্জত করছিল বলে ওদের মেরেছি।'

দারোগা বললেন, 'ঠিক করেছ। কিন্তু দ্বিতীয়বার করলে জেলে যেতে হবে।'

দ্বিতীয় দিন থেকে তিন মিনিটের রাস্তা গাড়িতে যাতায়াত শুরু করল লালী। চতুর্থ দিনে সেই গাড়ির জানলা থেকে কাগজ পড়ল রাস্তায়। গাড়ি চলে গেলে ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিল রজতাভ। সুন্দর হাতে লেখা, 'তুমি আমার উপকার করেছ বলে কৃতজ্ঞ। বাবা তোমাকে গুন্ডা বলে। তুমি একটু ভালো হতে পারো না?' কোনো নাম নেই ওপরে অথবা নীচে।

কিন্তু চিঠির আদান-প্রদান চলল। ওর ক্লাসে পড়ার একটি পরিচিত মেয়ের সাহায্য নিল রজতাভ। সাতনম্বর চিঠিতে নাম দেখা গেল। লালী। জানা গেল ওর বাবা এক নম্বরের স্বৈরাচারী। মেয়েকে কোথাও একা যেতে দেন না। সিনেমা দেখাও বারণ।

বাইরে আলাদা দেখা করে কথা বলার কোনো সুযোগই নেই। লালী থাকে দোতলার রাস্তার দিকে ঘরে। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে একমিনিটের জন্যে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে আসতে পারে।

লালীর বাবা যে বিরাট ব্যবসায়ী, বিশাল কারখানার মালিক তা জানা ছিল। বাড়ির গেটে দারোয়ান, চারটে গাড়ি। তারপর সেই বৃষ্টির রাত এল। রাস্তায় লোকজন নেই। দশটা নাগাদ অঝোরে ঝরা বৃষ্টির মধ্যে রেইন পাইপ বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে গিয়েছিল রজতাভ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দরজা বন্ধ। কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর ভীত গলা কানে এল, 'কে?'

'আমি রজতাভ।'

দরজা খুলে গেল। ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখল হালকা নীল আলো জ্বলছে। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া লালী মুখ হাত চাপা দিয়ে বলল, 'কিভাবে এলে? বাবা যদি জানতে পারে!'

'পারবে না। শুধু তুমি বলো, ডু ইউ লাভ মি?'

মুখে কিছু বলেনি লালী. শুধু দ্রুত ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

এত কাছে দাঁড়িয়ে, নীল আলোয় স্নান করল লালীর ফরসা মুখ, গলা হাত দেখে রজতাভর মুগ্ধতা বাড়ছিল তখনই কুকুরের ডাক শোনা গেল। লালী ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যাও, চলে যাও, প্লিজ। এখনই সবাই চলে আসবে।'

দাঁড়ায়নি রজতাভ। যে পথে এসেছিল সেই পথে নেমে গিয়েছিল রাস্তায়।

পরের দিন দেখা গেল রেইন পাইপে কাঁটাতার লাগানো হয়েছে।

সাতদিনের মধ্যে পাত্র পাওয়া গেল। ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট। বিলেতে রিসার্চ করতে যেতে চায়, পয়সার অভাবে পারছে না। তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হল লালীকে বিয়ে করার শর্তে। বিয়ের পর বরকনে চলে যাবে বিলেতে। একমাসের মধ্যেই সানাই বাজল। লালীর বাবা কোনো ঝুঁকি নেননি। পুলিশ পাহারা ছিল বাড়ির গেটে। সেইদিন রজতাভর মনে হচ্ছিল তার আত্মহত্যা করা উচিত। বন্ধুরা বুঝিয়েছিল, সামান্য একটা মেয়ের জন্যে সে প্রাণ দেবে! তার প্রাণ কি শস্তা!

পঞ্চাশ বছর পরে এইসব ঘটনা মনে পড়বে এমন কেউ বেঁচে আছে কি না জানা নেই। বন্ধুদের মধ্যে যারা এখনও আছে তারাও ভুলে গেছে। লালীর বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা বন্ধ হয়েছে। সেই পাড়া ছেড়েছেন রজতাভ। আজ মনে এল। সেই বৃষ্টির রাত্রে রেইন পাইপ বেয়ে লালীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন? কিসের টানে? ওকেই কি ভালোবাসা বলে? তাহলে ভালোবাসার আয়ু কতদিন? দিব্যি তো সব ভুলে ছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর? নাকি অনাদরে ভালোবাসা ঘুমিয়ে থাকে, ঘুমোয়. কিন্তু মরে না।

কলকাতায় এলেন। ফাঁকা বাড়ি। একটুও ভালো লাগছিল না তাঁর। অথচ কলকাতায়

ফিরে আসার জন্যে ওখানে ছটফট করছিলেন। তাঁর টেলিফোনের নাম্বার লেখা বইয়ের 'এল' আদ্যাক্ষরের শেষ নাম লিখলেন, লালী, জিরো, জিরো ফোর ফোর...........।

তারপর তিন তিনটে বছর পার হয়ে গিয়েছে। পুজো আসছে। ষষ্ঠীর দিন ছেলে বউমা নাতিকে নিয়ে চলে এল বেড়াতে। বউমার বোন ও তাঁর স্বামী এলেন বোকারো থেকে, দিদির সঙ্গে পুজো কাটাতে। বাড়ি এখন জমজমাট। সন্ধের সময় বাঁ হাতটা হঠাৎ কনকন করতে লাগল, বাঁ বুকে ঈষৎ যন্ত্রণা। রজতাভ অ্যান্টাসিড খেলেন। মনে হচ্ছিল পেটে বাতাস জন্মেছে। কাউকে বলে বিরক্ত করতে চাইলেন না। কিন্তু রাত দশটা নাগাদ ব্যথা এত বাড়ল যে আর চেপে রাখতে পারলেন না। ডাক্তার পাশের বাড়িতেই। তিনি দেখে মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'ইনজেকশন দিচ্ছি। কাল সকালেই ইসিজি করাবেন।'

ছেলে উদ্বিগ্ন হল, 'রাত্রে কিছু হবে না তো?'

'বলতে পারছি না। হসপিটালে রিম্যুভ করলেই ভালো হয়।'

রজতাভ বললেন, 'আরে না, না। আমার কিছুই হয়নি। ঘুমিয়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা অযথা চিন্তা করছ।'

ইনজেকশনের কল্যাণেই ভালো ঘুম হল। সকালে অনেকটা চাঙ্গা। ইসিজির ইচ্ছে ছিল না, রঙ্গন জোর করে নিয়ে গেল। ইসিজি করার পর ডাক্তারের চোখ কপালে। রঙ্গনকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে হয়?'

'বাবা।'

'এখনই হাসপাতালে নিয়ে যান। খুব খারাপ অবস্থা।'

রঙ্গনের এক সহপাঠী অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তার। সে বলল, 'নিয়ে আয়।' হাসপাতালে আবার ইসিজি করা হল। করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অ্যাঞ্জিওগ্রাফ করা হবে। সেটা করা হল বিকেলবেলায়। দেখা গেল রজতাভর হৃৎপিণ্ডগামী রক্তবাহী শিরাগুলোর নব্বুইভাগ অকেজো হয়ে গেছে। আগামী কালই বাইপাস অপারেশন করা দরকার।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল রজতাভর। বুকটা খুব ভারী। শুনলেন আজ তাঁর অপারেশন হবে। কাল থেকে সমানে ওষুধ চলছে। আর তখনই মনে পড়ল। যদি অপারেশন টেবিলেই মরে যান তাহলে কি হবে? লালীকে তিনি জানাবেন কি করে? কথার খেলাপ হয়ে যাবে।

সকাল সাড়ে নটায় ওরা সবাই এল। ছেলে বলল, 'কোনো ভয় নেই বাবা। আজকাল বাইপাস জলভাত হয়ে গিয়েছে। নার্ভাস হয়ো না।'

বউমা বললেন, 'ওখানে তো বাইপাস হওয়ার পরের দিনেই পেশেন্টকে হাঁটায়।'

বউমার বোনের স্বামী বলল, 'আমার বাবার হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। এখন নর্মাল লাইফ। কোনো চিন্তা করবেন না।'

চুপচাপ শুনলেন রজতাভ। তারপর বললেন, 'ভালো হলে ভালো। যদি তা না হয় তাহলে মাকে তোমার কাছে নিয়ে যেয়ো। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ো।'

শিখা কেঁদে উঠল। রঙ্গন চাপা গলায় বলল, 'মা!'

'রঙ্গন!' মৃদুস্বরে ডাকলেন রজতাভ।

'বলো।'

'একটা অনুরোধ রাখবে?'

'নিশ্চয়ই। বলো।'

'আমার যদি কিছু হয়—।' বলে মুখ তুলতেই বউমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। তারপর ওঁর বোনের সঙ্গে। তখনই মনে এল, এরা কি ভাববে? বুড়ো বয়সে প্রেম করছেন? প্রেমিকাকে জানাতে চাইছেন তিনি নেই! ভাবতেই কিরকম কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

'তোমার কিছু হবে না বাবা। তবু বলো, নিশ্চয়ই রাখব।'

'একটা ফোন—।' মন স্থির করতে পারছিলেন না তিনি।

'কাউকে ফোন করতে হবে?' রঙ্গন জানতে চাইল।

হঠাৎ শিখার যেন মনে পড়ে গেল, 'খোকা, ওই ফোনটা।'

বউমা বললেন, 'আঃ মা! আপনাকে নিষেধ করা হয়েছিল।'

রজতাভ তাকালেন শিখার দিকে, 'কি বলছ তুমি? বলো।'

হকচকিয়ে গেল শিখা, 'না, মানে, আচ্ছা, লালী বলে কাউকে চেনো?'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করলেন রজতাভ। কেঁপে উঠলেন।

নার্স এল এই সময়। 'আপনারা এবার যান। পেশেন্টকে তৈরি করতে হবে।'

সবাই নড়ল। রঙ্গন ঝুঁকে বলল, 'কি করতে বলছিলে, বাবা!'

মাথা নাড়লেন রজতাভ, 'না, তার আর দরকার নেই।'

খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে

পরীক্ষাটা ছিল চাকরির। দেওয়ার সময়েই বুঝতে পেরেছিল ডাক আসবে না। এমন অনেক প্রশ্ন ছিল যা সে কখনও শোনেনি, উত্তর কি লিখবে। আধঘন্টার পর মনে হয়েছিল উঠে পড়লেই হয়। কিন্তু ওঠেনি, সাঁতার না জানা মানুষ যদি পুকুরের ডুব দেয় তাহলে যে অবস্থা হবে সেই অবস্থায় বাকি সময়টা কাটিয়েছিল। প্রশান্ত জানে, এটাই তার জীবনের শেষ চাকরির পরীক্ষা। আর কয়েক মাস বাদেই বয়সটা সীমারেখা পেরিয়ে যাবে।

সেই সাতসকালে সে হাওড়ার কদমতলা থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরে খড়্গপুরে এসেছিল এই পরীক্ষাটা দিতে। বাড়ির সবাই খুব উৎসাহ দিয়েছিল। এর আগে যতবার সে দরখাস্ত করেছে কোনও বারই ডাক আসেনি। বাংলার অনার্সে পঞ্চাশ নম্বর পাওয়া ক্যান্ডিডেটকে যে ডাকা হয় না তা সে বুঝে গিয়েছিল। এবার ডাক পাওয়ায় সে যেমন অবাক হয়েছিল তেমনই আশা বেড়েছিল বাড়ির লোকদের। চাকরিটা হয়ে গেলে ছেলেটা চব্বিশ ঘন্টা গুম মেরে বসে থাকবে না। পাড়ার দূরের কথা, বাড়ির লোকের সঙ্গেই ভালো করে কথা বলে না। মেয়েবন্ধু দূরের কথা, ওর কোনো ছেলে বন্ধু নেই। প্রশান্তর মায়ের ধারণা, ছেলে হয় সন্ন্যাসী নয় পাগল হয়ে যাবে। যে দেড় ঘন্টা খাতা সামনে নিয়ে বসেছিল প্রশান্ত তা একদম না লিখে শেষ করেনি। দ্বিতীয় পাতায় সে তিনটে লাইন লিখেছিল,

'তাকে আমি খুঁজতে গেলাম পূর্বপাড়ার হাটে
তাকে আমি খুঁজে এলাম কৃষ্ণচূড়ার মাঠে
তাকে আমি খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে।'

কাকে সে খোঁজাখুঁজি করছে, এরকম লাইন কেন তার মাথায় এল, আর এল যখন তখন পরীক্ষার খাতায় লিখতে গেল কেন এসব প্রশ্নের কোনও জবাব সে নিজেই জানে না।

বাড়ি ফেরার জন্যে খড়্গপুর স্টেশনের দুপুরের নির্জন প্ল্যাটফর্মে এসে মনে হল পরীক্ষার খাতায় ওসব লেখা ঠিক হয়নি। এখন মনে হচ্ছে কথাগুলো তার নিজের। নিজের কথা পাঁচজনকে জানাবার কী দরকার? যিনি খাতা দেখবেন তিনি কি মানে বুঝবেন? অবশ্য সে নিজেই মানে জানে না। নিজের এরকম কিছু কথা থাকে যার মানে ঠিকঠাক জানা যায় না।

প্রশান্ত একটা বেঞ্চিতে বসল যার প্রান্তে দাড়িয়ালা শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ় বসে আছে। লোকটির আর্থিক অবস্থা যে খারাপ তা দেখলেই বোঝা যায়। দুই আঙুলে দাড়ি চুলকে লোকটি বলল, 'আপনি যে উদ্‌ভ্রান্ত তা দেখেই বুঝতে পারছি।'

প্রশান্ত হাসল।

লোকটি পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে দু'হাতের আড়ালে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরাল। তারপর অনেকটা ধোঁয়া বের করে বলল, 'লোকে বলে অমুক ভালোবেসে পাগল হয়ে গিয়েছে। আরে ভালোবেসে কেন পাগল হবে? পাগলের কাছে কি ভালোবাসা থাকতে পারে? পাগলরা উদাসী হয়। ভালোবাসা থাকল কি গেল তাতে তার কী?'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল প্রশান্তর। হাসল।

'তা মশাই-এর সমস্যাটা কি?'

'কী বলব!' প্রশান্ত তাকাল।

'তা অবশ্য। অনেক সমস্যা থাকলে কোন্‌টা বলবেন! আমার নাম শিবশম্ভু। ঠাকুমা রেখেছিলেন। থাকি কালিঘাটের কাঠিবাবার ডেরায়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এক পলক দেখলেই বলে দেবেন কোন্ সমস্যা আপনার আসল।'

'আপনি ওখানে কি করেন?'

'বাবার ওখানে পড়ে থাকি। যা বলেন শুনি। মন ভরে যায়। আরে মশাই, মন ভরে গেলে আর কী চাই? এই শরীরটা? দুবেলা দুটো পেটে পড়লেই শরীর ঠান্ডা। যাবেন নাকি? একবার দর্শন করে ফিরে যান। কোথায় যাচ্ছেন?'

'কলকাতা'। হাওড়া না বলে কলকাতা বলল প্রশান্ত।

'অ। তা পথেই পড়বে। ট্রেন আসছে উঠুন।'

'কিন্তু আমার টিকিট তো হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কেটেছি।'

'রেখে দিন। ওটা পরে কাজে লাগবে। কোলাঘাট পর্যন্ত দরকার হবে না।'

দুপুরের লোকাল। ভিড় কম। বসার জায়গা পাওয়া গেল।

শিবশম্ভু জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন তো, কোলাঘাট কেন বিখ্যাত?'

প্রশান্তর মনে পড়ল ইলিশ মাছের কথা। কিন্তু ওই সামান্য উত্তরের জন্যে নিশ্চয়ই শিবশম্ভু তাকে প্রশ্নটা করেনি। সে ভাবছে দেখে শিবশম্ভু হাসল, 'আরে ইলিশ মাছ। কোলাঘাটে থেকেও খেতে পাই না। অত দাম দিয়ে কিনব কী করে। তাছাড়া কাঠিবাবার ডেরায় আমিষ বারণ। পেটে কিছু দিয়েছেন না হরিমটর?'

'খেতে ভালো লাগছে না।'

কোলাঘাটে নেমে স্বচ্ছন্দে শিবশম্ভু প্রশান্তকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গেটে দাঁড়ানো টিটি-কে বলল, 'আমার ভাই।' লোকটি একটি কথা বলল না।

'পকেটে টাকা থাকলে এখানে খেয়ে নিতে পারেন।' স্টেশনের বাইরের ঝুপড়ি দোকান দেখাল শিবশম্ভু। মাথা নাড়ল প্রশান্ত, খিদে নেই। শিবশম্ভু একটু হতাশ হল, 'মুশকিল কি জানেন, খালি পেটে কাঠিবাবার সামনে যেতে নেই।'

'কেন?'

'পেটে কিছু না থাকলে হজম করবেন কী দিয়ে?'

অগত্যা ঝুপড়িতে ঢুকল ওরা। হাতে গড়া গরম রুটি আর ঘ্যাট। প্রশান্ত একটা

খেল তো শিবশম্ভু ছ'টা। তারপর চা। দশ টাকা লাগল। শিবশম্ভু বলল, 'কিছুই না। যে কোনও দেবস্থানে যান, দেখবেন এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ হবে।'

হাঁটা শুরু হল। জনবসতি পেরিয়ে, মাঠ আর মাঠ। হাত তুলল শিবশম্ভু, 'ওই যে আকাশের গায়ে কালো বিন্দু, ওটা বিশাল বটগাছ। ওর নিচে কাঠিবাবার ডেরা। একটু আয়েশ করে হাঁটুন, কষ্ট হবে না।'

মাঠ শেষ হল। বটগাছ এখন বেশ বড়। তার নিচে খড়ের ছাউনি দেওয়া দুটো ঘর নিকোনো উঠোন। সেখানে বসে আছে জনা আটেক নারী-পুরুষ। শিবশম্ভু বলল, 'বসে পড়ুন। কাঠিবাবার এখন বিশ্রামের সময়।'

বটগাছের কিছুটা দূরে নদী। নদীতে জল সামান্য। না বসে সেদিকে এগিয়ে গেল প্রশান্ত। জলের কাছে যেতেই শুনতে পেল, 'ওমা এ আবার কে!'

পাশ ফিরে সে যে নারীকে দেখতে পেল তার চুল খোলা। রুক্ষ চুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। পরনে গেরুয়া শাড়ি। হাতে সদ্য ধোওয়া বাসনপত্র। নারীর বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী। ঠোঁট মুচড়ে, চোখ ঘুরিয়ে নারী বলল, 'প্যাট প্যাট করে দেখা হচ্ছে! ভালো চাও তো পালাও, নইলে মরণফাঁদে পড়বে।' তারপর উঠে চলে গেল কাঠিবাবার ডেরার দিকে।

মরণফাঁদ! সেটা কী জিনিস? মাথা নাড়ল প্রশান্ত। তারপর উবু হয়ে বসে নদীর জলে মুখ ধুলো। বাঃ, বেশ ঠান্ডা, শরীর জুড়িয়ে গেল।

শিবশম্ভু বলল, 'বাবা, বিশ্রামভঙ্গ করেছেন, তোমার কথা জানিয়ে দিয়েছি, অনেকদূরে যাবে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।'

এই সময় সেই নারী ঘরের বারান্দায় একটা চাটাই পেতে দিল। এখন তার চুল বিশাল খোপা হয়ে গেছে। সাধিকা সাধিকা লাগছে। শিবশম্ভু নিচু স্বরে জানাল, 'কাঠিবাবার সেবিকা।'

এর পরে কাঠিবাবা বেরিয়ে এলেন। চাটাই-এর ওপর বসলেন ধীরে ধীরে। অতি শীর্ণ শরীর। বুকের সব হাড় বোধহয় গোনা যায়। পাকা দাড়ি গলার নিচে এসে থেমেছে। মাথায় চুল নেই। চকচকে টাক। বয়স আশির আশেপাশে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। শিবশম্ভু উঠে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল কাঠিবাবাকে। তিনি হাত ওপরে তুলে নামিয়ে নিলেন। প্রণাম শেষ করে কিছু বলল শিবশম্ভু। কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন।

শিবশম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের মধ্যে কে কে খুব দূরের জায়গা থেকে এসেছেন? হাত তুলুন।'

এক দম্পতি বসেছিল সামনে। লোকটি হাত তুলল।

'আসুন আপনারা।'

ওরা এসে দূর থেকে প্রণাম করল। কাঠিবাবা বললেন, 'আমি ভগবান নই যে যা চাইবে তাই পাইয়ে দেব, ডাক্তার নই যে রোগ সারিয়ে যাব। তোমাদের মনে অশান্তি আছে নইলে এখানে আসবে না। তাই তো—!'

পুরুষটি বলল, 'হ্যাঁ বাবা দশ বছর বিয়ে করেছি, এখনও সন্তান হল না। অনেক

ডাক্তার দেখিয়েছি। আমার এই স্ত্রী বলেছিল আবার বিয়ে করতে। কিন্তু কলকাতার ডাক্তার বলেছে না হওয়ার জন্যে আমিই দায়ী। আমি কখনও বাবা হতে পারব না। তবে আমার স্ত্রী মা হতে পারে। ডাক্তাররা নলজাত শিশুর কথা বলেছে। ওর শরীরেই বড় হবে। ওর শরীর থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। এই নিয়ে খুব অশান্তি। কী করব বলে দিন!'

কাঠিবাবা রমণীটির দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাভারতের গল্প জানো?'

'জানি। টি ভি-তেও দেখেছি।' স্ত্রী বলল।

'এই মহাভারত, গীতা কিছুই হত না যদি ব্যাসদেব না থাকতেন। রাজার সন্তান নেই। সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু তখন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল নিয়োগ প্রথা। তিনি মহামতি ব্যাসদেবের কাছে রানিদের পাঠালেন। তার ফলেই যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের পিতারা জন্ম নিয়েছিল। আজ নিয়োগপ্রথা নেই। কিন্তু নলপ্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে আপত্তি করার তো কিছু নেই। এসো তোমরা।' কাঠিবাবা চোখ বন্ধ করলেন।

পুরুষটি একটি পুঁটলি সামনে রেখে প্রণাম করল। স্ত্রীও। তারপর তারা উঠে চলে যেতে শিবশম্ভু ডাকল, প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল। শিবশম্ভু বলল, 'বসুন।'

কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে কাঠিবাবা প্রশ্ন করলেন, 'সমস্যাটা কি? মন এত উতলা কেন? তুমি তো কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। পৃথিবী ঘুরলেও না।'

'হ্যাঁ। আমার কিছু ভালো লাগে না। দিন দিন নিজের ওপর আস্থা চলে যাচ্ছে। চাকরি পাইনি। বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে করে না।'

'তোমাকে যদি আজই অনেক টাকার চাকরি দেওয়া হয় তাহলে? মন শান্ত হবে?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আজকাল আমার কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয় কোথাও চলে যাই।' প্রশান্ত সত্যি কথা বলল।

কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন, 'হুঁ। আমার চোখের দিকে তাকাও।'

তাকাল প্রশান্ত। কিন্তু কাঠিবাবার শুকনো মুখ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। কাঠিবাবা বললেন, 'তোমাকে আমি এমন একটা জিনিস দিতে পারি যাতে বাইরে যেতে হবে না। তুমি যেখানে আছ সেখানেই চিন্তামুক্ত হয়ে থাকতে পারবে। তুমি সামনের শনিবারে এসো। বাড়িতে বোলো যে রাতে বাড়িই ফিরবে না। এসো।'

হাওড়ায় ফিরে এসেছিল প্রশান্ত। এরকম অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। চাকরির পরীক্ষায় ওই কাণ্ড হওয়ার মনে যে হতাশা এসেছিল সেটা যে কখন চলে গিয়েছে সবাই সে টের পায়নি। ব্যাপারটা শুনে বাড়ির সবাই যে গম্ভীর হয়ে গেল তাতেও সে বিচলিত হল না। তার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কাঠিবাবা তাকে কী দেবেন?'

কাঠিবাবা বলেছেন শনিবারে যেতে। কখন যেতে হবে বলেননি। শিবশম্ভুকে জিজ্ঞাসা করে এলে হত। শনিবার দুপুরে সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে গেল, ফিরতে দেরি হয়ে গেলে রাত্রে থেকে যাবে, কাল ফিরবে। এই কথায় বাড়ির

কারও কোনও প্রতিক্রিয়া যে হল না এটাও লক্ষ করল না সে।

কোলাঘাট স্টেশনে নেমে সে অবাক হয়ে গেল। পুলিশে পুলিশে প্ল্যাটফর্ম তটস্থ। বেশি যাত্রীও নেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল আজ ভোরের বেলায় সন্ত্রাসবাদী অথবা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়েছে। দুজন পুলিশ আর একজন উগ্রপন্থী মারা গিয়েছে। উগ্রপন্থীরা কোলাঘাট বন্ধের ডাক দিয়েছে। পুলিশ রেললাইন পাহারা দিচ্ছে বলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি। সে প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই দুজন পুলিশ অফিসার তাকে কাছে ডাকল, 'কোথায় থাকা হয়?'

'হাওড়ায়।'

দ্বিতীয়জন কপালে ভাঁজ ফেলল, 'এখানে কোথায় যাবে?'

'কাঠিবাবার কাছে।'

'কী বাবা?' দ্বিতীয় জন চোখ ছোট করল।

প্রথমজন বলল, 'একজন সাধু। নদীর ধারে থাকে।'

'কী জন্যে যাবে ওর কাছে?' দ্বিতীয় জনের প্রশ্ন।

'দেখা করতে।'

'আজ ভোরে যারা পুলিশ মেরেছে তাদের চেনো?'

'না।'

আইডেন্টিটি কার্ড আছে?'

'না।'

'কী নাম?'

'প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কি করো?'

'কিছু না।'

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বলল, 'শুনলে তো! এরাই ওই দলের মেম্বার। একে ছাড়া ঠিক হবে না। রগড়ালে খবর বের হতে পারে।'

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'কাঠিবাবার সঙ্গে কেন দেখা করবে?'

'উনি আসতে বলেছিলেন। আমাকে কিছু দেবেন যাতে মন শান্ত হবে।'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'এই কাঠিবাবা ওদের এজেন্ট নয় তো?'

প্রথমজন এবার হাসল, 'দূর। উনি সত্যিকারের একজন সাধক। প্রশান্ত, তোমার মনকে শান্ত করতে হচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না। আমার কিছু ভালো লাগে না।'

'গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রাগ হয়? সমাজব্যবস্থা বদলাতে ইচ্ছে করে?'

'না। আমি ওসব নিয়ে ভাবি না।'

প্রথমজন বলল, 'যেতে দাও। ন্যাতানো মাল।'

অতএব হাঁটতে শুরু করল প্রশান্ত। ঝুপড়ির দোকানগুলো বন্ধ। আচ্ছা, ন্যাতানো

মাল বলল কেন? ওরা যাদের খুঁজতে তারা কি খুব শক্ত লোক, তাজা? মন খারাপ হয়ে গেল খুব।

কাঠিবাবার ডেরার সামনে আজ কোনও ভক্ত বসে নাই। সম্ভবত ধর্মঘটের জন্যেই আসতে পারেনি কেউ। চারপাশে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেল না প্রশান্ত। শিবশম্ভুকেও না। কুটিরের ভেতর নিশ্চয়ই কাঠিবাবা আছেন। কিন্তু কী বলে তাঁকে ডাকা যায়। শেষ পর্যন্ত কিছু না বলে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল সে। কুটিরের সামনে গাছের ছায়ায় বসল আরাম করে।

অবশ্য এখন এখানে আসা ঠিক হয়নি। ভরদুপুরে নিশ্চয়ই কাঠিবাবা বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ কানে এল, 'ওমা! একে দেখছি হরতালও আটকাতে পারেনি?'

প্রশান্ত নারীকে দেখল। পেছনের নদী থেকে স্নান সেরে আসছে। পরনের সিক্তবসন শরীরকে আড়াল করেছে। কিন্তু কাপড় ভিজে গেলে যে আকর্ষণীয় হয় তা এই প্রথম জানতে পারল প্রশান্ত।

'না, মানে, ট্রেন চলছিল, এদিকের অবস্থা হাওড়াতে টের পাইনি।'

'পুলিশ ধরেনি?'

'ধরেছিল। ছেড়ে দিয়েছে।'

'পুলিশে যখন ছোঁয়নি তখন বাঘেও কিছু করতে পারবে না। তা পেটে কিছু দিয়ে এসেছ না—।'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি।'

'বাঁচালে।' নারী ভেতরে চলে গেল।

কাঠিবাবা বেরিয়ে এলেন দু' ঘন্টা বাদে। তখন রোদ রয়েছে গাছের শরীরে। প্রশান্ত আজ সামনে গিয়ে নমস্কার করে বসে পড়ল।

'সংসারে কে আছেন?'

'বাবা, মা, ভাই?'

'বিয়ে করোনি?'

'না। আমি রোজগার করি না।'

'মনের ভাবটা খুলে বলো। কী চাও?'

'আমার সবসময় অশান্তি লাগে। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। আবার বাইরে গিয়ে কী করব তা বুঝতে পারি না। বাড়িতে থাকলে চাকরি করতে হবে, সংসার করতে হবে। চাকরি পাইনি। চাকরির পরীক্ষার খাতায় উলটো-পালটা লিখে এলাম।'

'কী লিখলে?'

মাথা নাড়ল প্রশান্ত, 'ছেলেমানুষের মতো কথা। আপনি হাসবেন।'

'না হয় হাসির কথাই শোনাও।'

প্রশান্ত মনে করে করে বলল,

'তাকে আমি খুঁজতে গেলাম পূর্বপাড়ার মাঠে
তাকে আমি খুঁজতে এলাম কৃষ্ণচূড়ার হাটে

তাকে আমি খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে।'

কাঠিবাবা বললেন, 'অপূর্ব! আসল কথাই তো বলে ফেলেছ। তোমার মন খোঁজাখুঁজি করছে। কাকে খুঁজছে? ইষ্টকে। কিন্তু তাকে পেতে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তো পেতে পারো। তোমার মন ঘরে বসে যদি শান্ত হয়ে যায় তাহলে বাইরে যাওয়ার তো কারণ নেই।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন কাঠিবাবা। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমি তোমাকে দেব। কিন্তু তার আগে বলো মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার পর তোমার শরীরের অভ্যন্তরে কোনও আন্দোলন হয়েছে কিনা?'

প্রশান্ত বুঝতে না পেরে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন, 'তুমি কি কোনও নারী শরীরে উপগত হয়েছ?'

'না না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রশান্ত।

'খুব ভালো। যাও, পেছনে নদী আছে। সেখানে পোশাক খুলে তিনবার ডুব দিয়ে এস। দিগম্বর হয়ে ডুব দেবে। ওদিকে কোনও মানুষ থাকে না, লজ্জার কোনও কারণ নেই।'

প্রশান্ত উঠল। নদীর ধারে গিয়ে সে কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঠিবাবার নির্দেশ মান্য করল। তারপর ভেজা শরীরেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ফিরে এল কুটিরের সামনে। কাঠিবাবা তাকে তাঁর সামনে সোজা হয়ে বসতে বললেন।

প্রশান্ত বসল,

'গায়ের জামা খুলে ফ্যালো।' কাঠিবাবা আদেশ করলেন।

খুলল সে শরীরের জলে ভিজেছে কিছুটা।

'কোমরের দড়ি একেবারেই আলগা করে দাও।'

পাজামার গিঁট খুলে দিল প্রশান্ত। বসে থাকার জন্যে সেটি নিচে নেমে যেতে পারল না।

'আমি তোমাকে ইষ্টলাভের পথ চিনিয়ে দেব। সেই পথে হাঁটতে হবে তোমাকেই। তোমার মন যদি একাগ্র হয় তাহলেই তুমি পূর্ণতা পাবে। যখন সেটা পাবে তখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তারপর তোমার পাওয়ার অহঙ্কার যদি জটাধারী সন্ন্যাসী করে শিষ্য জুটিয়ে আশ্রম তৈরি করে তার মধ্যে শিবলিঙ্গ রেখে ভোগের মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো।' কাঠিবাবা চোখ বন্ধ করলেন। তারপর প্রাণের ক্রিয়া দেখালেন। কিভাবে জপ করতে করতে হবে দেখিয়ে বীজমন্ত্র দিলেন। জিভের সঙ্গে জপের মাত্রানুযায়ী একটি ক্রিয়া দেখালেন আর বললেন, 'ওইখানেই নিরবচ্ছিন্ন জপ চলবে সারাক্ষণ। বাইরে কাজকর্ম চলবে আবার জপ চলবে। এই নিরবচ্ছিন্ন জপের ফলই হবে জপসিদ্ধির অবস্থা, তারপর ধ্যানের ধারা আসবে। পবিত্র স্থানে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে এই জপ চলতে থাকলে যে অবস্থা হবে তখনই বুঝবে সৃষ্টির রহস্য, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক।'

প্রশান্ত শরীরে মনে অন্যরকম অনুভূতি আবিষ্কার করল। কাঠিবাবা বললেন,

'তোমার ক্ষেত্র অনেকটাই তৈরি। তুমি ঘন ঘন আসবে আমার কাছে। না হলে সামলাতে পারবে না। তোমার শক্তিলাভ হবেই। যদি মোহমুক্ত হতে পারো তাহলেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা! তবে গৃহত্যাগ কোরো না। করার দরকার নেই! তুমি ফিরে যাওয়ার আগে অন্তত এক ঘণ্টা এই জায়গায় বসে আমার দেখানো ক্রিয়া অনুসরণ করো। যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সংশোধন করে দিতে পারব।'

কাঠিবাবা কুটিরের ভেতর চলে গেলেন।

প্রশান্ত কাঠিবাবার নির্দেশ মনে করে করে প্রাণায়ামের ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করল। বিচিত্র অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই সে অনুভব করছিল না। মন স্থির রাখাই মুশকিল হচ্ছিল।

'ফেরার ইচ্ছে নেই বুঝি!'

গলা কানে যেতে তাকাল প্রশান্ত। সেই নারী দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরের পৃথিবীতে ছায়া নেমে গেছে। শরীর বেশবাস এখন কিছুটা পরিপাটি; ঠোঁট পানের রসে লাল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই খেয়াল হল। দ্রুত পাজামা ধরে ফেলে নারীর দিকে পেছন ফিরে গিঁট বাধল সে।

নারী হাসল, 'ওই গিঁটই হল আসল, গিঁট খুললেই সর্বনাশ।'

পাঞ্জাবিটা পরে নিতেই নারী বলল, 'উঠল বাই কটক যাই। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। একটু বসে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

অগত্যা বসল প্রশান্ত। মিনিটখানেকের মধ্যে নারী এক বাটি মুড়ি আর একটা কাঁচা লংকা নিয়ে এল, 'এগুলোর গতি হোক।'

খিদে ছিল না। মন এখন অন্য কিছুর আশায় উন্মুখ। তবু হাত বাড়াতে হল। খাওয়া দেখতে দেখতে নারী জিজ্ঞাসা করল, 'পিছুটান নেই, না?'

মুখ তুলল প্রশান্ত, 'বাড়িতেই সবাই আছেন।'

'বউ আছে? বউ।'

মাথা নেড়ে না বলল প্রশান্ত।

শব্দ করে হাসল নারী, 'তাহলে আর পিছুটান কোথায়?' তারপরই গলা নামাল, 'তা এসব করার ইচ্ছে হল কেন? সারা জীবন শুকিয়ে মরবে বলে?' বলেই কুটির থেকে নেমে চলে গেল গাছপালার আড়ালে।

হতভম্ব হয়ে গেল প্রশান্ত। কী বলল নারী? কাঠিবাবার সঙ্গে থেকে এসব কী কথা? কিন্তু এই নারী কে? তান্ত্রিকদের সঙ্গে ভৈরবী থাকে বলে শুনেছি। কিন্তু কাঠিবাবা কি তান্ত্রিক? দেখে মনে হয় না। আর এই নারীর বিপুল শরীর আর গেরুয়া শাড়ি ছাড়া আর কিছুই সাধিকার ভাবমূর্তি তৈরি করে না।

মুড়ি শেষ করে তেষ্টা পেল। কিন্তু জল দেওয়ার কেউ নেই। ওপাশে নদী আছে অবশ্য কিন্তু সে-জল পান করা ঠিক কি? প্রশান্ত স্থির করল, স্টেশনে পৌঁছে জলপান করবে। সন্ধের অন্ধকার মাটি থেকে উঠে আসছে যদিও আকাশে একনও আলোর রেশ।

হাঁটতে শুরু করল সে। মিনিট কয়েক যেতেই দেখল নারী ফিরছে, ঠোঁট টিপে হাসল নারী, 'চললে?'

'হুঁ।'

'কথাটা মনে রেখো।'

'ইষ্টলাভের চেষ্টা করা কি অন্যায়?' জিজ্ঞাসা না পারল না প্রশান্ত।

'ইষ্ট? ইষ্ট মানে কি? ভগবান? তোমাদের ওই বাবা ভগবানকে পেয়েছে? জপ করে করে প্রাণায়াম করে শরীরের ভেতর ঢেউ তুলে ভাবছে ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছে। তার ফলে লোক এসে দুমুঠো মুড়ি, চারটে কলা দিয়ে যাচ্ছে। যা দেবে তাই খাও, তোমার ইচ্ছে মতো খাবার খেতে পাবে না। একটাই তো জীবন। মরতে হবে। মরার পর ভগবান কোলে বসিয়ে দুধু খাওয়াবে এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তাহলে? নিজের জন্যে জপতপ করে শুকিয়ে না মরে পাঁচজনকে নিয়ে বাঁচো। কেউ না খেতে পেয়ে মরছে, জপ করে তাকে খাবার দিতে পারবে?' হাসল নারী, 'শক্ত লাগছে। বিয়ে করোনি, মেয়েমানুষ ছোঁওনি। তোমার মতো হাঁদা আছে বলেই তো গোলমাল।'

'আপনি কে?'

'আমি? আমার নাম নয়নতারা। তোমাদের কাঠিবাবার মেয়ে। হ্যাঁ গো। দু' দুবার বিয়ে করেছিলাম। টেঁকেনি। আবার কবে আসছ?'

'দেখি।'

'আসতে তোমাকে হবেই। কাঠিবাবা ঠিক টেনে আনবে। তা আনুক। আমাকে একটু ছুঁয়ে দাও তো। এই কনুই-এর ওপরটা ছোঁও।'

'কেন?'

'আঃ। যা বলছি তাই করো।'

কাঁপা আঙুলে নয়নতারার কনুই স্পর্শ করেই হাত নামাল প্রশান্ত।

হাসল নয়নতারা, 'যাও। দুগ্গা দুগ্গা।' বলে আর দাঁড়াল না।

নরম তুলতুলে স্পর্শ আঙুলের ডগায়। কেন তাকে স্পর্শ করতে বলল নয়নতারা? আলাদা রকমের অনুভূতি নিয়ে হাঁটছিল। সে। পাতলা অন্ধকার চারপাশে স্থির হয়ে আছে। কাঠিবাবা যা দিয়েছেন তার নয়নতারা যা বলল তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল।

স্টেশনের কাছে আসতেই তার খেয়াল হল চারদিক স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। একটি মানুষের শরীরও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ চিৎকার কানে এল, 'ওই যে, আর একটা!'

সে কিছু বোঝার আগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যারা, তারা যে পুলিশ তা বোঝার আগেই সে মাটিতে শুতে বাধ্য হল। এলোপাথাড়ি ভারী বুটের লাথি পড়ছে শরীরে। পাঁজর, কোমরের হাড় যেন ভেঙে যাচ্ছে একটার পর একটা।

'থামো। মুখটা দেখি।' ধমক ভেসে এল। তারপর টর্চের আলো পড়ল প্রশান্তর মুখে। যন্ত্রণার তার মুখ বিকৃত।

'দূর। এ নয়।' অফিসারের গলায় হতাশা।

'স্যার এরকমই বয়স।'

'বয়স তো এক হতেই পারে। যাক গে, ভ্যানে তুলে রাখো।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ভ্যানের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল, ঘড়াং করে বন্ধ হল ভ্যানের দরজা। ভেতরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে খুব নিচু গলায় প্রশ্ন কানে এল, 'কে?'

প্রশান্ত উঠে বসার চেষ্টা করল। টনটন করছে পাঁজর কিন্তু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে অনুভব করল পাশেই কেউ শুয়ে আছে। জবাব না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করল শুয়ে থাকা মানুষটাকে, আপনি কে?'

লোকটা জবাব দিল না। ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠ ভেসে এল, 'ও কোনওদিন কথা বলবে না। ও এখন লাশ হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি কে?'

'আমি? আমি রতন। তুমি কি অসিত?'

'না। আমি প্রশান্ত।'

'তুমি এখানে এলে কেন? তোমার নাম তো আজকের এনকাউন্টারে ছিল না।'

প্রশান্ত ঢোক গিলল। সে বুঝতে পারল এতক্ষণে। এদের কথাই কাগজে পড়েছে সে। আজ সকালে এদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল পুলিশের। তারপর বোধহয় বিকেলেও হয়েছে। কাগজে পড়েছে, জেনেছে এরা ভারতবর্ষের আমূল পরিবর্তন চায়। এরা সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। এরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে চায়। এই রতন ছেলেটি তাকেও কি সেই স্বাধীনতাযোদ্ধা বলে ভাবছে?

'শোনো প্রশান্ত, একটু পরেই ওরা একটা মাঠের মধ্যে ভ্যানটাকে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়ে পালাতে বলবে। আমরা পালবার চেষ্টা করলেই পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলবে। এর জন্যে ওদের কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। বুঝলে।'

তাহলে?'

'আমাদের এখনই পালাতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে।'

'কী করে পালাব। দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ।' প্রশান্ত বলল।

'অপেক্ষা করো। ওরা তো দরজা খুলবেই। মাঠেও গুলি করে মারবে, এখানেও মারতে পারে। এখানে তবু বাঁচার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারি।'

ঘটাং করে ভ্যানের দরজা খুলে গেল।

'যারা জিন্দা আছিস তারা নেমে আয়।' হুকুম হল।

ধীরে ধীরে নীচে নামল প্রশান্ত।

ওপাশ থেকে দুপুরের একজন অফিসার এগিয়ে এলেন, 'আরে তুমি দুপুরে হাওড়া থেকে এসেছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় গিয়েছিলে যেন?'

'কাঠিবাবার আশ্রমে।'

'ভ্যানে চড়লে কেন?'

'আমাকে মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

'হুঁ। এখানে ঘুর ঘুর করছিলে কেন?'

'স্টেশনে এসেছিলাম, ট্রেন ধরে বাড়িতে যাব বলে।'

'অ। কাঠিবাবা কী বলল?'

'আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন। জপ করতে বলেছেন।'

অফিসার আর একজনের দিকে তাকালেন, 'দ্যাটস গুড। জপটপ নিয়ে থাকলে মাথায় দেশউদ্ধারের চিন্তা ঢুকবে না।'

'স্যার, এ গুল মারছে কিনা কে জানে। আচ্ছা ভাই, কী ভাবে জপ করতে শিখিয়েছে কাঠিবাবা তা করে দেখাও তো।'

প্রশান্ত নার্ভাস হল। কাঠিবাবা যা শিখিয়েছেন তা কাউকে দেখাবার জন্যে নয় এটা সে বুঝেছে। কিন্তু এরা তাকে ছাড়বে না। রেগে গেলেই লাশ বানিয়ে ফেলবে। অতএব বাবু হয়ে মাটিতে বসল সে। সোজা হয়ে গিয়ে পাঁজরে খচ করে করে লাগল। মুখ বিকৃত করল। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?'

'না। কিছু না।' তারপর জপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল সে কিছুই মনে করতে পারছে না।

'থাক, থাক। রিলিজিয়ন নিয়ে রসিকতা করার কোনও মানে হয় না। ওঠো।' অফিসার আদেশ করলেন, 'লোকাল ধরে সোজা হাওড়ায় চলে যাও।'

'স্যার, ওকে ছেড়ে দেবেন?'

'যাক। নির্দোষ। ওই যে বলেছে না একশোটা দোষী যদি ছাড়া পায় তো পাক, কিন্তু একজন নির্দোষ যেন সাজা না পায়।' অফিসার হাসলেন।

'কিন্তু স্যার ও ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবে।'

'নাম ঠিকানা ভেরিফাই করে ছাড়ো। মুখ খুললেই তুলে আনব। তবে কাঠিবাবার কাছে নিশ্চয়ই ও আসবে। সেক্ষেত্রে মুখ বন্ধ রাখবে।'

একটা অফিসার ওকে নিয়ে গেল স্টেশনের একটি ঘরে। নাম ঠিকানা লেখাল। পরিচিত লোকের ফোন নাম্বার দিতে হল। সেখানে ফোন করে সত্যতা যাচাই করা হল। লোকটা বলল, 'যা, পালা।'

প্রশান্ত বলল, 'রতনকে ছাড়বেন না?'

'রতন? কে রতন?'

'ভ্যানের ভেতর আছে।'

'এর মধ্যে দোস্তি হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, ওকে ছাড়ব। মাঠের ভেতর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। রতন বাড়িতে চলে যাবে।' অফিসারের কথা শেষ হওয়া মাত্র বাইরে চিৎকার শুরু হল। সঙ্গে গুলির আওয়াজ। প্রশান্তকে ছেড়ে অফিসার ছুটল

ওদিকে। ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ভাগ গিয়া, ভাগ গিয়া।'

শুনে খুব আনন্দ হল। রতন পালাতে পেরেছে। একটা প্রাণ বেঁচে গেল বলে তার আনন্দ হচ্ছিল। হঠাৎ ভয় হল। রতন পালিয়ে গেছে বলে ওরা যদি তাকে আবার ধরে? সে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার খুঁজল।

ট্রেন এসে দাঁড়াল চোরের মতো। টুক করে উঠে বসল প্রশান্ত। যত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা হাওড়ায় পৌঁছোয় তত ভালো।

স্টেশনে পৌঁছোতে বেশ রাত হয়ে গেল। আশপাশের লোকজন তার দিকে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ভাই?'

'কী হবে?'

'আপনারা সারা গায়ে কাদা মাটি, মুখ ফুলে গেছে।'

প্রশান্ত উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল।

লোকটা তার পাশের লোককে চাপা গলায় বলল, 'কোলাঘাট থেকে উঠেছে। নিজের চোখে দেখেছি। নিশ্চয়ই উগ্রপন্থী।'

বাড়িতে ঢোকার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'এইসব করছ? ভারতবর্ষের মুক্তি আনবে? বারংবার পুলিশ এসে তোমার গতিবিধি জানতে চাইছে? পরীক্ষা দেওয়ার নাম করে পুলিশ মারতে যাওয়া হচ্ছে? শোনো, তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না।'

'আপনি ভুল করছেন বাবা।'

'ঠিক আছে। পুলিশ এসে বলুক আমি ভুল বলছি, তাহলে স্বীকার করে নেব। তোমার মুখ, পোশাক বলে দিচ্ছে তুমি কোথায় ছিলে!'

মধ্যরাতেও ঘুম আসছিল না। সর্বাঙ্গে মারাত্মক ব্যথা। সে এখন কী করবে? কাঠিবাবা যা শিখিয়েছিল সব মাথা থেকে সরে গেছে। রতন বলেছিল, অনেক কাজ বাকি আছে। কী সেই কাজ? কার জন্যে কাজ?

রতনকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? রতনকে খোঁজা দরকার। কাঠিবাবা নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু নয়নতারা কি জানে না? চোখ বন্ধ করল প্রশান্ত।

শব্দের আড়াল

ফোনটা এসেছিল দিন দশেক আগে। সোমাই করেছিল। ওপার থেকে মিষ্টিদির গলা শুনে পুলকিত হয়েছিল, 'কেমন আছিস রে তোরা? অ্যাই শোন, আমার ঘরগুলো কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে রাখিস তো। হ্যাঁরে, আসছি। না-না, তোদের এয়ারপোর্টে আসতে হবে না। সকালে তো নামব। বারো তারিখ, মনে রাখিস।'

ঝড়ের আগে কথা ওড়ে মিষ্টিদির। তিন বছর বাদে আসছে। তিন বছর আগে যখন এসেছিল তখন দুই ছেলে সঙ্গে ছিল। কুট্টুস আর মুট্টুস। শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছিল মিষ্টিদি। তখনই ওদের বয়স দশ আর বারো। এসে যেন ওদের দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। উত্তর কলকাতার সরু গলির মধ্যে তিন ঘরের বাড়িতে দুদিন থাকতে না থাকতেই দুই ছেলে খোলাখুলি বিদ্রোহ করে বসল, এখানে থাকবে না। বাধ্য হয়ে ওদের নিয়ে গেস্ট হাউসে উঠে গিয়েছিল মিষ্টিদি। সেখানকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় পৌঁছে শান্ত হয়েছিল ওরা। মিষ্টিদি বলেছিল, 'দোষ দেব কী করে বল? এর মধ্যে দুজনের শরীরে যা র‍্যাশ বেরিয়ে গেছে, উঃ।'

সোমার মেয়ের চোখে ওর এই মাসতুতো ভাইগুলো যেন ভিন্ন গ্রহের মানুষ। ওরা বোতলের সিলভাঙা জল ছাড়া অন্য জল মুখে দেয় না। তেল ঝাল ছুঁয়েও দেখে না। বাক্স বাক্স বিদেশি খাবার নিয়ে আসা হয়েছে ওদের জন্য, আনা হয়েছে কৌটোর খাবার। সেগুলো মুখে দিয়ে মুখ বেঁকিয়েছিল মেয়ে, 'এম্মা, একদম স্বাদ নেই, খাও কি করে?'

মুট্টুস গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'দিজ আর অল ব্যালান্সড ফুড।'

তা এবার ওই দুটোকে নিয়ে মিষ্টিদি আসছে কি না তা টেলিফোনে বলেনি। অবশ্য এলে কি ঘর পরিষ্কার করার কথা বলত। তার মানে একাই আসছে। এটা মনে হওয়া মাত্র অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল সোমার।

অস্বস্তির কারণ সুকান্ত। মিষ্টিদি এলে সুকান্ত যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কী করলে মিষ্টিদির সুবিধে হবে এই চিন্তায় ডুবে থাকে। ছেলেদের সমস্যা হচ্ছিল বলে গেস্ট হাউস ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্বও সুকান্ত নিয়েছিল। তখন আর এক মুশকিল। রোজ বাড়ি ফিরেছে সাড়ে দশটা এগারোটায়। হয় মিষ্টিদির ছেলেদের পাহারা দিতে হয়েছে নয় মিষ্টিদির সঙ্গে কোথাও যেতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে মন্তব্য করা অত্যন্ত অশোভন বলে সোমা মুখ বন্ধ করে ছিল। মিষ্টিদি এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। বিদেশে

থাকার জন্যে ফিগার, গায়ের রঙ যে কোনও বাঙালি মেয়ের কাছে ঈর্ষণীয়। হ্যাঁ, মিষ্টিদি সোমার থেকে বয়সে বড়, চার বছরের বড়, কিন্তু সুকান্তর তো সমবয়সি। গত বছর যখন মিষ্টিদি এসেছিল তখন ওর সঙ্গে সুমিতদার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। ওই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মিষ্টিদি সহজ গলায় বলেছিল,—যদি বলিস দোষ কার, তাহলে বলব দুজনেরই। সুমিতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজের সাফাই গাইব না। সম্পর্কটা একটু একটু করে মরে যাচ্ছিল। চূড়ান্ত তিক্ততায় পৌঁছোবার আগে সরে গেলে ছেলেদের উপকার হবে। সুমিতের সঙ্গে দেখা হলে ভালো মুখে কথা বলতে পারব, প্রয়োজনে ও ছেলেদের কাছে আসতে পারবে। তাই—।'

'কিন্তু তোমরা তো প্রেম করে বিয়ে করেছিলে। তাহলে সম্পর্কটা মরে গেল কেন?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিল মিষ্টিদি। বলেছিল, 'উনিশ বছরের প্রেম করা মন পঁয়ত্রিশেও একই থাকবে? থাকতে পারে! যখন ধাক্কা লাগা শুরু হয় তখন চেষ্টা করেছি মানিয়ে নিতে। নিতে নিতে একটা সময় এল যখন আর পারিনি। প্রেম করেছিলাম বলে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেও তার দায় মেটাতে দুজনে একই ছাদের তলায় থাকলে আর যাই হোক প্রেম থাকে না। তাই না?'

মিষ্টিদি যখন কথা বলে তখন মনে হয় যা বলছে তার সবটাই ঠিক। কিন্তু পরে কিরকম ধোঁয়াশা বলে মনে হয়।

এই বাড়ি ঠাকুরদার। তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলের মেয়ে মিষ্টিদি, ছোট ছেলের মেয়ে সোমা। ওদের আর কোনো ভাই বোন না থাকায় বাড়িটিকে দুটো ভাগ করে দুই বোনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যতদিন বাবা-মা বেঁচেছিলেন সোমা এ বাড়িতে আসেনি। তার শ্বশুরবাড়ির রায়গঞ্জে। কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়ে ছিল সে আর সুকান্ত। প্রথমে মা পরে বাবা মারা যাওয়ার পর এখানে আসতে বাধ্য হয়। জেঠিমা চলে গিয়েছিলেন বহু আগে। মিষ্টিদির বিয়ের আগেই। মিষ্টিদির বিয়ে হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সে। বিয়ের পরেই চলে গিয়েছিল সুমিতদার সঙ্গে আমেরিকায়। জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন এই বাড়িতে, সোমাদের কাছেই। খবর পেয়ে ওরা এসেছিল আমেরিকা থেকে। তারপর কয়েক বছর বাদে বাদে, ইদানীং আসাটা কমে গেছে।

মিষ্টিদি যদি এই বাড়িতে থাকে তাহলে চোখের ওপর থাকবে। এরকম ভাবতেই বেশ স্বস্তি হয় সোমার। স্বামী সম্পর্কে তার তেমন কোনও অভিযোগ নেই কিন্তু মিষ্টিদিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি যে ভালো লাগে না এটা যে কী করে বোঝাবে। যদিও বাড়িটা দুটো ভাগ করা হয়েছে, দুদিকের আলাদা ঢোকার রাস্তা, কিন্তু ভেতরের বন্ধ দরজা খুলে দিলে স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করা যায়। তাছাড়া জল, ইলেকট্রিক তো একসঙ্গে। মিষ্টিদি আসে বহুদিন বাদে, এসে থাকেও বা একটাদিন।

সুকান্ত অফিসে চলে গেলে কাজের লোককে নিয়ে ভেতরের দরজা খুলে ওপাশে গেল সোমা। দু বছর বন্ধ থাকার কারণে ধুলো ভর্তি হয়ে আছে। ঘরের মেঝেতেও

ছোপ পড়েছে। এতসব পরিষ্কার করা কাজের মেয়ের পক্ষে একা সম্ভব নয়। তাকে দিয়ে লোক ডাকিয়ে এনে কাজে লাগাল সে। বাথরুমে ঢুকে সে হাঁ। সাবানদানির ওপর একটা ভারী সোনার হার আর বালা পড়ে আছে। যেদিন ওরা এখান থেকে গেস্ট হাউসে গিয়েছিল সেদিনই বোধহয় স্নানের সময় খুলেছিল মিষ্টিদি। দুবছর ধরে এখানে পড়ে আছে এত দামি গয়না অথচ মিষ্টিদির কোনও হুঁশ নেই। প্রচুর থাকতেও তো মানুষ এমন উদাসীন হয় না। বিশেষ করে গয়নাগাঁটির ব্যাপারে মেয়েদের তো খেয়াল থাকা উচিত। সোমা হার আর বালা নিয়ে এল নিজের ঘরে। আলমারির নিরাপত্তায় রেখে মনে হল আর একবার ঘরগুলো দেখা উচিত। কোথায় কি ফেলে রেখেছে মিষ্টিদি, ঘর যে পরিষ্কার করছে সে হয়তো লোভ সামলাতে পারবে না।

কিছু পিজবোর্ডের বাক্স, অসংখ্য পলিথিনের ব্যাগ ছাড়া দেওয়াল আলমারিতে পাওয়া গেল একটা মদের বোতল। সিল না ভাঙা বিদেশি হুইস্কি। দেখলেই বোঝা যায় বেশ দামি। সুকান্ত নিয়মিত মদ্যপান করে না। পিকনিক বা পার্টিতে গেলে একটু আধটু খায়। ওর মুখে স্কচ হুইস্কির গল্প শুনেছে সোমা। এই সেই স্কচ। ওটাকেও নিজের ঘরে নিয়ে এল সে।

কিন্তু মিষ্টিদি আমেরিকা থেকে মদ নিয়ে এল কেন? কাউকে দেওয়ার জন্য? সুমিতদা তো নেশা করত না। আর এটা নিশ্চয়ই গতবারে নিয়ে এসেছিল তখন সুমিতদার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। পারফিউম বা অন্যান্য গিফট নিয়ে আসার পেছনে যে যুক্তি আছে হুইস্কির ক্ষেত্রে সেটা খাটে না। মিষ্টিদি যদি নিজে খেত তাহলে বোতলের মুখ খোলা থাকত। হয়তো কাউকে খাওয়াবে ভেবেছিল কিন্তু সে আসেনি বলে বোতলটা খোলা হয়নি। কে সে?

রাতে সুকান্ত ফিরলে কথাটা চেপে রাখতে পারল না সোমা। শোনামাত্র সুকান্ত বলল, 'তাই? একা আসছে? ছেলেদের নিয়ে আসছে না?'

'শুনে তো তাই মনে হল। খোলাখুলি কিছু বলেনি।' সোমা গম্ভীর।

'আঃ, জিজ্ঞাসা করে নেবে তো?'

'কেন?'

'বারে! ছেলেরা এলে গেস্টহাউস বুক করতে হবে না?'

'যদি দরকার হত তাহলে বলত।'

'কবে আসছে?'

'বারো তারিখ।'

'তার মানে পরশু। কোন্ ফ্লাইটে আসছে?'

'বলেছে ভোরবেলায় আসবে। কাউকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে না।'

কথাটা শুনে সুকান্ত যেন খুব হতাশ হল বলে মনে হল সোমার। মিষ্টিদির নাম শুনেই এত উৎসাহ? ঠিক এই জিনিসটা বিয়ের পর তিনচার বছর তার বেলায়

দেখিয়েছিল সুকান্ত। তারপর কিরকম এক ঔদাসীন্য ধীরে ধীরে ওর ব্যবহারে এসে গেল। যেন বাড়িতেই তো আছে, কোথায় আর যাবে?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, মুট্টুসরা এবার আসছে না?'

'বোধহয় না।' সোমা জবাব দিল।

'তাহলে ওখানে ওরা কার কাছে থাকবে?'

'আমি জানি না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।'

মেয়ে বলল, 'ওদের না আনলেই ভালো।'

'কেন?'

'মুট্টুস বলেছিল, আই ডোন্ট লাইক ইন্ডিয়া। টু হট, টু মেনি পিপল।'

'ছোট বলে বলছে, বড় হলে বলবে না।'

'না মা, ওরা দুজনেই আমেরিকার সিটিজেন।'

আর কথা বাড়ায়নি সোমা। মিষ্টিদির মুখে কখনও এমন কথা সে শোনেনি। বরং দেশের প্রতি ওর টান যে খুব বেশি তা বোঝা যায়।

ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই মিষ্টিদিকে দেখতে পেল সোমা। ওপরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টিদি চিৎকার করল, 'আমি এসে গেছি।' এক মুখ হাসি আর গলার স্বরের আন্তরিকতা স্পর্শ করল সেখানে। সে দুদ্দাড় দৌড়ে নীচে নামল। ততক্ষণে মেয়ে এবং সুকান্ত চলে এসেছে একতলার দরজায়। আর তখনই ওপাশের দরজা খুলে নামল লোকটা। প্রচুর লম্বা, ধবধবে ফরসা এক সাহেব। নেমে কিরকম গোবেচারা মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মিষ্টিদি ততক্ষণে চলে এসেছে দরজায়, 'হ্যাঁরে, কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকব? ওটা না এটা?'

সম্বিত ফিরে পেল সোমা, 'এখানে এসো। তোমার খালি বাড়িতে যাওয়ার তো অনেক সময় আছে। মালপত্র, এই তুমি হেল্প করো না!'

সুকান্ত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তোমরা ভেতরে গিয়ে বোসো। আমি সব দেখেশুনে নামাচ্ছি।'

সুকান্ত ট্যাক্সির কাছে যেতেই সাহেব হাসল, হাত বাড়াল, 'দিস ইজ এড। আর ইউ সুকান্ট?'

'ইয়েস। ইউ নো মাই নেম?' সুকান্ত অবাক।

'ইয়া। শি ইজ সোমা, ইজন্ট ইট?'

'ইয়েস।'

মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে গেল সুকান্ত, কিন্তু এড বলল তারা প্রিপেইড ট্যাক্সিতে এসেছে। চার চারটে সুটকেস বাড়িতে ঢোকানো হল। ততক্ষণে বসার ঘরে গল্প শুরু হয়ে গেছে। ওদের দেখে মিষ্টিদি তাকাল। —'এই এড, এদিকে এসো। আমার বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল সোমা। এর কথা তো তোমাকে

বলেছি। সোমার বর সুকান্তর সঙ্গে তোমার তো আলাপ হয়ে গেছে। আর এ হল সোমার মেয়ে মউ।'

কথাগুলো শোনার সময় বারংবার মাথা নেড়ে যাচ্ছিল এড। তা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল মউ। সোমা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর পরিচয়টা দিলি না।'

মিষ্টিদি বলল, 'এড, এবার তুমি তোমার পরিচয় দাও।'

এড হাসল, 'আমি এড।' বলল, 'মাই বেঙ্গলি ইজ ভেরি ব্যাড। আই অ্যাম এ টিচার। আমি আর মিষ্টি এক লোকালিটিতে থাকি।'

মিষ্টিদি হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু ওকে বাংলা শেখাইনি। আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলে ও একটা বাংলা স্পোকেন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। সেখান থেকে কয়েকটা শব্দ শেখার পর এসে আলাপ করে।'

সুকান্ত বলল, 'এড, আপনি বসুন।'

এড বলল, 'ধন্যবাদ।' তারপর আরাম করে বসল।

মিষ্টিদি জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরদোর পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিস?'

'হ্যাঁ।' সোমা জবাব দিল।

'চল, দেখে আসি।' উঠে দাঁড়াল মিষ্টিদি।

ভেতরের দরজা দিয়ে ওরা এধারে চলে এল। এক পাক দিয়ে মিষ্টিদি বলল, 'বাঃ। গুড। বেশ পরিষ্কার লাগছে। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসা যাক।'

'এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? এবেলায় আমার ওখানে থাকো।' সোমা বলল।

'আমি কি আজ রান্নাঘরে ঢুকব ভেবেছিস! কক্ষনো না। তোর কাছেই খাব। চল, ওদের বলি সুটকেসগুলো এখানে নিয়ে আসতে।' মিষ্টিদি পা বাড়াল।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' সোমা দাঁড়াল।

'বুঝতে পেরেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'এড-এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? তাই তো?'

'না, মানে আমার মনে হচ্ছে তোমরা বন্ধু। উনি বাংলা শিখছেন তোমার জন্য, একটু আগেই তো বললে। কিন্তু উনি এখানে থাকবেন, না কোনও গেস্টহাউসে?'

'ওমা! এখানে এতগুলো ঘর থাকতে ও গেস্টহাউসে থাকতে যাবে কেন?

'ও।' খুব কষ্ট করে কথাটাকে গিলল সোমা। তারপর সামাল দিতে বলল, 'কিন্তু ওঁর খাওয়াদাওয়া? আমাদের খাবার কি উনি খেতে পারবেন?'

'খুব পারবেন। না পারলে আসা কেন!' অদ্ভুত গলায় কথাগুলো বলে সোমার হাত ধরে ওধারে চলে এল মিষ্টিদি।

সেই আমেরিকা থেকে প্লেনে উড়ে এল অথচ ওদের জেটল্যাগ হয়নি। বিকেল

হতে না হতেই মিষ্টিদি এডকে নিয়ে বের হয়ে গেল বাগবাজারের মায়ের বাড়ি দেখাতে। হাঁটাপথে মিনিট দশেক লাগে। সারদামায়ের এই মন্দিরটির পরিবেশ খুব শান্ত, গেলে মনে শান্তি আসে কিন্তু এত কাছে থেকেও সোমা বার তিনেকের বেশি সেখানে যায়নি। প্রথম দিনেই মিষ্টিদি কেন সেখানে যাওয়ার কথা মনে হল, কে জানে।

চা নিয়ে একা বসেছিল সুকান্ত। জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কী বলো তো?'

'কী বিষয়ে বলছ?'

'আঃ। এই যে সাহেব নিয়ে চলে এল তোমার দিদি—।'

সুকান্তর গলায় কি ঈর্ষা? হঠাৎ খুব ভালো লাগল সোমার। হেসে বলল, 'বারে, ভদ্রলোককে কলকাতা দেখাতে নিয়ে আসতে পারে না?'

'পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু এটা মধ্যবিত্ত পাড়া। সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? নর্থ ক্যালকাটার মানুষ পাড়ায় সাহেব দেখতেই কৌতূহলী হয়ে পড়বে তা জানো?

'তারা তো বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করবে না। তোমাকে কেউ প্রশ্ন করলে বোলো যা হোক একটা কিছু।' সোমার মুখে হাসি।

'কতদিন থাকবে কিছু বলেছে?'

'আশ্চর্য! মিষ্টিদি তার নিজের বাড়িতে কতদিন থাকবে তা আমাকে বলতে যাবে কেন? বলছে তো কাল থেকে নিজেই রান্না করবে।'

'হয়ে গেল!'

'তার মানে?'

'নিশ্চয়ই কাল থেকে ভেতরের দরজাটাও বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তাতে তোমার কী?' এবার রেগে গেল সোমা।

'আঃ! তুমি বুঝতে পারছ না। এই সাহেবের সঙ্গে তো তোমার দিদির কোনও লিগ্যাল সম্পর্ক নেই। অথচ একই ফ্ল্যাটে ওঁরা থাকবেন। পাঁচজন শুনলে কি ভয়ঙ্কর রি-অ্যাক্ট করবে ভেবে দেখেছ? মুট্টুসরা থাকলে একরকম হত, ওদের অ্যাবসেন্সে এটা খুব অনৈতিক কাজ বলে মনে হচ্ছে না তোমার?

'অনৈতিক কী করে বলব? একটু আগে দেখে এলাম এডের ঘর আর মিষ্টিদির ঘর আলাদা।' সোমা বলল।

'আলাদা?' বেশ ফুঁসে উঠল সুকান্ত, রাত্রে এ পাশের দরজা বন্ধ হওয়ার পর দুটো ঘর যে এক হয়ে যাবে না তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? সাহেবটা কি তোমার দিদিকে ছেড়ে দেবে?'

'আহ। কী আজেবাজে কথা বলছ?' রেগে গেল সোমা।

'ঠিক বলেছি। আজ খাওয়াদাওয়ার পর এডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জানলাম, এর আগে ও কখনও এশিয়াতেই আসেনি। কলকাতায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে

স্পষ্ট বলল মিষ্টিদি যে শহরে জন্মেছে, বড় হয়েছে সেই শহরটাকে দেখতে চায় সে। এখানকার জীবনের সঙ্গে না জড়ালে নাকি মিষ্টিদিকে ভালো করে বোঝা সম্ভব হবে না। বুঝলে?'

'তার মানে ওদের সম্পর্ক শুধুই বন্ধুত্বের নয়?' সোমার কিরকম আনন্দ হচ্ছিল।

'একদম নয়। অতএব রাত্রে স্বচ্ছন্দে এড মিষ্টিদির ঘরে চলে যাবে আরও বেশি বোঝার জন্য। এটা যদি বাজে কথা হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বিরক্ত হয়ে চায়ে চুমুক দিল সুকান্ত, 'তোমাদের পৈতৃক বাড়িতে যদি এসব অনাচার চলতে দিতে তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কী!'

'ঠিক আছে। আমি মিষ্টিদিকে জিজ্ঞাসা করব।' সোমা বলল।

'কী জিজ্ঞাসা করবে? এসব কেউ স্বীকার করে?'

'সম্পর্কটা কী তা জানতে চাইব।'

'অদ্ভুত তুমি। যদি মুখের ওপর বলে দেয় ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে, বিয়ে করবে কয়েকদিনের মধ্যে, তখন কী করবে?' সুকান্ত সোজা হয়ে বসল।

'তাহলে তো ভালোই। ডিভোর্সের পর মিষ্টিদি একা আছে ছেলেরা বড় হয়ে গেলে কী করে জীবন কাটাবে? তার চেয়ে এডকে বিয়ে করে যদি সুখী হয় তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?' খোনা গলায় বলল সোমা।

'সেটা হোক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের আগেই তোমার বাবা জ্যাঠার বাড়িতে অবৈধ কাজ করা কি মেনে নেওয়া যায়?' সুকান্ত না বলে পারল না।

এই সময় বীণার বোনকে দেখতে পেল সোমা। বীণা তাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। ওকেই বলেছিল বোনকে খবর দিতে। সোমা বলল, 'আয়। শোন, আমার দিদি এসেছে আমেরিকা থেকে। যে কদিন থাকবে ওদের ঘর ঝাঁট, বাসনমাজা, কাপড়কাচা করে দিতে হবে তোকে। না বলতে পারবি না।'

'তুমি বললে না কেন বলব বউদি। তবে দুবেলা আসতে পারব না। সকালে আসব আর ডেইলি চল্লিশ দিতে হবে।' মেয়েটি বলল।

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? চল্লিশ টাকা রোজ চাইছিস?' সোমা চেঁচিয়ে উঠতেই সুকান্ত বাধা দিল, 'ঠিক আছে। ওদের কাছে এক ডলারও নয়। কোনও অসুবিধে হবে না ওদের।'

সোমা স্বামীর দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'তাহলে কাল সকাল সকাল আসিস। বুঝলি?'

'কোন্ দিক দিয়ে ঢুকব? তোমার এই দরজা নিয়ে না ওদের দরজা দিয়ে?'

'ও বাড়িতে কাজ করবি যখন তখন ওদের দরজা দিয়েই ঢুকবি।'

'ঠিক আছে।' মেয়েটি চলে গেল।

'চমৎকার!' সুকান্ত বলল।

'মানে?'

'এই মেয়েটি পাড়ায় গাবিয়ে বেড়াবে যে তোমার দিদি একটা সাহেবের সঙ্গে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। তারপর আমরা মুখ দেখাতে পারব?'

কথাটা অস্বীকার করতে পারল না সোমা।

সন্ধের মুখে ওরা ফিরে এল। সঙ্গে একটা প্যাকেট। মিষ্টিদি বলল, 'আজ যে সব দোকান বন্ধ থাকবে বুঝতে পারিনি। ফুটপাত থেকেই কিনলাম।'

'কী কিনলে?' সোমা জিজ্ঞাসা করল।

'এডের শখ হয়েছে পাজামা পাঞ্জাবি পরার। রোমে গেলে নাকি রোমানদের মতো থাকতে হয়। আয়, এবার সুটকেস খুলব।' মিষ্টিদি হাসল। সুটকেস খোলা হল। প্রথমে পারফিউম। মিষ্টিদি বলল, 'এইটে তোর জন্য। শ্যানেল ফাইভ আর হোয়াইট ডায়মন্ড আছে এই প্যাকেটে।'

'ওমা! এত দামি জিনিস আনতে গেলে কেন?' সোমা আঁতকে উঠল।

'এটা তোমার।' মউ-এর হাতে প্যাকেট দিল মিষ্টিদি।

'কী আছে?' মউ রোমাঞ্চিত।

'খুলে দ্যাখো।'

মউ নিজেই প্যাকেট খুলল। দারুণ একটা স্কার্ট, একটা দামি ক্যালকুলেটার আর ওয়াকম্যান। মউ-এর মুখে খুশি ফুটে উঠল। মিষ্টিদি বলল, 'এটা সুকান্তর। ও কোথায় গেল? ডাকো!'

'একটু বেরিয়েছে।'

'আর সুটকেসে আর যা আছে তা আত্মীয়স্বজনদের দিতে হবে।'

'এতসব জিনিস কেন আনতে গেলে!' সোমা বলল।

'কী এমন। কতদিন পর পর আসি, আমারও তো দিতে ইচ্ছে করে।'

এড দূরে একটা চেয়ারে বসে এসব দেখছিল। হেসে বলল, 'আমারও উচিত ছিল কিছু আনা। তাই না?'

মিষ্টিদি চোখ পাকাল, 'তুমি কেন আনবে? তুমি কি এদের চিনতে?'

'ওহো, তা ঠিক তা ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল এড।

এই সময় সোমার মনে পড়ে গেল, 'দিদি, তুই এ বাড়িতে কিছু ফেলে গিয়েছিলি। বল তো কী?'

মিষ্টিদি মনে করার চেষ্টা করল, 'দূর। মনে পড়ছে না।'

'পারো বটে। তোমার বাথরুমে সোনার বালা আর হার পড়েছিল।'

'তাই! যাঃ। খেয়ালই নেই।'

'আমি তুলে রেখেছি।'

'ভালো করেছিস। ও দুটো তুই নিয়ে নে।'

'তার মানে! তোমার জিনিস আমি নেব কেন?'

'যে জিনিসের কথা আমার মনে নেই সেটা আর আমার জিনিস কী করে হবে?

তাছাড়া তোকে আমি যদি কিছু দিই তুই না বলবি কেন?'

'ও শুনলে খুব রাগ করবে।'

'কেন? ও তো সেদিন এসেছে। ওর আসার অনেক আগে থেকে আমি তোর দিদি। যাক গেল ওই সুটকেসটা আমি আজ খুলব না। একগাদা শাড়ি আছে ওটার মধ্যে। আমাদের ওখানে আজকাল খুব ভালো ভালো শাড়ি পাওয়া যায়, বুঝলি!'

সোমা বলল, 'তোমার এখানে আর একটা বাক্স ছিল।'

'কিসের?'

'স্কচ হুইস্কির।'

'মন্দিরার বরের জন্যে এনেছিলাম, দিতে ভুলে গিয়েছিলাম সেবার।'

মন্দিরা মিষ্টিদির বন্ধু। গতবারে এসেছিল দেখা করতে।

গল্পগুজবে সন্ধেটা কেটে যাওয়ার পর সুকান্ত ফিরল। খাওয়াদাওয়ার পর মিষ্টিদি বলল, 'এবার খুব ঘুম পাচ্ছে। এড তোমার ঘুম পাচ্ছে না?'

এড হাসল, 'না, এখানে এসে এত ভালো লাগছে যে ঘুম চলে গেছে।'

'আমি বাবা শুতে গেলাম। অ্যাই সোমা, এদিকের দরজাটা খোলাই থাক। তোদের অসুবিধে হবে না তো?' মিষ্টিদি উঠে পড়ল।

'না না অসুবিধে হবে কেন?' সোমা বলল। মিষ্টিদি চলে গেল তার ঘরে দিকে। এড বসেছিল সুকান্তর সামনে। সোমা লক্ষ করল সুকান্তর মুখ বেশ গম্ভীর। সোমা এডকে জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতা কেমন লাগছে?' যে কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। এখানে এসে সে এডের ভালো লাগছে তা যে সে একটু আগে শুনেছে মনে নেই।

'ফাইন। ইটস বিউটিফুল।'

'কদিন থাকলে বুঝতে পারবে।' নীচু গলায় বলল সুকান্ত।

'পার্ডন?' এড বুঝতে পারেনি কথাগুলো।

'তোমার কাছে ফাইন, বিউটিফুল মনে হচ্ছে কিন্তু মিষ্টিদির ছেলেরা এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই শহরে এত মানুষ, এত পুরোনো সব ব্যবস্থা যে বিদেশিরা দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে।' সুকান্ত বলল।

'আ-চা-চা।' বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল এড।

সোমা বলল, 'আমার মনে হয় এবার আপনার শুয়ে পড়া উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এড। তারপর ঝুঁকে বলল, 'গুড নাইট।'

এডকে দরজা পেরিয়ে ওপাশে চলে যেতে দেখল ওরা। এড অদৃশ্য হওয়ামাত্র সুকান্ত মন্তব্য করল, 'শালা। এতক্ষণ লজ্জায় যেন যেতে পারছিল না।'

সোমা বলল, 'আস্তে কথা বলো।'

'তুমি মিষ্টিদিকে কিছু বলোনি?' সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল।

'কী করে বলব? সন্ধেবেলায় অতসব গিফট বের করে দিল—।'

'গিফট পেয়ে তোমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল?'

'এ আবার কী কথা?'

'ঠিকই। এটা গিফট নয়, ঘুষ। এ বাড়িতে ফ্রি সেক্স করবে তাই ঘুষ দিল।

'তোমার যখন এত জ্বলছে তখন তুমিই বললে না কেন?'

'তোমার দিদি, আমার কী বলা উচিত?'

'তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?' সোমা গম্ভীর হয়ে নিজের শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দিক পরিবর্তন করে মেয়ের ঘরে ঢুকল। ওদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে সোমা মেয়ের পাশে গিয়ে শোয়। মিষ্টিদি যদি এডের সঙ্গে শোয় তাহলে সেটা যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমনই সুকান্তর কথাবার্তা ব্যবহারে স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে ও জ্বলেপুড়ে মরছে। তার অনুমান যে সত্যি হবে তা ভাবতে পারেনি সোমা। ওপাশের ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হল। হোক। সোমা মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ল।

একটু বাদে ওঘরের দরজায় টোকা পড়ল। অবাক হল সোমা। কে টোকা দিচ্ছে? সে উঠে মেয়ের ঘরের দরজা খুলে অবাক, তাদের বেডরুমের সামনে মিষ্টিদি দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে মিষ্টিদি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই মউ-এর ঘরে?'

দরজা খুলল সুকান্ত, 'কী ব্যাপার?'

উত্তরটা দেওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেল সোমা।

'আমি ঘুমোতে পারছি না। ওদিকে শোওয়া যাবে না।' মিষ্টিদি মাথা নাড়ল।

'কেন? এড কি আপনার ওপর অত্যাচার করছে?' সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল। 'ইনডাইরেক্টলি, আয় সোমা, আয় আমার সঙ্গে।' হাত ধরে সোমাকে নিয়ে নিজের দিকটায় চলে আসতেই অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল। সোমা অবাক হয়ে তাকাল।

মিষ্টিদির ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে কেউ নেই। আওয়াজটা আসছে পাশের ঘর থেকে। ঘরটি অন্ধকার, দরজা খোলা।

'শুনছিস? এই আওয়াজ কানে গেলে কারও ঘুম আসে?' মিষ্টিদি কানে হাত দিল।

'এডের নাক ডাকছে।'

'একে তুই নাক ডাকা বলছিস? বীভৎস। মাগো। আমি এখানে থাকলে সারা রাত জেগে থাকতে হবে। কী করি, ও সোমা?' কাতর গলায় বলল মিষ্টিদি।

'চলে এসো।'

নিজের দিকটায় এসে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিতেই সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

সোমা তাকে ঘটনাটা বলল।

'সেকি? তুমি জানতে না ওর নাক ডাকে?'

'কী করে জানব? আমরা কখনও একসঙ্গে রাত্রে থাকিনি।'

'ও।' সুকান্ত যেন চুপসে গেল।

সোমা বলল, 'তুমি ওই ঘরে শুয়ে পড়ো। এখানে আওয়াজ আসবে না।'

তৃতীয় ঘরটি দেখিয়ে দিল সোমা। মিষ্টিদি বলল, 'নারে। আমি বরং মউ-এর পাশে শুই। তাহলে একা লাগবে না।'

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এডের কী হবে?'

'ও থাকুক ওখানে। ভাগ্যিস ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম নইলে আমাকে বাকি জীবনটা না ঘুমিয়ে কাটাতে হত।' মিষ্টিদি মউ-এর ঘরে চলে গেল।

অতএব সোমা বাধ্য হল নিজেদের শোওয়ার ঘরে ঢুকতে। সুকান্ত বলল, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কাল ঠিকে লোক ও বাড়িতে ঢুকে জানবে মিষ্টিদি আমাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে, সাহেব একা ছিল।'

'তুমি খুশি তো!' ছোট্ট করে বলল সোমা।

'তার মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল সুকান্ত।

'মানেটা তো আমার চেয়ে তুমি ভালো করে জানো।' কথাটা বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল সোমা।

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'রাতদুপুরে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাকে ঘুমোতে দাও।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর সুকান্ত হাসল, 'এডের সঙ্গে মিষ্টিদির সম্পর্ক চুকল?'

সোমা কোনও জবাব দিল না।

সুকান্ত বলল, 'তাহলে এড নিশ্চয়ই কাল পরশুর মধ্যে চলে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল সোমা, 'কেন যাবে? যাবে না। ওরা একসঙ্গে এসেছে, একসঙ্গেই ফিরে যাবে।' কথাগুলো বেশ জোরের সঙ্গে বলল সে।